আর্য জ্যোতি

বাংলাদেশ অগ্নিবীর দ্বারা প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

৩য় সংখ্যা

২০৮০ বিক্রমাব্দ,১৪৩০ বঙ্গাব্দ (বৈশাখ-আষাঢ়), ২০২৩ ইংরেজি (এপ্রিল-জুন)

সম্পাদকীয়

পরমেশ্বরের অনন্ত নামের মধ্য থেকে ১০৮টি নামকীর্তন

ওমজঃ কবিরাচার্য আদিত্যঃ পরমেশ্বরঃ । প্রজাপতিরনন্তশ্চ পরমাত্মা পিতামহঃ ॥১॥

দয়ালুর্দিব্য আকাশো ন্যায়কারী বৃহস্পতিঃ । ব্রহ্মা ব্রহ্ম মহাদেবঃ সবিতা সত্য ঈশ্বরঃ ॥২॥

শুক্রঃ শুদ্ধঃ খমানন্দঃ শিবঃ শক্তিঃ শনৈশ্চরঃ । শঙ্করঃ শেষ আত্মা চ প্রাণঃ প্রাজ্ঞঃ সরস্বতী ॥৩॥

মাতরিশ্বা চ মাতা চ মনুর্ভূমিরুরুক্রমঃ । বায়ু রুদ্রো যমো যজ্ঞো বরুণঃ শ্রীর্বিরাড় বসুঃ ॥৪॥

অগ্নিরত্তা তথাদ্বৈতম্ অনাদির্নির্গুণঃ প্রিয়ঃ । সগুণঃ সৎ সুপর্ণশ্চাপ্যন্তর্যামী বুধস্তথা ॥৫॥

চন্দ্রশ্চিন্মিত্রমাপ্তশ্চ গরুত্মান্ সর্বশক্তিমান্ । স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ হোতা পুরুষঃ প্রপিতামহঃ ॥৬॥

অক্ষরস্তৈজসো বন্ধুঃ দেবঃ দেবী নিরঞ্জনঃ । নিত্যো নারায়ণঃ সূর্যঃ বিশ্বো বিশ্বম্ভরঃ পিতা ॥৭॥

কালঃ কালাগ্নিরন্নাদঃ ইন্দ্রঃ গণপতির্গুরুঃ । অন্নং জ্ঞানং জলং রাহুঃ কূটস্থঃ পৃথিবী স্বরাট্ ॥৮॥

সর্বপূর্বো জগৎকর্তা মুক্তঃ লক্ষ্মীশ্চ মঙ্গলম্ । বুদ্ধো হিরণ্যগর্ভোয়ং কুবেরঃ কেতুরর্যমা ॥৯॥

অচিন্ত্যঃ ধর্মরাজশ্চ নিরাকারস্তথৈব চ । বিষ্ণুর্বিশ্বেশ্বরশ্চৈব কীর্ত্যত্যেয়ং জগৎপ্রভুঃ ॥ ১০ ॥

পাঠফলম্

প্রোক্তমেতৎ প্রভোর্নাম্নামষ্টোত্তরশতং নঃ । কীর্তয়ন্ স্মরণং কুর্বন্নেভির্ধ্যায়ঁস্তথৈব চ ॥১॥

ভগবন্তং জগন্মূর্তি ভুক্তিমুক্তিপ্রদং প্রভুম্ । মনঃ শুদ্ধিমবাপ্নোতি লভতে চ পরং পদম্ ॥২॥

বেদালঙ্কার পণ্ডিত শ্রী বিদ্যাসাগর শাস্ত্রী

বঙ্গলিপিতে রূপান্তর

শ্রী দীপংকর সিংহ দীপ

শিক্ষা ও শাস্ত্রার্থ সমন্বয়ক, বাংলাদেশ অগ্নিবীর

প্রকাশক: স্বাধ্যায় প্রকাশনী

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; প্রকাশকের অনুমতি ছাড়া যেকোনো মাধ্যমে বইটি আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ নিষিদ্ধ।

প্রচ্ছদ / pdf নির্মাণে : জনি দেব

মূল্যঃ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

সূচিপত্র

১. মসুরের ডাল সাত্ত্বিক আহার নাকি নিষিদ্ধ ? -- ৪

২. বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী শূদ্র কে ? -- ৭

৩. অপপ্রচার খণ্ডনঃ যে ব্যক্তির স্ত্রীর সংখ্যা পশুর সংখ্যার থেকে বেশী তিনিই কি ভাগ্যবান? - ১২

৪. দৃষ্টসহস্রচন্দ্রঃ -ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার বিস্ময় -- ১৬

৫. শূদ্রকে পায়ের সাথে তুলনা করা কি অসম্মানজনক ? -- ১৮

৬. আলম্বায়ন গোত্র - শাস্ত্র ও ইতিহাসের আলোকে -- ২২

৭. বেদে শিক্ষিত নারীর জয়গান -- ২৫

৮. স্ত্রী তাঁর স্বামীর জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ? -- ২৯

৯. সনাতন ধর্মে বৈদিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় নারী মন্ত্রণালয় ও নারীর অবদান ---------------------- ৩০

১০. ঈশ্বর সত্যিই থাকলে প্রার্থনা করার পরেও কেন দুঃখ দূর হচ্ছে না ? ------------------ ৩৫

১১. নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা কিভাবে সম্ভব ? -- ৩৯

১২. সব কিছুই ঈশ্বর সৃষ্টি করলে ঈশ্বরকে কে সৃষ্টি করেছেন ? ---------------------------------- ৫৩

১৩. নিরাকারের স্বরূপ কী ? -- ৫৭

১৪. হস্তমৈথুন নিয়ে সনাতন ধর্মের শাস্ত্রীয় বিধান কি ? বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা ------------- ৬০

১৫. আর্ষদৃষ্টিতে বাল্যবিবাহের অসুবিধা এবং বিয়ের বয়স ---------------------------------- ৭০

১৬. মহাপুরুষ বা আপ্ত মানবকে কিভাবে চিনবো ? তাঁর বৈশিষ্ট্য কী ? ------------------- ৭২

১৭. বেদে প্রযুক্ত নারীবাচক শব্দ ও তার তাৎপর্য -- ৭৫

১৮. ব্রহ্মচর্য পালন করে বিদ্যালাভের পরই বিয়ে করা উচিত ---------------------------------- ৭৯

১৯. আর্যের দৃষ্টিতে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ -- ৮২

২০. কেন বেদ পড়বেন ? বেদ পড়ার ফল কি ? -- ৮৫

২১. ত্রৈতবাদ কি ও কেন ? -- ৮৭

২২. ঈশ্বরের কি পরিবর্তন হয় ? -- ৯৭

২৩. ওঙ্কারোপাসনা এবং মূর্তি আদি প্রতীকের উপাসনা ---------------------------------- ১০৫

২৪. সত্যার্থ প্রকাশে বাইবেল খণ্ডন ও অনুবাদ নিয়ে খ্রিস্টানদের জালিয়াতির পর্দাফাঁস ---- ১০৯

২৫. মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর ব্রাহ্মসমাজ সমালোচনা ---------------------------------- ১১৭

২৬. কাশী শাস্ত্রার্থ এবং সত্যব্রত সামশ্রমীর নির্লজ্জ মিথ্যাচার? ------------------------------ ১১৯

২৭. দলিত-অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে মহর্ষি দয়ানন্দের দৃষ্টান্ত ---------------------------------- ১২৬

২৮.যত মত তত বিপদ – বেদের পথ মুক্তির পথ -- ১৪৩

মসুরের ডাল সাত্ত্বিক আহার নাকি নিষিদ্ধ ?

জ্যোতি প্রামানিক

মসুর ডাল আমিষ ও নিষিদ্ধ এই ধারণাটি পুরাণ থেকে নেওয়া । বৈষ্ণবরা মসুরের ডাল খান না। তাদের পক্ষে প্রমাণ -

জম্বীরমামিষং চূর্ণমন্নং পর্য্যুষিতং দ্বিজ । ধান্যে মসূরিকা প্রোক্তা
গবাং দুগ্ধমনামিষম। ।লবণং ভূমিজং বিপ্র প্রাণ্যঙ্গমামিষং খলু।
দ্বিজক্রীতা রসাঃ সর্ব্বে জলং চাল্পসরঃস্থিতম। ।

[পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড ৪৭।১৮-১৯]

অনুবাদঃ দ্বিজ! জম্বীর , পর্যুষিত [বাসি] অন্ন এবং ধান্য [শস্য] মধ্যে মসূরিকা আমিষ বলে প্রোক্ত। গোরুর দুধ ও ভূমিজ লবণ আমিষ না । প্রাণীর অঙ্গ সমস্তই আমিষ বলে জানবে । দ্বিজক্রীত সর্ববিধ রস এবং অল্প সরোবরস্থিত জলও আমিষ।

বৈষ্ণবীয় পুরাণে আমিষ শব্দটি দ্বারা প্রোটিন নয় বরং নিষিদ্ধকে বুঝিয়েছে ।

শ্বেতবর্ণঞ্চ তালঞ্চ মসূরং মৎস্যমেব চ । সর্বেষাং ব্রাহ্মণাঞ্চ ত্যাজঞ্চ সর্বদেশতঃ ॥
[ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ব্রহ্মখণ্ড ২৭।২৭]

অনুবাদঃ সকল দেশে সমস্ত ব্রাহ্মণেরই শ্বেত তাল, মসূর ও মৎস্য পরিত্যাজ্য ।

কিন্তু বেদশাস্ত্রই হবে আমাদের মূল নির্দেশনা । ভগবান গীতায় বলেছেন যথেচ্ছার করলে সিদ্ধি বা মোক্ষ কোনটাই লাভ হবে না ।

বিস্তারিত পড়ুন -
http://back2thevedas.blogspot.com/.../blog-post_30.html...

ভগবান আরো বলেছেন -

তস্মাচ্ছস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি।।
[গীতা ১৬।২৪]

অনুবাদঃ অতএব, কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। অতএব শাস্ত্রীয় বিধানে কথিত হয়েছে যে কর্ম, তা জেনে তুমি সেই কর্ম করতে যোগ্য হও ।

আর সর্বোচ্চ শাস্ত্র বেদ, ' বেদোঽখিলো ধর্মমূলং '। বেদ কেন মূল ও প্রধান ধর্মগ্রন্থ পড়ুন -

https://www.agniveerbangla.org/2021/11/blog-post.html?m=1

বেদে মসুর ডালের উল্লেখ ও যজ্ঞে ব্যবহারাদি --

ব্রীহর্যশ্চ মে যবাশ্চ মে তিলাশ্চ মে মুদগাশ্চ মে খল্বাশ্চ মে প্রিযঙ্গবশ্চ ম্যেণবশ্চ মে শ্যামাকাশ্চ মে নীবারাশ্চ মে গোধূমশ্চ মে মসূরাশ্চ মে যুজ্ঞেন কল্পন্তাম্।।
[যজুর্বেদ ১৮|১২]

পদার্থঃ–(মে) আমার (ব্রীহয়ঃ) চাউল (চ) এবং ষষ্টির ধান (মে) আমার (য়বাঃ) যব (চ) এবং অড়হর (মে) আমার (মাষাঃ) মাষকলাই (চ) এবং মটর (মে) আমার (তিলাঃ) তিল (চ) এবং নারিকেল (মে) আমার (মুদগাঃ) মুগ (চ) এবং তাহার তৈরী করা, (মে) আমার (খল্বাঃ) ছোলা (চ) এবং তাহার সিদ্ধ করা, (মে) আমার (প্রিয়ঙ্গবঃ) ধান্য বিশেষ (চ) এবং তাহার তৈরী করা (মে) আমার (অণবঃ) সূক্ষ্ম চাউল (চ) এবং তাহার পাক (মে) আমার (শ্যামাকাঃ) শ্যামা (চ) এবং ছোট ছোট অন্ন (মে) আমার (নীবারঃ) ধান যা বিনা বপনেই উৎপন্ন হয় (চ) এবং তাহার পাক (মে) আমার (গোধূমঃ) গম (চ) এবং তাহা পাক করা তথা (মে) আমার (মসূরাঃ) মসূর (চ) এবং তৎসম্পর্কীয় অন্যান্য অন্ন এই সমস্ত (যজ্ঞেন) সকল অন্নের দাতা পরমেশ্বরের দ্বারা (কল্পন্তাম্) সমর্থ হউক।

সকল অন্নের দাতা পরমেশ্বরের দ্বারা (কল্পন্তাম্) সমর্থ হউক।

ড. তুলসীরাম শর্মার অনুবাদে -

My paddy and rice, and my barley, and my beans, and my sesamums, and my mungo beans, and my legumins, and my long pepper, and my small grains, and my millet, and my wild grains, and my wheat, and my lentils and all other grains, and their preparations, may all these grow in plenty, rich and delicious, by yajna and scientific treatment for all.

পৌরাণিক ভাষ্যকার মহীধর -

ব্রীহিয়বমাষতিলমুদগগোধূমমসূরাঃ প্রসিদ্ধাঃ । খল্বাঃ চণকাঃ লঙ্গাশ্চ । প্রিয়ঙ্গবঃ কঙ্গবঃ প্রসিদ্ধাঃ । অণবশ্চীনকাঃ । শ্যামাকাস্তৃণধান্যানি গ্রাম্যাণি কোদ্রবত্বেন প্রসিদ্ধানি । নীবারাস্তৃণধান্যান্যারণ্যানি । এতে ধান্যবিশেষা মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥

শ্রী দিলীপ কুমার পৌরাণিকোত্তমকৃত মহীধর ভাষ্যানুবাদ -

ধান্য, যব, কলাই, তিল, মুগ, ছোলা, প্রিয়ঙ্গব, চীনক, শ্যামক, নীবার, গোধূম এবং মসুর—এগুলি আমার যজ্ঞের দ্বারা সম্প্রাপ্ত হোক।

অতঃ বেদে মসুরের ডালের উল্লেখ ও অনুমোদন পাওয়া যাওয়ায় এটাই আমাদের জন্য মান্য ।

বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী শূদ্র কে ?

জ্যোতি প্রামানিক

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে শূদ্রকে পায়ের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে ।

ব্রাহ্মণোস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভাংশূদ্রো অজায়ত।।

[ঋগ্বেদ ১০।৯০।১২]

সরলার্থঃ ব্রাহ্মণ [জ্ঞানী পুরুষ] এই পুরুষের মুখ হয়, ক্ষত্রিয় [পরাক্রমীব্যক্তি] এই পুরুষের বাহু। যাহা এই পুরুষের উরু তাহা বৈশ্য [পোষণশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি] এবং পা শূদ্ররূপে [সেবাধর্মী ব্যক্তিরূপে] প্রকট হয়।

বিবিধ ব্যক্তিগণ এই উপমাকে হীনসূচক হিসেবে মনে করেন ।পূর্বাপর সামান্য পড়লেই বোঝা যায় তাদের এই চিন্তা অমূলক । কেননা পরবর্তীতে একই সূক্তে ইত্যাদিকেও পাদস্থানীয় উল্লেখ করা । অথচ এগুলোর কোনটিকেই নিন্দনীয় হিসেবে বিবেচনা করা হয় না ।

বিস্তারিত পড়ুন -

https://www.agniveerbangla.org/2023/07/blog-post.html?m=1

শরীরের কঠিন কাজ পা দিয়ে সম্পন্ন হয় । প্রয়োজন হলে পা হাতকে সাহায্য করতে পারে । সমাজে শূদ্রের সেইরকম অবস্থান । এ যেহেতু সমাজের নিম্ন বর্গ অর্থাৎ বিশেষ করে আর্থিক দিক দিয়ে নিম্ন , শরীরের নিম্নাংসের মতো এর উপর সম্পূর্ণ সমাজ নির্ভরশীল । দরকারবোধে শূদ্র ক্ষত্রিয়ের কাজও করতে পারে । শূদ্রেরা শারীরিক দিক দিয়ে সামর্থ্যবান , তাদের এই সামর্থ্যকে নানা ভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে । পা আমাদের শরীরকে উপরে উঠিয়ে রাখে । এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায় । স্বয়ং কাদা-মাটি-ধুলায় যুক্ত থাকলেও , শরীরের অন্য ভাগকে পরিস্কার রাখতে সাহায্য করে । পায়ের কাজই হল শরীরের সেবা করা– এটা তার প্রথম গুণ । কোন বিশেষ গুণ পায়ে থাকে না অথচ পা না হলে শরীর চলতেও পারে না ।

সংস্কার বিধিতে মহর্ষি দয়ানন্দ শূদ্র সম্পর্কে বলেছেন–

"যে বিদ্যাহীন , পড়ালেও যার বিদ্যা হয় না , শারীরিক শক্তি সামর্থবিশিষ্ঠ , সেবায় কুশল সেই শূদ্র । রাষ্ট্রের সব শিশুকে শিক্ষার জন্য গুরুকুলে পাঠাতে হবে । সেখানে যে শিশু পড়াশোনার অবসর পাওয়া সত্ত্বেও পড়তে পারে না এবং এমন কোন কাজ করতে পারেনা , যার জন্য বুদ্ধি-কৌশলের প্রয়োজন হয় , তাকে শূদ্র বলা হবে । তাকে জীবিকার জন্য শারীরিক কর্মের (manual) উপর নির্ভর করতে হবে । এইজন্য পুরুষ সূক্তে বর্ণিত 'পদভ্যাং শূদ্রো অজায়ত' দ্বারা পায়ের সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়েছে ।

এখানে পা থেকে শূদ্রের উৎপত্তি আক্ষরিক অর্থে বলা যুক্তিহীন । প্রথমতঃ ঈশ্বরের হাত-পা হয় না , দ্বিতীয়ত মানুষের মতো পা হলে শূদ্র কি সব পায়ের মতো হয়ে যাবে ? এছাড়া যজুর্বেদ 'তপসে শূদ্রম্' [৩০।৪] বাক্যেও শূদ্রের কর্তব্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে । 'তপঃ'র অর্থ কষ্ট সহ্য করা । 'তপঃ'র সম্বন্ধে বেদে অন্যত্র ব্রাহ্মণাদির ক্ষেত্রেও বর্ণিত আছে । ব্রাহ্মণাদির জন্য তপস্যা শরীর সম্পর্কীয় স্থূল কষ্ট ব্যথিত মন ও আত্মা সম্পর্কীয় সূক্ষ্ম কষ্ট সহ্য করতে হয় । শূদ্রের তপে সেই সূক্ষ্মতা নেই । । বুদ্ধি প্রয়োগ করে যত কাজ আছে (Standard) ততদূর যে পৌঁছাতে পারবে না , সে শূদ্র নামে অভিহিত হবে ।

এই প্রকার কোন বর্ণ প্রাপ্ত করার জন্য নিম্নতম যোগ্যতার নির্ণয় রাজ্য করবে । যে ব্যাক্তি নির্ধারিত যোগ্যতা প্রাপ্ত করবে সে সেই বর্ণের বলা হবে । কোন ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় তার মাতা-পিতার নির্ণয়াত্মক হবে না । প্রত্যেক ব্যক্তি রাজ্য নিয়ম অনুযায়ীই কোন বর্ণ প্রাপ্ত হতে পারবে । নিশ্চিত রাজ্য-নিয়ম মতো গুরুকুল শিক্ষণ সংস্থার আচার্যাদি ব্যক্তিরা কোন বর্ণের উদেঘাষণা করতে পারবেন । এই বিষয়ে রাজ্য– নিয়ম উলঙ্ঘনকারী লোকেরা রাজ্যের পক্ষ থেকে দণ্ডনীয় হবে ।

' শূদ্র ' শব্দটি শুচ্ ধাতু [শোকার্থক - ভ্বাদি] 'শুচের্দশ্চ' [উণা০ ২।১৯] সূত্রে 'রক্' প্রত্যয়, উকারকে দীর্ঘ, চ - দ হয়ে নিষ্পন্ন হয় । যে কোন কুলে উৎপন্ন অশিক্ষিত হয়ে থাকা ব্যক্তি শূদ্র বর্ণের । 'শূদ্রঃ শু দ্রবতি, আয়ু দ্রবতি ' অর্থাৎ যে অশিক্ষিত হওয়ার কারণে নিযুক্ত হয়ে গমনাগমন, সেবা ও শ্রমের কাজ করে । এখানে শূদ্রের কাজটি বৃত্তিমূলক । পেশা নয় । পেশায় দ্বিজত্ব ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন । এজন্যই একজন প্রকৌশলী ও শ্রমজীবী যথাক্রমে পেশা ও বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে ।

শূদ্রঃ = শোচনীয়ঃ শোচ্যাং স্থিতিমাপন্নো বা, সোবায়াং সাধুর্ অবিদ্যাদিগুণসহিতো মনুষ্যো বা = শূদ্র সেই ব্যক্তি যে মানবযোনীতে জন্মগ্রহণের পর স্বীয় বিদ্যাহীনতার জন্য উপরস্থ বর্ণ প্রাপ্ত করতে পারে না তথা সেই বর্ণ লাভের জন্য সদা চিন্তা করে কিংবা নিয়োজক দ্বারা যার ভরণপোষণের চিন্তা করা হয় এমন সেবাদানকারী ।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও পাওয়া যায় ' অসতো বা এষ সম্ভুতো যৎ শূদ্রঃ' [তৈ০ ব্রা০ ৩।২।৩।৯] । অসতঃ = অবিদ্যাতঃ । বিদ্যাহীনতার জন্য শিক্ষাগতভাবে যার অবস্থান নিম্ন ও শুধুমাত্র দৈহিক বলে সেবাদি কাজই করতে সক্ষম এমন মানুষ শূদ্র । কিন্তু জীবনে সে চাইলে শিক্ষা অর্জন করে উচ্চ বর্ণ লাভ করতে পারে [মনু০ ১০।৬৫] শূদ্রের কর্তব্য নির্ধারণে শূদ্রের প্রকৃত স্বরূপ মহর্ষি মনুর দৃষ্টিতে কেমন তা বোঝা যায় ।

মহর্ষি মনু শুচিঃ = পবিত্র [শারীরিক ও মানসিক ভাবে] এবং উৎকৃষ্ট শুশ্রূষুঃ = উত্তম সেবক - এমন বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন [৯।৩৩৫] । এতে সুস্পষ্ট হয় যে, মহর্ষি মনু শূদ্রদের প্রতি হীনভাব বা অস্পৃশ্যতার সমর্থক ছিলেন না বরং এমন শ্লোক প্রক্ষিপ্তই ।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ [১।৪।১৩]তে বলা হয়েছে -

স নৈব ব্যভবৎ স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত পূষণমিয়ং বৈ পূষেয়ং হীদং সর্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ ॥

অর্থাৎ, শূদ্রই ' পূষণম্ ' । পৃথিবীই পূষা কেননা এই পৃথিবীই তদুপৃষ্ঠে স্থিতকে পোষণ করে । যেই ভূমিতে আমরা সকল প্রাণী স্থিত সেই পৃথিবী নিজেই পূষা অর্থাৎ তাকেও শূদ্রবর্ণস্থ ধরা হচ্ছে ।

যেই ভূমিতে আমরা সকল প্রাণী স্থিত সেই পৃথিবী নিজেই পূষা অর্থাৎ তাকেও শূদ্রবর্ণস্থ ধরা হচ্ছে । এমতাবস্থায় সেই বর্ণের মানব কিভাবে অস্পৃশ্য - অশুচি হতে পারে ?

কেননা সর্বকুলে থেকে সবার সেবক কিভাবে অস্পৃশ্য বা অপবিত্র হতে পারে ? মনু শূদ্রকে অস্পৃশ্য মানতেন না । বরং মহর্ষি মনুর মতানুসারে চার বর্ণের অন্তর্গত হওয়ার কারণে শূদ্র সবর্ণ ও আর্য [১০।৪,৪৫,৫৭] শূদ্র জন্মগত হয় না, বরং সেই ব্যক্তিই শূদ্র যে উপনয়ন লাভ করে ব্রহ্মজন্ম অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন রূপ দ্বিতীয় জন্ম লাভ করতে পারে না । দ্বিজ = দ্বির্জায়তে ইতি দ্বিজঃ, শূদ্রের এই দ্বিজত্ব চূড়ান্তভাবে লাভ না হওয়াতে তাকে বলা হয়েছে 'চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রঃ' অর্থাৎ একজাতিঃ = একজন্ম ।

শূদ্রের উপনয়নের উল্লেখ কেন নেই শাস্ত্রে -

https://www.agniveerbangla.org/2020/06/blog-post_28.html?m=1

‘জন্ম হোক যথা তথা-কর্ম হোক ভাল’ । নিম্ন বংশ বিশেষে উৎপন্ন হওয়ার কারণে কোন ব্যক্তি শূদ্র হয় না , যার মধ্যে জ্ঞান শক্তির নূন্যতা আছে সে শূদ্র , তাই সে উচ্চবংশে জন্ম গ্রহণ করুক না কেন ? শূদ্র কোন প্রকার ঘৃণার পাত্র নয় (আমরা কি নিজের পা–কে ঘৃণা করি?) বরং অনুকম্পা , স্নেহপূর্ণ দয়া ও প্রেমের পাত্র ।শূদ্রের শব্দার্থ– ‘শূচং দ্রাবয়তি’ যাকে দেখে লোকের মনে দয়া উৎপন্ন হয় যে , দেখ , বেচারা কোন কারণে জ্ঞান অর্জন করতে পারেনি , শিক্ষা যোগ্যতা লাভ করতে পারেনি , সুতরাং প্রেমের পাত্র , ঘৃণার পাত্র নয় , এইজন্য বেদে বলেছে –

রুচং নো ধেহি ব্রাহ্মণেষু রুচং রাজসু নস্ফাধিঃ।রুচং বিশ্যেষু শূদ্রেষু, ময়ি ধেহি রুচা রুচম্।।

[যজুর্বেদ ১৮।৪৮]

অর্থাৎ– হে পরমাত্মন্ ! আপনি ব্রাহ্মণ মধ্যে আমাদের প্রেম দিন , ক্ষত্রিয় মধ্যে আমাদের প্রেম দিন , বৈশ্য মধ্যে আমাদের প্রেম দিন এবং শূদ্র মধ্যে আমাদের প্রেম দিন , আপনি প্রেম দ্বারা আমাদের মধ্যে প্রেম উৎপন্ন করুন ।

বর্তমান কালে জন্মের উপর আশ্রিত যে বর্ণব্যবস্থা ভারতীয় হিন্দু সমাজে প্রচলিত হয়ে গিয়েছে এবং তার ফলে শূদ্রের উপর যে ঘৃণার ভাব পাওয়া যায় , সে সব বেদরহস্য না বোঝার কারণে ।

প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কৃণু।প্রিয়ং সর্বস্য পশ্যত উত শূদ্র উতার্য্যে।।

[অথর্ববেদ ১৯।৬২।১]

অর্থাৎ আমাকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে প্রিয় কর , আমাকে বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে প্রিয় কর ।

বৈদিক বর্ণব্যবস্থা -
https://www.agniveerbangla.org/2021/07/blog-post_20.html?m=1

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী সত্যার্থ প্রকাশে শূদ্রদের আর্য বর্ণব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তই ধরেছেন । পাশাপাশি শূদ্রকে অনার্য যেখানে বলেছেন ঠিক তার সাথেই আনাড়ী বলেছে অনার্য অর্থ এখানে যে আর্য বর্ণাশ্রমের সাথে সম্পৃক্ত নয় তা সুস্পষ্ট করেছেন । যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় [২।২] অর্জুনকে আর্য ক্ষত্রিয় হওয়া সত্ত্বেও গুণ ও বৈশিষ্ট্যবাচক বিশেষণরূপে 'অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন' বলেছেন । শূদ্রের বেদাধিকার যেমন যজুর্বেদ ২৬।২ দ্বারা স্বীকার ও সমর্থন করেছেন পাশাপাশি ৩য় সমুল্লাসে আরো বলেছেন -

পরমেশ্বর কি শূদ্রদের মঙ্গল করতে ইচ্ছা করেন না? তিনি কি পক্ষপাতী যে, বেদের অধ্যয়ন এবং শ্রবণ শূদ্রদের জন্য নিষিদ্ধ এবং দ্বিজদের জন্য বৈধ করলেন? যদি শূদ্রদের সকলকে বেদ পড়ার ও শোনানোর অভিপ্রায় তাঁর না থাকত তা হলে তিনি শূদ্রদের শরীরে বাক্, শ্রোত্রেন্দ্রিয় রচনা করলেন কেন? পরমাত্মা যেমন সকলের জন্য পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য এবং অন্নাদি যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করেছেন, তেমন বেদও সকলের জন্য প্রকাশ করেছেন ।

ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদে অসংখ্যস্থলে পঞ্চজনের উল্লেখ পাওয়া যায় পঞ্চ মানবাঃ [অথর্ববেদ ৩।২১।৫], পঞ্চমানুষাঃ [ঋগ্বেদ ৮।৯।২], পঞ্চজনাঃ [ঋগ্বেদ ১০।৪৫।৬] । ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩।৩১।৫ দেব - মনুষ্য - গন্ধর্ব - পিতর - অপ্সরস্ -সর্প, যাস্ক নিরুক্ত ৩।৮ এ পূর্ব প্রকারভেদেই অপ্সরস্ স্থলে অসুর ও ঔপমন্যবের মত প্রদর্শন করে চারবর্ণ ও নিষাদ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন । আর নিঘণ্টু ২।৩ অনুযায়ী 'পঞ্চজনাঃ' 'মনুষ্য'র পর্যায়বাচী শব্দ । অর্থাৎ পঞ্চজনা সমস্ত মানবই নির্দেশ করে । অথর্ববেদে বলা হয়েছে -

ইমা যাঃ পঞ্চ প্রদিশো মানবীঃ পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ। বৃষ্টে শাপং নদীরিবেহ স্ফাতিং সমাবহান্ ॥

[অথর্ববেদ ৩।২৪।৩]

অর্থাৎ, পঞ্চদিকে যে পঞ্চপ্রকার মানব [ব্রাহ্মণ - ক্ষত্রিয় - বৈশ্য - শূদ্র ও নিষাদ=চারবর্ণের বাইরে যে] তারাও যেন সমৃদ্ধি লাভ করে ।

বিশ্বস্য কেতুর্ভুবনস্য গর্ভ আ রোদসী অপৃণাজ্জায়মানঃ । বীলুং চিদদ্রিমভিনৎপরায়ঞ্জনা যদগ্নিময়জন্ত পঞ্চ ॥

[ঋগ্বেদ ১০।৪৫।৬]

অর্থাৎ, পঞ্চজন = মানবমাত্রেই অগ্নিহোত্রে অগ্নির = পরমাত্মার যজন=পূজা করে ।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, শূদ্র বর্ণ জন্মভিত্তিক নয় । যজ্ঞে অংশগ্রহণের অধিকার বিদ্যমান । শাস্ত্রীয় প্রেক্ষাপটে যেখানে অনধিকার দৃষ্ট হয় তা স্বীয় বিদ্যাহীনতার জন্যেই উক্ত কর্মে অনধিকার । মানবাধিকারে ও আর্যত্বের মৌলিক নীতিতে চতুর্বর্ণের মধ্যে মৌলিক কোন ভেদাভেদ নেই ।

অপপ্রচার খণ্ডনঃ যে ব্যক্তির স্ত্রীর সংখ্যা পশুর সংখ্যার থেকে বেশী তিনিই কি ভাগ্যবান ?

জ্যোতি প্রামানিক

অপপ্রচারঃ শতপথ ব্রাহ্মণ(২/৩/২/৮) "সেই ব্যক্তিই ভাগ্যবান যার পশুর সংখ্যা তার স্ত্রী সংখ্যার চেয়ে বেশী। "

উত্তরঃ উল্লেখিত মন্তব্য অনলাইনের বিবিধ নাস্তিক্যবাদী ও বিধর্মী সাইটে বহুল প্রচলিত । বাংলা ও ইংরেজি নানা বইতেও এই উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয় । মূলতঃ এই বাক্যের মূল উৎস্য ডঃ সুকুমারী ভট্টাচার্য কর্তৃক রচিত নারী বিষয়ক নানা প্রবন্ধ, বিশেষতঃ 'বিবাহ প্রসঙ্গে' বইটিতে । David history ' বিবাহ মানে এখন আমরা বুঝি ঐক্যদাম্পত্য (monogamy) এক স্বামী, এক স্ত্রী। কিন্তু বহুপতিকতা আঞ্চলিকভাবে এখনো আছে, প্রাচীনকালে ছিল। আর বহুপত্নীকতা তো সেদিন অবধি বেশ জমাট ভাবেই ছিল, আইন করে বন্ধ করা হল। প্রাচীনকালে বিত্তবান ব্যক্তির বিজ্ঞাপন ছিল পশুসম্পদ আর পত্নীসংখ্যা। | শাস্ত্রে যখন বলে, সেই ব্যক্তিই ভাগ্যবান যার পশুর সংখ্যা তার স্ত্রীর সংখ্যার চেয়ে বেশী। [সমৃদ্ধং যস্য কনীয়াংসো ভার্যা আসন ভূয়াংসঃ পশবঃ- শতপথব্রাহ্মণ ২/৩} ২/৮] তখন সহজে বোঝা যায় স্ত্রীর সংখ্যা কত ছিল। সাম্প্রদায়িকতার ঝাঁঝে আজ বলা হয়ে থাকে মুসলমানের দুর্নীতির একটা প্রমাণ হল, সে চারটে বিয়ে করতে পারবে, যদিও বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখি, খুব কম মুসলমানই চারটি স্ত্রীর স্বামী। এই সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্ট উক্তি শুনল প্রথমেই মনে হয়: আর কুলীন | ব্রাহ্মণের তো চার স্ত্রীতে কুলোতই না।'

সূত্রঃ বিবাহ প্রসঙ্গে , ড. সুকুমারী ভট্টাচার্য , পৃষ্ঠা ২৯ । অক্টোবর ২০১০ সংস্করণ ।

প্রকৃতক্ষেই কি শতপথ ব্রাহ্মণে তাই আছে ? নাকি বিধর্মীদের নীতি 'জায়েজ' করার জন্য পশ্চিমবঙ্গীয় বামধারার লেখকদের চিরকালীন মিথ্যাচারের আরেক দৃষ্টান্ত মাত্র ? আজ আমরা এই বাক্যের যথার্থতা সম্পর্কে বিচার করব ।

প্রথমতঃ শতপথ ব্রাহ্মণ বেদ নয় । এটা বেদের যাজ্ঞিক ব্যাখ্যা ও বিনিয়োগের আদিস্রোত । ক্ষেত্র বিশেষে আধ্যাত্মিক তাৎপর্য নির্ণয় করা হয়েছে ।

দ্বিতীয়তঃ উক্ত রেফারেন্স অনুযায়ী আমরা পাচ্ছি -

নবাবসিতে বৈনমাহরেয়ুঃ । তস্মিন্পচেয়ুস্তদ্ব্রাহ্মণা অশ্নীয়ুর্যদ্যু তন্ন বিন্দেদ্যৎপচেদপি গোরেব দুগ্ধমধিশ্রয়িতবৈ ব্রূয়াত্তস্মিন্ব্রাহ্মণান্পায়যিতবৈ ব্রূয়াৎপাপীয়াংসো হ বা অস্য সপত্না ভবন্তি যস্যৈবং বিদুষ এবং কুর্বন্তি তস্মাদেবমেব চিকীর্ষেৎ

[শতপথ ব্রাহ্মণ ২.৩.২.৮]

অনুবাদঃ অথবা তাঁহারা ইহাকে নূতন গৃহে আহরণ করিবেন; এবং তাহাতে পাক করিবেন ও ব্রাহ্মণেরা তাহা ভোজন করিবেন৷ তিনি (যজমান) পাক করিতে পারেন এমন কিছু না পাইলে গাভীর দুগ্ধই তাহাতে (পাকের নিমিত্তে) স্থাপন করিবার জন্য (অধ্বর্য্যুকে) বলিবেন, এবং তিনি (অধ্বর্য্যু) তাহা ব্রাহ্মণগণকে পান করাইবার জন্য (যজমানকে) বলিবেন। যিনি এইরূপ জানেন এবং যাহার সম্বন্ধে তাঁহারা এরূপ করেন, তাঁহার শত্রুগণ হীনতর হয়৷ অতএব তিনি এইরূপই করিতে ইচ্ছা করিবেন।

[পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য কৃত বঙ্গানুবাদ]

পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায়ের হিন্দি অনুবাদ বঙ্গানুবাদের অনুরূপ ।

প্রফেসর ওয়েবারের ইংরেজি অনুবাদঃ

Or they may also take it over to a new dwelling; and let them then cook on it food (other than meat) for the priests to eat. And should he not be able to procure anything to cook, let him order the milk of a cow to be put thereon and let the priests be asked to drink it. And his enemies will indeed fare ill, for whomsoever, knowing this, they do so: let him, therefore, endeavour by all means to do so.

এই শতপথের বিধান অনুযায়ীই কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র [৪.৩.১০-১১] বলেছে -
আমিক্ষায়ামুভয়োস্তন্নির্বৃত্তেঃ ১০ নৈকচোদনাৎ ১১

লক্ষ্যণীয় মূল কণ্ডিকায় সুকুমারী ভট্টাচার্য উল্লেখিত বাক্যাংশের কোন উল্লেখই নেই । সুতরাং তিনি উদ্ধরণ সূত্র প্রদানেই ভুল করেছেন ।

প্রকৃতপক্ষে শতপথ ব্রাহ্মণের উক্ত কাণ্ডটি হল একপাদিকাণ্ডম্ । পূর্ব্বাহুতি অল্পতর, ও উত্তরাহুতি তদপেক্ষা অধিকতর হবে, এবং স্রুকে যা অবশিষ্ট থাকবে তা এটি অপেক্ষাও অধিকতর হবে, এটিই প্রতিপাদনের জন্য পূর্বাহুতি, উত্তরাহুতি এবং স্রুকে অবশিষ্ট হবির যথাক্রমে দেব, মনুষ্য ও পশু-রূপে বর্ণনা, দেবগণ[বিদ্বান অপেক্ষা মনুষ্যগণ অধিকসংখ্যক, আবার মনুষ্যগণ অপেক্ষা পশুসমূহ অধিকসংখ্যক, এইরূপ হোম করলে হোমকারীর পণ্যসমূহ অধিক সংখ্যক ও পোষ্যবর্গ অল্প সংখ্যক হয়।

অধিকতর অনুসন্ধানের পর আমরা উক্ত। বাক্যাংশটি আরো ১০ কণ্ডিকার পরে খুঁজে পাই।

স যৎকনীয় ইব পূর্বামাহুতিং জুহোতি । কনীয়াংসো হি দেবা মনুষ্যেভ্যোথ যদ্ভূয় ইবোত্তরাং ভূয়াংসো হি মনুষ্যা দেবেভ্যোথ যদ্ভূয় ইব স্রুচি পরিশিনষ্টি ভূয়াংসো হি পশবো মনুষ্যেভ্যঃ কনীয়াংসো হ বা অস্য ভার্যা ভবন্তি ভূয়াংসঃ পশবো য এবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি তদ্বৈ সমৃদ্ধং যস্য কনীয়াংসো ভার্যা অসন্ভূয়াংসঃ পশবঃ

[শতপথ ব্রাহ্মণ ২.৩.২.১৮]

অনুবাদঃ তিনি যে পূর্ব্বাহুতিকে অল্পতর করিয়া হোম করেন, তাহার কারণ এই যে, দেবগণ মনুষ্যগণ হইতে অল্পতর ; আর যে তিনি উত্তরাহুতিতে তদপেক্ষা অধিকতর করিয়া হোম করেন, তাহার কারণ এই যে, মনুষ্যগণ দেবগণ অপেক্ষা অধিকতর; আর যে তিনি স্রুকে (তদপেক্ষাও) অধিকতর অবশিষ্ট রাখে, তাহার কারণ এই যে, পশু সমূহ মনুষ্যগণ অপেক্ষা অধিকতর ; যে ব্যক্তি এই রূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র করেন, তাহার প্রতিপাল্যসমূহ অল্পতর ও পশু সমূহ বহুতর হইয়া থাকে ; যাঁহার প্রতিপাল্যসমূহ অল্পতর ও পশুসমূহ বহুতর হয়, তাঁহারই তাহা সমৃদ্ধির জন্য হইয়া থাকে।

[পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য কৃত বঙ্গানুবাদ]

পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায়ের হিন্দি অনুবাদ বঙ্গানুবাদের অনুরূপ ।
প্রফেসর ওয়েবারের ইংরেজি অনুবাদঃ

The reason why he offers only a little for the first libation, is that the gods are fewer than men; and why he offers somewhat more for the second libation, is that men are more numerous than the gods; and why he leaves still more in the ladle, is that cattle are more numerous than men. And, verily, whosoever, knowing this, offers the Agnihotra, his cattle will be more numerous than those (human beings) that have to be supported by him: for he, indeed, is in a prosperous condition whose cattle are more numerous than those (human beings) dependent on his support.

কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র [৪.১৪.১৭-১৮] এই বিষয়ে বিনিয়োগ দর্শিয়েছে নিম্নোক্তরূপ -
তূষ্ণীমুত্তরাং ভূয়সীম্। ভূয়িষ্ঠং স্রুচি।

উপমাদ্যোত্তরামসংসৃজংস্তূষ্ণীং ভূয়মীং পূর্বচাঃ। স্রুচি ভূয়িষ্ঠং কুর্যাৎ । [অগ্নিহোত্র প্রকরণম্]
দেখা যাচ্ছে সুকুমারী ভট্টাচার্য যে অর্থ বলেছেন তার কোন উল্লেখই এখানে নেই । প্রসঙ্গতঃ অনেকেই এখানে ভার্যা পদটি নিয়ে আপত্তি করতে পারেন । তাদের উদ্দেশ্য পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও তদানুমতালম্বীদের জন্য সায়ণাচার্যকৃত ব্যাখ্যাও উল্লেখ করা হলঃ

স যৎ কনীয ইতি । ভার্যা ভবন্তীতি । মর্তব্যাঃ প্রজা ভবন্তীত্যর্থ ।
শ্রীহরি স্বামী তার ভাষ্যেও একই ব্যাখ্যা করেছেন ।

অর্থাৎ এখানে ভার্যা তথা স্ত্রী অর্থ নয় । বরং যাদের ভরণপোষণ করা হচ্ছে তথা 'ভার্য' শব্দটিই মূল যা আশ্রিতদেরকে বলা হয়েছে । আর্যসমাজের পণ্ডিত গঙ্গপ্রসাদ উপাধ্যায় তার শতপথ ব্রাহ্মণের হিন্দি অনুবাদে তা উল্লেখও করেছেন ।

বৈদিক শাস্ত্রে বিবিধ শব্দ একাধিক অর্থে প্রযুক্ত হয় । উদাহরণ স্বরূপ আমরা যথাক্রমে সংস্কৃত শব্দ - লৌকিক অভিধান অনুযায়ী অর্থ ও নিরুক্তগত অর্থ প্রদর্শন করছি ।

১. অহি - সাপ - মেঘ [নিঘণ্টু ১.১০]
২. বরাহ - শূকর - মেঘ [নিঘণ্টু ১.১০]
৩. পর্বত - বৃহৎ পাহাড় - মেঘ [নিঘণ্টু ১.১০]
৪. সমুদ্র - সর্ব বৃহৎ জলাধার - অন্তরীক্ষ [নিঘণ্টু ১.৩]
৫. পুষ্কর - পুকুর - অন্তরীক্ষ [নিঘণ্টু ১.৩]
এছাড়াও গো শব্দের একাধিক অর্থ [নিঘণ্টু ১.১] তথা বাণী, রশ্মি, পৃথিবী হয় তা সংস্কৃত পাঠক মাত্রেই অবগত রয়েছেন ।

অতঃ ড. সুকুমারী ভট্টাচার্য কর্তৃক উক্ত উদ্ধহরণ যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও বিকৃত তা প্রমাণিত।

দৃষ্টসহস্রচন্দ্রঃ ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার বিস্ময়

গৌরব চৌধুরী

প্রাচীন ভারত ছিল জ্ঞান বিজ্ঞানের লীলাভূমি। এখানেই বসে প্রাচীন মুনি ঋষিরা বিভিন্ন শাস্ত্র রচনা করেছিলেন। সেই সব শাস্ত্র হতে এখনো বিজ্ঞানের বিবিধ বিস্ময়কর বিষয়ের ধারণা পাওয়া যায়। তেমনই একটি বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করা হবে। সেটি হলো "দৃষ্টসহস্রচন্দ্রঃ"। দৃষ্টসহস্রচন্দ্রঃ শব্দটি দ্বারা এমন মানুষকে বোঝায়, যিনি সহস্র চন্দ্র দর্শন করেছেন। কিন্তু পৃথিবীর তো চন্দ্র একটি। তাহলে পৃথিবী হতে কিভাবে সহস্র দর্শন করা সম্ভব ? তাই এই শব্দটি দিয়ে মূলত সহস্রটি পৃথক চন্দ্রকে দর্শন করা বোঝায় না, বরং একটি চন্দ্রকেই পূর্ণরূপে সহস্রবার দর্শন করা বোঝায়।

চন্দ্রে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়। প্রতি পূর্ণিমায় চন্দ্রকে পূর্ণরূপে দেখতে পাওয়া যায়। দৃষ্টসহস্রচন্দ্রঃ-এর সহস্র চন্দ্র দিয়ে মূলত এই সহস্রবার পূর্ণিমার চন্দ্রকেই নির্দেশ করে। অর্থাৎ দৃষ্টসহস্রচন্দ্রঃ হলো এমন এক ব্যক্তি যিনি সহস্র পূর্ণিমার চাঁদ দর্শন করেছেন । এখন একজন ব্যক্তির দৃষ্টসহস্রচন্দ্রঃ হতে গেলে বা সহস্র পূর্ণিমা দেখতে গেলে কত সময় লাগবে ? এই সময়েরই হিসেব পাওয়া যায় আমার প্রাচীন ভারতের বেদাঙ্গের অর্ন্তগত কল্পশাস্ত্রের বৈখানস গৃহ্যসূত্র নামক গ্রন্থে। এই গৃহ্যসূত্রের ৩য় প্রশ্নের ২১তম খণ্ডের ৫ম সূত্রে বলা হয়েছে–

তদেবং বর্তমানস্য যদ্যষ্টমাসাধিকাশীতিবর্ষাণি রবিবর্ষেণাধিকান্যধিগচ্ছেয়ুঃ স দৃষ্টসহস্রচন্দ্রো ভবতি।

[বৈখানস গৃহ্যসূত্র– ৩।২১।৫]

অর্থাৎ সৌরবর্ষের আশি বর্ষ এবং আট মাস অধিক অতিক্রান্ত হলে যে ব্যক্তি বর্তমান থাকেন, তিনি সহস্র চন্দ্র দর্শন করেন।

এই সূত্রানুসারে, সৌরবর্ষের হিসেবে যদি কোনো ব্যক্তির বয়স ৮০ বছর ৮ মাস হয়, তবে তিনি ১০০০ পূর্ণিমা দেখতে পাবেন। অর্থাৎ এই বয়সে তিনি দৃষ্টসহস্রচন্দ্রঃ হবেন।

এই সূত্রানুসারে, সৌরবর্ষের হিসেবে যদি কোনো ব্যক্তির বয়স ৮০ বছর ৮ মাস হয়, তবে তিনি ১০০০ পূর্ণিমা দেখতে পাবেন। অর্থাৎ এই বয়সে তিনি দৃষ্টসহস্রচন্দ্রঃ হবেন ।

এবার আসা যাক আধুনিক হিসেবের দিকে। আমরা জানি, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে । আবার চাঁদ ঘোরে পৃথিবীর চারদিকে। মজার ব্যাপার হলো, সূর্যও স্থির নয়। সূর্যও ছায়াপথে গতিশীল। এখন, চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আসতে সময় লাগে = ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪০ মিনিট (প্রায়) = ২৭.৩২ দিন (প্রায়)।

কিন্তু এক পূর্ণিমা থেকে আরেক পূর্ণিমা পর্যন্ত সময় ২৭.৩২ দিনের বেশি লাগে। কারণ চাঁদ যেমন গতিশীল, তেমনি পৃথিবী ও সূর্যও গতিশীল। আর পূর্ণিমা হতে হলে চাঁদ, পৃথিবী ও সূর্যকে একই সরল রেখায় অবস্থান করতে হয়। (বৈদিক শাস্ত্রে পূর্ণিমা ও অমাবস্যা হওয়ার প্রকৃত কারণ জানুন–

https://www.agniveerbangla.org/2019/05/blog-post_12.html

পৃথিবী ও সূর্যের গতির কারণে চাঁদ একবার পূর্ণ আবর্তন সম্পন্ন করলেও পূর্ণিমা হতে এর চেয়ে কিছুটা বেশি সময় লাগে । তাই হিসেব অনুসারে, এক পূর্ণিমা থেকে আরেক পূর্ণিমা পর্যন্ত সময় লাগে = ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট = ২৯.৫৩ দিন (প্রায়)।

তাই হিসেব অনুসারে, এক পূর্ণিমা থেকে আরেক পূর্ণিমা পর্যন্ত সময় লাগে = ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট = ২৯.৫৩ দিন (প্রায়)।

তাহলে ১০০০ পূর্ণিমা হতে সময় লাগে = ২৯.৫৩ × ১০০০ = ২৯৫৩০ দিন।
এদিকে আবার, ১ সৌর বর্ষ = ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড = ৩৬৫.২৪ দিন (প্রায়)।

অর্থাৎ, ১০০০ পূর্ণিমা হতে সৌরবর্ষে সময় লাগে = ২৯৫৩০ ÷ ৩৬৫.২৪ = ৮০.৮৫ বছর (প্রায়) = ৮০ বছর 10 মাস (প্রায়)।

অপর দিকে, বৈখানস গৃহ্যসূত্রানুসারে, একজন মানুষের ১০০০টি পূর্ণিমা দেখতে সময় লাগে ৮০ বছর ৮ মাস। অর্থাৎ সূত্রের হিসেব ও আধুনিক হিসেবের মধ্যে সময়ের ব্যবধান মাত্র ২ মাস!

বৈখানস গৃহ্যসূত্রের মতো সূত্রগ্রন্থ লিখিত হয়েছে আজ থেকে সহস্র সহস্র বছর আগে । ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, সেই প্রাচীন সময়ে কোনো আধুনিক যন্ত্র ছাড়াই মাত্র ০.২% হিসেবের ত্রুটি নিয়ে কত বিষ্ময়করভাবে প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরা এসব জ্যোতির্বিদ্যার গাণিতিক হিসেবগুলো করেছিলেন।

শূদ্রকে পায়ের সাথে তুলনা করা কি অসম্মানজনক ?

বর্ণব্যবস্থার সমালোচক ও মহর্ষি মনুর বিরোধীরা আপত্তি করে যে শূদ্রদের উৎপত্তি পা থেকে কেন বলা হলো ? কেননা, এটা খুবই অপমানজনক এবং ঘৃণ্য । যারা এই আপত্তি করে আবেগবশত নিজের অজ্ঞানতার পরিচয় দিয়ে থাকে । এতে করে তারা চারটি ভুল করে থাকে -

১. বর্ণব্যবস্থায় দেহের অঙ্গ থেকে যে রূপক সংজ্ঞায়নের কথা বলা হয়েছে তা ব্যক্তিদের নয় বরং বর্ণের। বর্ণ একবারই সৃষ্টি হয়, অতএব এর উৎপত্তি হয়েছে বলাটাই যুক্তিসংগত না । ব্যক্তি প্রতিদিন জন্মগ্রহণ করে এবং সংখ্যায় কোটি কোটি, কীভাবে তাদের উৎপত্তি হবে ? অতএব তা শূদ্রবর্ণের প্রতীকী প্রকাশ, শূদ্র ব্যক্তির নয়।

২. বর্তমানে যে লোকেরা নিজেদেরকে শূদ্র বলে জানে অনাদিকাল থেকে এবং জন্মসূত্রে শূদ্র মেনে ক্ষোভের সাথে একথা প্রকাশ করে থাকে। মনুর বর্ণব্যবস্থায়, শূদ্র সেই ব্যক্তি হয় যে সঠিকভাবে শিক্ষিত নয়। যে শূদ্র থেকে যায় সে পুনরায় যোগ্যতা অর্জন করে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি হতে পারে। অতএব এই উৎপত্তি কোনও ব্যক্তি বা জাতিবিশেষের সাথে সম্পর্কিত নয়। দলিত লোকেরা ভুলভাবে এই নামটি নিজের উপর চাপিয়ে ব্যর্থ দুঃখী হয়। মনু কোথাও তাদের শূদ্র বলেননি।

৩. আজকের ভাষা এবং আচরণেও পা নিন্দনীয় নয়। চরণস্পর্শ করে আমরা নিজেদেরকে ধন্য মনে করি। আমরা কারও চরণে আশ্রয় নিয়ে নিজেকে কৃতজ্ঞ মনে করি। আমরা কারও চরণবন্দনা করি। কারো চরণে মাথা নত করে। কারো পা টিপে, ধৌত করে, চরণামৃত নিয়ে। ভারতীয় ঐতিহ্যে চরণ কখনই ঘৃণিত ছিল না ।

চরণ স্পর্শ করে প্রণাম ও পাদপ্রক্ষালনের শাস্ত্রীয়তা সম্পর্কে পড়ুন -

https://arsa-parampara.blogspot.com/.../blog-post_7.html...

প্রাচীনত্বের উপর অসংগতভাবে চাপিয়ে দিচ্ছি। একই শরীরের অঙ্গসমূহের মধ্যে এই পার্থক্য কিভাবে সম্ভব? একদিকে আমরা নিজেরাই যুক্তি দিচ্ছি যে একজন পুরুষের থেকে জন্ম নেওয়া চার শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য সম্ভব নয়, অন্যদিকে, আমাদের আপত্তিকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য আমরা নিজেরাই মুখ, পা ইত্যাদির পার্থক্য করছি। আপনি যদি এই দৃষ্টিকোণ থেকে অভিযোগ করেন, বৈশ্যদের উৎপত্তি উরু থেকে বলা হয়, উরুই কি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ? তাহলে তারাও এ বিষয়ে আপত্তি করবে। প্রকৃতপক্ষে, এই দৃষ্টিভঙ্গি কখনও বৈদিক বর্ণব্যবস্থায় ছিল না । এটি আধুনিক পরিবেশের চিন্তাধারার প্রভাব ।

৪. বৈদিক বর্ণব্যবস্থায় শ্রেণীর উৎপত্তি কর্মসমূহের-ব্যবসার তুলনার উপর ভিত্তি করে। উঁচু-নীচের কোনো ভাবনা তার মধ্যে নেই। এটি নিশ্চিত করার প্রমাণ বৈদিক সাহিত্যের পাওয়া যায়। আপত্তিকারীরা এই বিষয়সমূহ নিরপেক্ষ ভাবে অধ্যয়ন করেননি। এ কারণে তাদের চিন্তাধারা সংকীর্ণ থেকে যায়।

এখন আমি পাঠকদের সামনে প্রমাণ উপস্থাপন করছি যা আমার উপরের প্রতিষ্ঠাকে সঠিক প্রমাণ করবে-

(ক) অতি প্রাচীন গ্রন্থ তৈত্তিরীয় সংহিতায় বর্ণসমূহের সাথে অন্যান্য পদার্থের রূপক বর্ণনাও বর্ণিত আছে। সেখানে পা থেকে নিম্নলিখিত পদার্থের উৎপত্তি [আমরা উৎপত্তি শব্দটা ব্যবহার করবো বিরোধীদের দৃষ্টিকোণ থেকে] একত্রে বলা হয়েছে -

একবিংশং নির্ অমিমীত তম্ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। অন্ব্ অসৃজ্যত বৈরাজং
সাম শূদ্রো মনুষ্যাণাম্ অশ্বঃ পশূনাম্ ।

[তৈ০ স০ ৭।১।১।৬]

এখন দেখুন, বৈদিক ঋষিরা শূদ্রের সাথে ঋগ্বেদ এবং সামবেদের মতো ধর্মগ্রন্থের মন্ত্রের উৎপত্তি পা থেকে দেখিয়েছেন, তা কি নিকৃষ্ট হতে পারে ? ঘোড়া কি নিকৃষ্ট প্রাণী ? কেননা সে দ্রুত দৌড়াতে পারে, অতএব পা দিয়ে দ্রুত চলার বিশেষত্বের কারণে এর উৎপত্তি পা থেকে বলা হয়। এখানে-সেখানে আসা-যাওয়ার সেবা-চলাফেরা করা কাজ 'পা' এর উপর ভিত্তি করে হয় এ কারণে শূদ্রের তুলনা চলার অঙ্গ 'পা'-এর সঙ্গে দেখানো হয়েছে । এর মধ্যে কোথাও কোনো হীনমন্যতা বা ঘৃণাবোধ নেই। মনে রাখবেন, শূদ্র এখানে বেদমন্ত্রের সমতুল্য ।

(খ)প্রাচীন গ্রন্থে পা থেকে শূদ্রের উৎপত্তি কেন বলা হয়েছে তার নিজস্ব ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তৈত্তিরীয় সংহিতার শেষ উদ্ধৃতিতে অশ্ব ও শূদ্রের উৎপত্তি পা থেকে বলা হয়েছে। কেন? সংহিতাকার নিজেই এর উত্তর দেয় -

তস্মাৎ পাদৌ উপজীবতঃ। পত্তো হি অসৃজ্যেতাম্ ।

[তৈ০স০ ৭।১।১।৪]

কেননা উভয়ের জীবিকা পায়ের উপর নির্ভর করে। এই কারণে, তাদের উৎপত্তি পা থেকে বলা হয়। আমার বিচারে ভাল ব্যাখ্যা এ ছাড়া অন্য হতে পারে না । এর মধ্যে ব্যবসায়-বলের অতিরিক্ত অন্য কোনও ভাবনা নেই । তবুও, যদি কেউ এই বিষয়ে কুতর্ক করে তবে সেটাকে মতান্ধতা মাত্র বলা যাবে।

(গ) এখন পা থেকে দেবতাদের উৎপত্তিও দেখুন। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে রূপক উৎপত্তির বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে-

পড্ভাং ভূমির্দিশঃ শোত্রাৎ তথা লোকাঁঅকল্পয়ন।।

[ঋগ্বেদ ১০।৯০।১৪]

সরলার্থঃ নাভি থেকে [সুক্ষ সামর্থ দ্বারা] অন্তরিক্ষ হয়, শির থেকে [সর্বোত্তম সামর্থ দ্বারা] দুল্যোক (সমবর্ত্তত) হয়। পা থেকে [পরমাণু কারণরূপ সামর্থ দ্বারা] পৃথিবী, শোত্র থেকে [অবকাশরূপ সামর্থ দ্বারা] দিশা এবং এই প্রকার অন্য লোক কল্পিত হয়।

পুরুষসূক্ত সম্পূর্ণ পড়ুন -

http://back2thevedas.blogspot.com/.../blog-post_60.html..

এখানে গুণের সাদৃশ্যের সাথে রূপক বর্ণনা রয়েছে। কেন, এর মধ্যে কোথাও কোনো হীনমন্যতা দেখেন ? আরেকটি উদাহরণ নিন -

স নৈব ব্যভবৎ। স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত পূষণমিয়ং বৈ পূষেয়ং হীদং সর্বং পুষ্যতি যদিদং কিং চ।

[শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪।৪।২।২৫]

অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম-পুরুষ শূদ্র সম্পকিত বর্ণ সৃষ্টি করেছিল। দেবতাদের মধ্যে, পূষা দেবকে শূদ্র রূপে সৃষ্টি করেছিল, কেননা তিনি সকলকে পালন-পোষক করে পুষ্ট করেন।

কেন এখানে কি কোনো হীনমন্যতা বা অসম্মানবোধ দেখেন? শূদ্র এখানে বৈদিক দেবতার সমতুল্য। কেননা এই উৎপত্তি গুণের ভিত্তির তুলনা থেকে, অতএব সেই দেবতাকে 'শূদ্রবর্ণ' বলা হয়েছে। গুণের মাধ্যমে সাদৃশ্য এই যে পৃথিবীর পোষক রূপ = পূষা দেব সকল বস্তুদেরকে পুষ্ট করেন এবং শূদ্রও নিজের শ্রম-সেবা দ্বারা সকলকে পুষ্ট করেন, তাই গুণ-কর্ম-বলে উভয়ই শূদ্র বর্ণস্থ।

(ঘ) বর্ণের উৎপত্তি শুধু মুখ, পা ইত্যাদি থেকে বলা হয়নি, বরং অন্যান্য রূপক পদ্ধতি থেকেও বলা হয়েছে, যার ভাব এই যে শাস্ত্রকারগণ যেখানেই কোনো গুণ দেখেছেন, ঐ দৃষ্টিকোণ থেকে তার বর্ণনা করেছেন। অতএব, পাঠকদের শুধুমাত্র এক ধরনের উৎপত্তির উপর আগ্রহ দেখানো উচিত নয়। দ্রষ্টব্য কিছু উৎপত্তি অন্য ভাবে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে [৯।১২।৩।২] তিন বেদ থেকে তিন শ্রেণীর উৎপত্তি দেখানো হয়েছে -

সর্বং হেদং ব্রহ্মণা হৈব সৃষ্টম্ । ঋগেভ্যো জাতং বৈশ্যং বর্ণমাহুঃ ।
যজুর্বেদং ক্ষত্রিয়স্যাহুর্যোনিম্ । সামবেদো ব্রাহ্মণানাং প্রসূতিঃ ।

অর্থাৎ, সমস্ত মানুষ্যই ব্রহ্মের সন্তান। ঋগ্বেদ থেকে বৈশ্যবর্ণের উৎপত্তি। যজুর্বেদ থেকে ক্ষত্রিয় বর্ণের উৎপত্তি। সামবেদ থেকে ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি। আরেকটি উৎপত্তির রূপক বর্ণনা শতপথ ব্রাহ্মণে [২।১।৪।১১] পাওয়া যায়।

ভূরিতি বৈ প্রজাপতিঃ । ইমামজনয়ত ভুব ইত্যন্তরিক্ষং স্বরিতি দিবমেতাবদ্বা ইদং সর্বং যাবদিমে লোকাঃ সর্বেণৈবাধীয়তে । ভূরিতি বৈ প্রজাপতিঃ । ব্রহ্মাজনয়ত ভুব ইতি ক্ষত্রং স্বরিতি বিশমেতাবদ্বা ইদং সর্বং যাবদ্ব্রহ্ম ক্ষত্রং বিটসর্বেণৈবাধিয়তে।

সেখানে 'ভূঃ' থেকে ব্রাহ্মণবর্ণের, 'ভুবঃ' থেকে ক্ষত্রিয়বর্ণের এবং 'স্বঃ' থেকে বৈশ্যবর্ণের উৎপত্তি বলেছে।

এই প্রমাণগুলো দেখানোর উদ্দেশ্য এই যে শুধুমাত্র এক ধরনের উৎপত্তি সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি করা উচিত নয়। যা শুধুমাত্র রূপক বর্ণনা। তাদের সেই প্রেক্ষাপটে দেখা উচিত।

আলম্বায়ন গোত্র
শাস্ত্র ও ইতিহাসের আলোকে

প্রিতম সাহা

বাঙালিদের মধ্যে প্রচলিত গোত্রের মধ্যে কাশ্যপের পরেই ২য় বৃহত্তম গোত্র সম্ভবত আলম্বায়ন। কিন্তু আলম্বায়ন গোত্রের গোত্রপতি ঋষি কে, ধর্মে তার অবদান কী, তার সম্পর্কে আমাদের কারোই কোনো ধারনা নেই বলতে গেলে। এমনকি আলম্বায়ন গোত্রভূক্ত কিছু মানুষ তো গোত্রের নামও ঠিকঠাক জানেন না। কেউ বলে আলোম্যান, আলিম্যান, আলম্যান, আলমালক... কতকিছু।

আলম্বায়ন গোত্র নিয়ে তথ্যের খুব অভাব। গোত্র সম্পর্কিত বইপত্রে নানা তথ্য থাকলেও আলম্বায়ন বিষয়ে তেমন কিছু নেই। তাই বলতে গেলে ধরে ধরে সনাতন শাস্ত্রসমুদ্র থেকে আলম্বায়ন নামের অনুসন্ধান করতে হয়েছে। সেই অনুসন্ধান থেকে যতটুকু জানা গেল –

আলম্বায়ন শব্দটির অন্যতম প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় বৃহদারণ্যক উপনিষদে।

বৃহদারণ্যকোপনিষদের (৬/৫/১-৪) এ যজুর্বেদের দুটি শিষ্য পরম্পরা বর্ণিত হয়েছে।

আদিত্য (শুক্ল যজুর্বেদ) পরম্পরায় ৫২ জন ঋষির নাম ও ব্রহ্ম পরম্পরায় ৪৭ জন ঋষির নাম।

এর মধ্যে ২য় শ্রুতি বাক্যে আলম্বীপুত্র, আলম্বায়নীপুত্র ইত্যাদি শব্দ পাওয়া যায়। এখানে ঋষিদের তাদের মাতার নাম অনুসারে পরিচয় করানো হচ্ছে।

বলে রাখা ভালো দুই পরম্পরার অধস্তন ৩৪ জন দুই জায়গাতে এক, তার আগে আলাদা। সাঞ্জীবীপুত্র আদিত্য ও ব্রহ্ম উভয় পরম্পরাতেই দীক্ষিত। সেখান থেকেই দুই পরম্পরা একসাথে চলা শুরু করে। অগ্নিবীর। আলম্বীপুত্র ও আলম্বায়নীপুত্র সেই মিলিত পরম্পরাতেই দীক্ষিত।

■ যজুর্বেদের এই পরম্পরা ও শাখাবিস্তার নিয়ে আমরা বায়ু পুরাণের ৬১ নম্বর অধ্যায় ৮-১০ শ্লোক অনুসারে পাই – বৈশম্পায়নের শিষ্যপরম্পরায় কৃষ্ণযজুর্বেদের প্রাচ্যদেশীয় শাখা আলম্বি "আলম্বিরাদিঃ প্রাচ্যানাং"।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের – পূর্বভাগে (১.৩৩.৬) আলম্বিকে শ্রুতর্ষি বলা হয়েছে।

"... আলম্বিঃ... তেষাং শিষ্যাঃ প্রশিষ্যাশ্চ ষড়শীতি শ্রুতর্ষয়ঃ"

অষ্টাধ্যায়ী ৪.৩.১০৪ অনুসারে "কলাপিবৈশম্পায়নান্তেবাসিভ্যশ্চ"
- কলাপী ও বৈশম্পায়নের অন্তেবাসীর বাচক তৃতীয়া সমর্থ শব্দের উত্তর 'ণিনি' প্রত্যয় হয়। এই বিধি সূত্রের ব্যাখ্যায় কাশিকা সহ অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বৈশম্পায়নের ৯ শিষ্যের নাম উল্লেখ করেছেন,

আলম্বিশ্চরকঃ প্রাচাং পলঙ্গকমলাবুভৌ ।
ঋচাভারুণিতাণ্ড্যাশ্চ মদ্ধ্যমীয়াস্ত্রয়ো ্যপরে ॥
শ্যামায়ন উদীচ্যেষু উক্তঃ কঠকলাপিনোঃ।

যথা :- আলম্বি, পলঙ্গ, কমল, ঋৃচাভ, আরুণি; তাণ্ড্য, শ্যামায়ন, কঠ, কলাপী।
এর মধ্যে আলম্বি ঋষির নাম অন্যতম।

অষ্ট্যাধায়ী ৪.৩.১০৬ এর নিয়ম অনুযায়ী আলম্বি ঋষির সরাসরি শিষ্যগণ আলম্বিনঃ নামে পরিচিত হবেন।

যেমন যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য পরম্পরায় শুক্লযজুর্বেদের অন্যতম শাখাবিৎ ঋষি কণ্ব। তার থেকে কাণ্ব ঋষি, সেই কাণ্ব ঋষির নামে কাণ্ব শাখা, কাণ্ব গোত্র। তেমনি আলম্ব ঋষি থেকে শ্রুতর্ষি আলম্বি ঋষি, তার নাম থেকে আলম্বি শাখা এবং আলম্ব ঋষির বংশধর ও প্রশিষ্যগণ আলম্বায়ন নামে পরিচিত হতেন।

এর উদাহরণ আমরা পাই মহাভারত অনুশাসন পর্বের ১৭তম অধ্যায় ৫ম শ্লোকে – "চারুশীর্ষস্ততঃ... আলম্বায়ন" শ্লোকের ভারতকৌমুদী টীকা অনুসারে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ অনুবাদ করেছেন "আলম্বায়ন গোত্র বলিয়া বিখ্যাত চারুশীর্ষ মুনি"।

প্রাচীন ভারতভবদীপ টীকায় বলা হয়েছে "আলম্বায়ন আলম্বগোত্রঃ" অর্থাৎ ঋষি আলম্বের গোত্রভূক্ত আলম্বায়ন।

যেভাবে মহর্ষি কশ্যপের গোত্রের অন্তর্গতগণ কাশ্যপ, ঋষি ভৃগুর গোত্রান্তর্গতগণ ভার্গব নামে পরিচিত হন। তেমনই এই গোত্রের ঋষিগণ নিজেদের আলম্বায়ন বলে পরিচয় দিতেন।

অবশ্য শ্রী ভগবদ্দত্তজীর মতে এখানে অর্থ হবে "চারুশীর্ষ (সুন্দর মস্তকযুক্ত) আলম্বায়ন নামক ঋষি।" অগ্নিবীর। তবে আলম্বায়ন ব্যক্তিনাম বা গোত্রনাম, যাই হোক না কেন এখানেও আমরা বিখ্যাত আলম্বায়ন নামের উল্লেখ পাই। ধনঞ্জয় রচিত ধর্মপ্রদীপেও আলম্ব্যায়ন নামের উল্লেখ আছে।

মৎস্যপুরাণ (গীতাপ্রেস) ২০০ অধ্যায়ে আলম্ব নামক বশিষ্ঠ মুনির প্রবরভুক্ত এক ঋষিবংশের কথা পাওয়া যায়। কাত্যায়নের বশিষ্ঠবংশেও আলবায়ন নাম পাওয়া যায়।

যেভাবে ভরদ্বাজ গোত্র মহর্ষি অঙ্গিরার বংশ থেকে এসেছে, অনুমিত হয় সেভাবেই আলম্বায়ন গোত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের বংশ থেকে এসেছে। যেভাবে ধন্বন্তরী গোত্রের আদি ঋষি ভৃগুকে ধরা হয়, সেভাবে আলম্বায়ন গোত্রের আদি ঋষি হন ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ।

এছাড়া মহাভারত সভাপর্ব ৪র্থ অধ্যায় অনুসারে যুধিষ্ঠিরের সভাগৃহে প্রবেশের সময় যে সকল ঋষিগণ উপস্থিত ছিলেন, তাদের মধ্যে ঋষি আলম্ব অন্যতম। (হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ২.৪.৯ এর উত্তরপাদটীকা পৃ ২৬ দ্রষ্টব্য)

এই সমস্ত সূত্র মিলিয়ে এটা বলা যেতে পারে যে ঋষি আলম্বের বংশ ধারা এমন ছিল -

আলম্ব > শ্রুতর্ষি আলম্বি > আলম্বিনঃ >> আলম্বায়ন

অতএব, উক্তগোত্রের

• গোত্রনাম :- আলম্বায়ন • গোত্রপতি ঋষি :- ঋষি আলম্ব • আদি ঋষি :- ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ • বেদ :- যজুর্বেদ • প্রবর :- আলম্বায়ন, বাশিষ্ঠ, শালঙ্কায়ন, শাতাতপ, শাকটায়ন, ঐন্দ্রপ্রমদ, আভরদ্বসু ইত্যাদি।

যেহেতু আলম্বি শাখা প্রাচ্যদেশে (পূর্বাঞ্চলে) প্রচলিত ছিল, তাই অন্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলায় এই গোত্রের বেশ প্রচলন দেখা যায়। এবিষয়ে আরও গবেষণার অপেক্ষা রাখে। অগ্নিবীর। এই ঋষিবংশ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানা যায় না। কারণ বেদসমূহ রক্ষিত থাকলেও বহিরাগতের আক্রমণ আর বেদচর্চার লুপ্তিতে দুর্ভাগ্যক্রমে আলম্বিন্ শাখার মতো অধিকাংশ শাখা ও বহু বৈদিক শাস্ত্র লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আর এরই সাথে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে ঋষি আলম্ব, আলম্বি ও আলম্বায়নের মতো শ্রুতর্ষিদের কৃতকর্ম ও ইতিহাস।

স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ

- স্বাধ্যায়ে/ অধ্যয়নে প্রমাদ করবে না।

[তৈত্তিরীয় উপনিষদ/ শিক্ষাবল্লী/১১/১]

তথ্যসূত্র ও আকরগ্রন্থ :-

• উপনিষদ গ্রন্থাবলী [বৃহদারণ্যক] - স্বামী গম্ভীরানন্দ • মহাভারত - হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ • মহাভারত - কালীপ্রসন্ন সিংহ • বায়ুপুরাণ - গীতাপ্রেস • মৎস্যপুরাণ - গীতাপ্রেস • ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ (মূলমাত্র) • বৈদিক বাঙ্ময় কা ইতিহাস - পণ্ডিত ভগবদ্দত্তজী • The Ashtadhyayi of Panini - Srisa Chandra vasu • গোত্র ও প্রবর - হেমচন্দ্র সেনশর্মা • পুরাণকোষ ১ম খণ্ড - নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুরী • বিশ্বকোষ ১ম খণ্ড - নগেন্দ্রনাথ বসু • পৌরাণিক অভিধান - অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বেদে শিক্ষিত নারীর জয়গান

জ্যোতি প্রামানিক

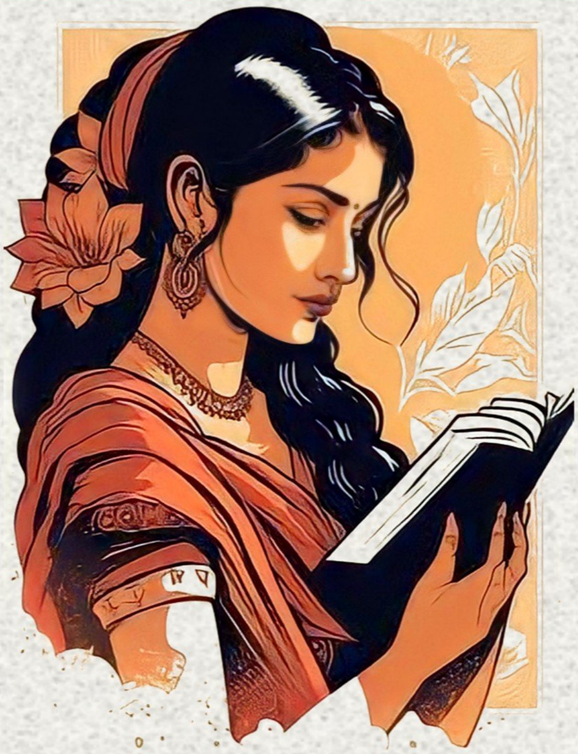

বেদ ও সনাতন সংস্কৃতিতে নারীর অবদান চিরকালই সমাদৃত । বৈদিক জীবনধারায় যেমন আমরা গৃহস্থকালে নারী-পুরুষের সম অবদানের উল্লেখ পাই একইভাবে সমাজের উন্নতিকল্পে বিদ্বান বা পণ্ডিতা নারীর বিকল্প নেই । একজন শিক্ষিত মা-ই শিক্ষিত ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সৃষ্টি করার মূল কারিগর । আজ আমরা বেদে বিদুষী নারী বিষয়ে কি বলা হয়েছে তা সম্পর্কে জানবো -

চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাম্। যজ্ঞং দধে সরস্বতী॥

[যজুর্বেদ ২০।৮৫]

বিদুষী নারী আমাদের মধুর, প্রেমময়, সত্য বাণী কথনের প্রেরণা দান করেন, আমাদের ভেতরকার সুনীতিকে জাগ্রত করেন। তিনি আমাদের গৃহাশ্রম-যজ্ঞ, ব্যবহার-যজ্ঞ এবং জ্ঞান-যজ্ঞকে সঞ্চালিত করেন।

মহ্যোঅর্ণ সরস্বতী প্র চেতয়দি কেতুনা। ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি॥

[যজুর্বেদ ২০।৮৬]

বিদুষী নারী জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষার দ্বারা আমাদের মধ্যে জ্ঞানের প্রখর প্রবাহকে নিয়ে আসেন । তিনি আমাদের সমগ্র জ্ঞান, বিচার এবং কর্মকে প্রকাশের দ্বারা উদ্ভাসিত করেন।

যস্য স্তনঃ শশয়ো ময়োভূর্যেন বিশ্বা পুষ্যসি তমিহ ধাতবে কঃ॥

[ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৯]

হে বিদুষী ! তোমার এই জ্ঞান-রূপ স্তন অত্যন্ত বিশ্রামপ্রদায়ক এবং আনন্দদায়ক, যার দ্বারা তুমি আমাদের ভেতরকার সমস্ত বরণীয় গুণকে পুষ্ট করো, যা আমাদের ভেতর রমণীয়তার সঞ্চারণ করে, যা আমাদের জ্ঞান-সম্পদ প্রাপ্ত করায়, যা আমাদের অনেক উৎকৃষ্ট ধন প্রদান করে, ঐ দিব্য স্তনকে আমাদের পান করানোর উপক্রম করো ।

ত্বে বিশ্বা সরস্বতী শ্রিতাংয়ুষি দেব্যাম্। শুনহোত্রেষু মৎস্ব প্রজাং দেবি দিদিডঢ নঃ॥

[ঋগ্বেদ ২।৪১।১৭]

হে বিদুষী ! তোমার মতো দেবীর উপর সকলের জীবন আশ্রিত,কারণ তুমি সকলকে যথায়োগ্য শিক্ষা প্রদান করো । যিনি বিদ্যাবৃদ্ধ, তাদের মধ্য থেকে তুমি আনন্দ লাভ করো এবং হে দেবী! যে অবিদ্বান প্রজা রয়েছে তাদের উপদেশ দিয়ে শিক্ষিত করো।

পাবীরবী কন্যা চিত্রায়ুঃ সরস্বতী বীরপত্নী ধিংয় ধাৎ। গ্রাভিরচ্ছিদ্রং শরণং সজোষা দুরাধর্ষ গৃণতে শর্ম য়ংসৎ॥

[ঋগ্বেদ ৬।৪৯।৭]

চরিত্রকে পবিত্রকারী, কমনীয় গুণ-কর্ম-স্বভাবযুক্ত, অদ্ভুত জীবনের অধিকারী, বীর পতির পত্নি বিদুষী নারী সবাইকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান এবং উৎকৃষ্ট কর্মের উপদেশ করুন।প্রীতিপূর্বক সেবা প্রদানকারী নিজের সুশিক্ষিত অমৃতবাণীর দ্বারা বেদপাঠকারীদের নির্দেশনা স্মরণ এবং অকাট্য সুখ প্রদান করতে থাকুন।

ইয়ং শুষ্মেভির্বিসখা ইবারুজৎসানু গিরীণাং তবিদেভিরূর্মিভিঃ।
পারবতঘ্নীমবসে সুবৃৎক্তিভিঃ সরস্বতীমা বিবাসেম ধীতিভিঃ॥
[ঋগ্বেদ ৬।৬১।২]

যেভাবে নদী নিজের বলবান বৃহৎ বৃহৎ ঢেউ দ্বারা পর্বতের সুদৃঢ় উন্নত শিলাকে অনায়াসে ভেঙে ফেলে, যেভাবে কেউ পদ্মবৃন্তকে বিচ্যুত করে, ঠিক সেভাবেই বিদুষী নারী নিজের আচ্ছাদিত করা বলশালী বাণী এবং প্রজাদের সাথে বিরোধকারীদের কুতর্ককে ছিন্ন করেন । এসো, পরম বিদুষী নারীদের আমরা শুভ্র সুপ্রবৃত্ত বাণী এবং কর্মের দ্বারা পূজা করি।

সরস্বতি দেবনিদো নি বর্হয় প্রজাং বিশ্বস্য বৃসয়স্য মায়িনঃ ।
উত ক্ষিতিভ্যোবনীরবিন্দো বিষমেভ্যো অস্রবো বাজিনীবতি ॥
[ঋগ্বেদ ৬।৬১।৩]

হে বিদুষী! শিক্ষা এবং সদুপযোগের দ্বারা মানুষের হৃদয় থেকে দেবনিন্দক প্রবৃত্তিকে নষ্ট করো, সমস্ত বিদ্যাচ্ছাদক মায়াবীদের উৎপাদিত অবিদ্যা রূপ প্রজাকে বিচ্ছিন্ন করো । মানবদের রক্ষক বেদবাণীকে প্রাপ্ত করাও। হে উত্তম কর্মের আচরণকারী বিদুষী! তুমি মানবদের প্রতি জ্ঞানরস ঠিক ঐভাবেই প্রবাহিত করো যেভাবে নদী জল প্রবাহিত করে।

ভদ্রমিদ্ভদ্রা কৃণবৎসরস্বত্যকবারী চেততি বাজিনীবতী ।
গৃণানা জমদগ্নিবৎস্তুবানা চ বসিষ্ঠবৎ ॥
[ঋগ্বেদ ৭।৯৬।৩]

ভদ্র গুণ-কর্ম-স্বভাব যুক্ত বিদুষী নারী সবার ভালোই করেন, অকুৎসিত আচরণ যুক্ত জ্ঞান-কর্ম-পরায়ণ সেই বিদুষী সবাইকে জ্ঞানবান এবং জাগ্রত করেন। মন্ত্র উচ্চারণকারী প্রজ্জ্বলিতাগ্নি অগ্নিহোত্রের সমতুল্য সদুপদেশ প্রদান করেন এবং অতিশয় জ্ঞানধন সম্পন্ন বিদ্বানের মতো প্রত্যেক পদার্থের গুণ-ধর্মকে ব্যাখ্যা করেন।

সরস্বতীং দেবয়ন্তো হবন্তে সরস্বতীমধ্বরে তায়মানে ।
সরস্বতীং সুকৃতো অহ্বয়ন্ত সরস্বতী দাশুষে বার্যং দাৎ ॥
[ঋগ্বেদ ১০।১৭।৭]

যে লোক সমাজকে দেব করার ইচ্ছুক হন, তিনি বিদুষী নারীকে আদরপূর্বক নিমন্ত্রণ করেন। যখন যজ্ঞানুষ্ঠান হুমকির মুখে পড়ে, ঠিক তখনই বিদুষী নারীকে আহ্বান করা হয়। পুণ্যকর্মে তৎপর মানবও পুণ্য কর্মের ধারাকে প্রবৃত্ত রাখার জন্য বিদুষী নারীকে আহ্বান করেন। বিদুষী নারীকে যিনি সম্মান করেন, তাকে বিদুষী নারী বরণীয় ঐশ্বর্য, উপদেশ সুখ আদি প্রদান করেন।

গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষত্যেকপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী ।
অষ্টাপদী নবপদী বভূবুষী সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্ ॥

[ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪১]

বিদ্যা জ্যোতি দ্বারা উজ্জ্বল বিদুষী নারী জ্ঞান ধারাকে বহমান করে সদুপদেশ প্রদান করেন। তিনি ওঙ্কার রূপ একপদের ধ্যান-চিন্তন করেন। উনি অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স্বরূপ দুই পদকে জীবনে চরিতার্থ করেন। উনি চার বেদরূপ চার পদের অধ্যায়ন-অধ্যাপনা করেন এবং ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ চার পদের প্রাপ্তি করানোয় যত্নশীল থাকেন। উনি চার বর্ণ এবং চার আশ্রমরূপ আট পদকে সমাজে প্রচার করেন। তিনি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ চতুষ্টয় এই নয় তত্ত্বকে আত্মায় কেন্দ্রীভূত করার অভ্যাস করেন এবং করান। উনি সহস্র অক্ষরের উচ্চারণ করে উচ্চ রাষ্ট্রে নিজের বাণীকে প্রসারিত করেন।

যদাশসা বদতো মে বিচুক্ষুভে যদ্যাচমানস্য চরতো জনামনু ।
যদাত্মনি তন্বো মে বিরিষ্টং সরস্বতী তদা পৃণদঘৃতেন ॥

[অথর্ববেদ ৭।৫৭।১]

যখন আমি যখন কারো সাথে কথা বলি তখন অনেক সময়ই অনেকবার আমার মন কোন আঘাতের কারণে বিক্ষুব্ধ হয়। যখন আমি কোন সৎকার্য সিদ্ধির জন্য মানবের কাছে ধন কামনা করি, তখনও অনেকসময় দানে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের টীকাটিপ্পনীর জন্য আমার মনে ক্ষোভ আসে । এইভাবেই অনেকবার অনেকের ব্যবহারের দ্বারা আমার শরীর বা আত্মায় আঘাত লেগেছে । বিদুষী নারী নিজের সদ্ভাবনা এবং সদুপদেশরূপ ঘৃত (ঔষধী) দ্বারা সেই ক্ষোভ এবং আঘাতের দ্বারা উৎপন্ন আমার ক্ষতকে ঠিক করে দিন।

তাই পরিবেশেষে জগদীশ্বরের নিকট আমাদের প্রার্থনা ও সনাতন সমাজের প্রতি আহ্বান -
হে প্রভু ! আমাদের রাষ্ট্রে বিদুষী নারী উৎপন্ন হউক এবং আমরা তার সম্মান করা শিখি, যার মাধ্যমে আমাদের রাষ্ট্র গৌরবের শিখরে উন্নীত হতে পারে ।

স্ত্রী তাঁর স্বামীর জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ?

উত্তরঃ মহাভারতে বলা হয়েছে -

স্ত্রীর সাথে অবস্থানকারী ব্যক্তির জন্য গাছতলাও গৃহ স্বরূপ। স্ত্রী ব্যতিত পুরুষের অট্টালিকাও অরণ্যের মত মনে হয়, সন্দেহ নাই। স্ত্রীই পুরুষের ধর্মার্থ কাম সাধন সময়ে একমাত্র সহায়ক এবং বিদেশে গমনকালে একমাত্র বিশ্বাসের আধার হয়। জগতে স্ত্রীর মত পরম ধন আর কিছু নেই। স্ত্রীই পুরুষের লোকযাত্রা সম্পাদন করেন। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কাছে স্ত্রীই মহা ঔষধ । স্ত্রীর মত পরম বন্ধুও আর কেউ নেই। ধর্মসংগ্রহে স্ত্রীই পুরুষের একমাত্র সহায় হয়। পতিব্রতা, প্রিয়বাদিনী স্ত্রী যার ঘরে নেই তার বনে যাওয়াই উচিৎ। তার ঘর আর অরণ্যের মাঝে কোন পার্থক্য নেই ।

বৃক্ষমূল্যেপি দয়িতা যস্য তিষ্ঠতি তদগৃহম্। প্রাসাদোপি তয়া হীনঃ
কান্তার ইতি নিশ্চিতম্॥
ধর্মার্থকামকালেষু ভার্যা পুংসঃ সহায়িনী। বিদেশগমনে চাস্য সৈব
বিশ্বাসকারিকা॥
ভার্যা হি পরমো হ্যর্থঃ পুরুষস্যেহ পট্যতে। অসহায়স্য
লোক্যেস্মিঁল্লোকয়াত্রাসহায়িনী॥
তথা রোগাভিভূতস্য নিত্যং কৃচ্ছ্রগতস্য চ। নাস্তি ভার্যাসমং মিত্রং
নরস্যার্তস্য ভেষজম্॥
নাস্তি ভার্যাসমো বন্ধুর্নাস্তি ভার্যাসমা গতিঃ। নাস্তি ভার্যাসমো লোকে
সহায়ো ধর্মসঙ্গ্রহে॥
যস্য ভার্যা গৃহে নাস্তি সাধ্বী চ প্রিয়বাদিনী। অরণ্যং তেন গন্তব্যং
যথ্যারণ্যং তথা গৃহম্॥

[মহাভারত শান্তিপর্ব অধ্যায় ১৪৪]

সনাতন ধর্মে বৈদিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় নারী মন্ত্রণালয় ও নারীর অবদান

বৈদিক রাষ্ট্রে নারীর প্রশাসনিক অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ । বেদে নিম্নলিখিত রূপে নারীর অবদান আমরা পাই -

নারীদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের উল্লেখ আমরা পাই - ঋগ্বেদ ১।৮২।৫,১।১২৩।৫, ৫।৩০।৯, ৬।৭৫।১৩, ৬।৭৫।১৫, ১০।১০২।২, ১০।১০২।৬, ১০।১০২।১১ ; যজুর্বেদ ১১।৫০, ১৩।২৬, ১৬।২৪, ১৭।৪৪-৪৫, ২৯।৫০ ।

ধূপয়তু বরুণস্ত্বা
যজুর্বেদ ১১।৬০
অর্থাৎ, ন্যায়াধীশ বা শাসক ব্রহ্মচারিণীকে প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত করবেন ।

যমেন ত্বংয়ম্যা সম্বিদানোত্তমে
যজুর্বেদ ১২।৬৩
অর্থাৎ, নারী ন্যায়াধীশ সহ-ন্যায়াধিকারিণীসহ হোক ।

দেবপত্নীরিন্দ্রাণ্য১গ্নায়্যশ্বিনী রাট্
ঋগ্বেদ ৫।৪৬।৮
অর্থাৎ, বিদ্বান পত্নী নারীদের ন্যায়াধীশ হবে ও তাদের বক্তব্য বিচার করবে ।

ইন্দ্রস্ত্বা ধূপয়তু
যজুর্বেদ ১১।৬০
অর্থাৎ, পরম ঐশ্বর্য্যযুক্ত রাজা তোমাকে রাজনীতি বিদ্যা দ্বারা সংস্কার করুন ।

অশ্বাজনি প্রচেতসো শ্বান্ৎসমৎসু চোদয়
যজুর্বেদ ১২।৫০
অর্থাৎ বিদুষী নারী যুদ্ধে অশ্বচালনা [অর্থাৎ যুদ্ধবিদ্যা] সম্পর্কে জ্ঞাত হবে ।

নারী শিক্ষামন্ত্রী -

পরমেষ্ঠী ত্বা সাদয়তু দিবস্পৃষ্ঠে জ্যোতিষ্মতীম্। বিশ্বস্মৈ প্রাণায়াপনার্য ব্যনায় বিশ্বং জ্যোতির্যচ্ছ। সূর্যস্তেধিপতিস্তয়া দেবতয়্যাঙ্গিস্বদ্ ধ্রুবা সীদ।।

[যজুর্বেদ ১৫।৫৮]

সরলার্থ- হে বিদুষী! তোমাকে প্রধানমন্ত্রী জ্ঞান প্রকাশের পৃষ্ঠ শিক্ষামন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত করুক, তোমার মতো জ্যোতিষ্মতী কে, বিদ্যাজ্যোতি দ্বারা জাজ্জ্বল্যমান ব্যক্তিকে সকলের জন্য প্রাণার্থ,অপানার্থ,ব্যানার্থ করুক। তুমি সমস্ত বিদ্যাজ্যোতি কে নিয়ন্ত্রণ কর। সূর্য তোমার আদর্শ। সেই দেবতা থেকে প্রাণবতী হয়ে তুমি নিজের পদে স্থীর হয়ে বসো।

নারী রাষ্ট্রপতি ভবনে -

কুলায়িনী ঘৃতবতী পুরন্ধিঃ স্যোনে সীদ সদনে পৃথিব্যাঃ।অভি ত্বা রুদ্রা বসবো গৃণন্ত্বিমা ব্রহ্ম পীপিহি সৌভগায়শ্বিনাধ্বর্যু সাদয়তামিহ ত্বা ॥

[যজুর্বেদ ১৪।২]

সরলার্থ- হে সুখকারিনী নারী! সুনিপুণ প্রভাবশালী গৃহিণী, গৃহ আলোকিত কারিনী, বুদ্ধিমতী নারী, তুমি মাতৃভূমির রাষ্ট্রপতি ভবনে অবস্থান কর। বানপ্রস্থ পন্ডিতগন, গৃহস্ত পন্ডিতগন তোমায় আশীর্বাদ প্রদান করুক। তুমি সৌভাগ্যের জন্য এই আশীর্বাদ গ্রহন কর। তোমার মাতা-পিতা, যজ্ঞ সংগঠক এবং ব্রহ্মা তোমায় রাষ্ট্রপতি ভবনে স্থাপিত করুক।

স্যোনং ধ্রুবং প্রজায়ৈ ধারয়ামি তেহশ্মানং দেব্যাঃ পৃথিব্যা উপস্থে ।
তমা তিষ্ঠানুমাদ্যা সুবর্চা দীর্ঘং ত আয়ুঃ সবিতা কৃণোতু ॥

[অথর্ববেদ ১৪।১।৪৭]

হে নারী! তুমি রাষ্ট্রভূমির প্রজা । তোমার জন্য এই দিব্য ভূমির পৃষ্ঠে আমি সুখদায়ক অচল শিলাখণ্ড স্থাপন করছি। এই শিলাখণ্ডের উপর তুমি দাঁড়িয়ে থাকো, এটা তোমায় দৃঢ়তার পাঠ শেখাবে। এই শিলাখণ্ডের অনুরুপ তুমিও বর্চস্বিনী হও, যার মাধ্যমে সংসারে তুমি আনন্দপূর্বক থাকতে পারবে। সবিতা পরমেশ্বর এবং সূর্য তোমার ভেতর তেজের আধান করে তোমার আয়ুকে সুদীর্ঘ করুক।

সিঁহ্যসি সপত্নসাহী দেবেভ্যঃ কল্পস্ব সিঁহ্যসি সপত্নসাহী দেবেভ্যঃ শুন্ধস্ব
সিঁহ্যসি সপত্নসাহী দেবেভ্যঃ শুম্ভস্ব ॥

[যজুর্বেদ ৫।১০]

হে নারী! তুমি স্বয়ং নিজেকে চেনো। তুমি সিংহী, তুমি শত্রুরুপ মৃগদের মর্দনকারিণী, দেবজনের হিতার্থে নিজের ভেতর সামর্থ্য উৎপন্ন করো। হে নারী! তুমি অবিদ্যা আদি দোষসমূহের উপর সিংহীর ন্যায় ভেঙ্গে ফেলো, তুমি দিব্যগুণসমূহের প্রচারার্থে স্বয়ঙ্কে শুদ্ধ করো। হে নারী! তুমি দুষ্কর্মসমূহ এবং দুর্বসনাসমূহকে সিংহীর ন্যায় বিধ্বস্তকারিণী, ধার্মিকদের হিতার্থে নিজেকে দিব্যগুণসমূহ দ্বারা অলঙ্কৃত করো ।

সিঁহ্যসি স্বাহা সিঁহ্যস্যাদিত্যবনিঃ স্বাহা সিঁহ্যসি ব্রহ্মবনিঃ ক্ষত্রবনিঃ স্বাহা সিঁহ্যসি সুপ্রজাবনী রায়স্পোষবনিঃ স্বাহা সিঁহ্যস্যাবহ দেবান্যজমানায় স্বাহা । ভূতেভ্যস্ত্বা ॥

[যজুর্বেদ ৫।১২]

হে নারী ! তুমি সিংহী, আদিত্য ব্রহ্মচারীদের জননী, আমরা তোমার পূজা করি। হে নারী! তুমি সিংহী, তুমি ব্রাহ্মণদের জন্মদাত্রী, তুমি ক্ষত্রিয়ের জন্মদাত্রী, আমরা তোমার যশোগান করি। হে নারী! তুমি সিংহী, তুমি শ্রেষ্ঠ সন্তান প্রদানকারিণী, তুমি ধন কে পুষ্টি প্রদানকারিণী, আমরা তোমার জয়জয়কার করি। হে নারী! তুমি সিংহী, তুমি যজমান পতিকে দিব্যগুণযুক্ত তেজস্বী সন্তান প্রদান করো, আমরা তোমার গুণগান করি। হে নারী! প্রাণীসমূহের হিতার্থে আমরা তোমায় নিযুক্ত করি।

স্যোনাসি সুষদাসি ক্ষত্রস্য যোনিরসি স্যোনামাসীদ সুষদামাসীদ
ক্ষত্রস্য যোনিমাসীদ ॥

[যজুর্বেদ ১০।২৬]

হে নারী ! তুমি সুখদায়ী, তুমি সুদৃঢ় স্থিতিশীল, তুমি ক্ষাত্রবলের ভাণ্ডার। এই সুখদায়িনী শালায় যা ভূমিতে স্থিত হয়েছে, এই সুদৃঢ় স্থিতিশীল শালায় যা রাষ্ট্রভূমিতে স্থিত হয়েছে, এই ক্ষাত্রবলের জন্মস্থান শালায় যা রাষ্ট্রভূমিতে স্থিত হয়েছে ।

যদস্যাঅঁহুভেদ্যাঃ কৃধু স্থূলমুপাতসৎ । মুষ্কাবিদস্যাএজতো গোশফে শকুলাবিব ॥

[যজুর্বেদ ২৩।২৮]

হে নারী! তুমি উৎকৃষ্ট সত্তার অধিকারী। তুমি ভূমির ন্যায় দৃঢ়। তোমার আত্মা অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অখণ্ডনীয়, তুমি সবাইকে বীরতারূপ দুগ্ধ পানকারিণী। তুমি সকল লোককে ধারণকারিণী। তুমি রাষ্ট্রভূমিকে কুমার্গে যাওয়া থেকে আটকাও, রাষ্ট্রভূমিকে দৃঢ় করো, রাষ্ট্রভূমিকে হিংসা করো না।

অমীষাঞ্চিত্তস্প্রতিলোভয়ন্তী গৃহাণাঙ্গান্যপ্বে পরেহি । অভি প্রেহি নির্দহ হৃৎসু শোকৈরন্ধেনামিত্রাস্তমসা সচন্তাম্ ॥ অবসৃষ্টা পরা পত শরব্যে ব্রহ্মসঁশিতে । গচ্ছামিত্রান্প্র পদ্যস্ব মামীষাঙ্কং চনোচ্ছিষঃ ॥

[যজুর্বেদ ১৭।৪৪-৪৫]

বাণ-পঙ্ক্তি ন্যায় দূর পর্যন্ত আঘাত কারী বীর ক্ষত্রিয় নারী, তুমি শত্রু সেনাদের চিত্তকে বিমুঢ় করে, সেনাদের অঙ্গকে- হাতি, ঘোড়া, রথ এবং পদাতিক সৈনিকদের- নিজের বশে করে নাও। অধর্ম থেকে দূরে থাকো। শত্রুদের প্রয়াণ করাও , তাদের হৃদয়কে শোক দ্বারা দগ্ধ করো। তোমার শত্রু নিরাশারুপ ঘোর অন্ধকারগ্রস্ত হয়ে যায়।

বিদ্বানদের দ্বারা শিক্ষার দ্বারা তিক্ষ্ণীকৃত এবং প্রশংসিত তথা বাণ আদি শস্ত্রাস্ত্র চালানোয় কুশল হে নারী, সেনাপতি আদি দ্বারা প্রেরিত করা তুমি শত্রুদের উপর ঝাপিয়ে পড়ো। যাও, শত্রুদের কাছে গিয়ে তাদের বন্দী করো। তাদের মধ্যে কাউকে ছেড়ো না। তাদের বন্দী করে কারাগারে পাঠিয়ে দাও।

আলাক্তা যা রুরুশীর্ষ্ণ্যথো যস্যা অয়ো মুখম্ । ইদং পর্জন্যরেতস ইষ্বৈ দেব্যৈ বৃহন্নমঃ ॥

[ঋগ্বেদ ৬|৭৫|১৫]

যে বীরাঙ্গনা বিষ-লিপ্ত বাণের সমান রণ-সংহারকারিনী, যে রক্ষার্থ মাথার উপর মৃগের শিং দ্বারা তৈরী শিরস্ত্রাণ ধারণ করে, যার সামনের অংশ লৌহ-কবচ দ্বারা আচ্ছাদিত, যে পর্জন্য-বীর্যা, অর্থাৎ মেঘের ন্যায় শস্ত্রধারীদের বধকারিণী; সেই বাণের ন্যায় গতিশীল, কর্মকুশল, শূরবীর দেবীকে আমরা অনেক অনেক নমস্কার করি ।

হে রাষ্ট্রের নারী ! বৈদিক বীরাঙ্গনার এই তেজস্বী উদগার শোনো -

অবীরামিব মাময়ং শরারুরভি মন্যতে । উতাহমস্মি বীরিণীন্দ্রপত্নী মরুৎসখা বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥

[ঋগ্বেদ ১০।৮৬।৯]

এই ঘাতক আমায় অবীরা মনে করছে, আমি তো বীরাঙ্গনা, বীরের পত্নী আমি, ঝঞ্ঝার ন্যায় শত্রুদের উপর ঝাপিয়ে পড়া বীর আমার সখা। আমার পতি বিশ্বে বীরত্বে প্রসিদ্ধ।

অহং কেতুরহং মূর্ধাহমুগ্রা বিবাচনী ।
মমেদনু ক্রতুং পতিঃ সেহানায়া উপাচরেৎ ॥২॥
মম পুত্রাঃ শত্রুহণোঽথো মে দুহিতা বিরাট্ ।
উতাহমস্মি সঞ্জয়া পত্যৌ মে শ্লোক উত্তমঃ ॥৩॥
যেনেন্দ্রো হবিষা কৃত্ব্যভবদ্দ্যুম্ন্যুত্তমঃ ।
ইদং তদক্রি দেবা অসপত্না কিলাভুবম্ ॥৪॥
অসপত্না সপত্নঘ্নী জয়ন্ত্যভিভূবরী ।
আবৃক্ষমন্যাসাং বর্চো রাধো অস্থেয়সামিব ॥৫॥

[ঋগ্বেদ ১০|১৫৯|২-৫]

আমি রাষ্ট্রের ধ্বজা, আমি সমাজের মাথা। আমি উগ্র,আমার বাণীতে বল নিহিত। শত্রু-সেনাসমূহের পরাজয় কারিনী যুদ্ধে বীর-কর্ম দেখানোর পরই পতির প্রেম পাওয়ার অধিকারী।আমার পুত্র শত্রুহন্তা, আমার কন্যা বিশেষ তেজস্বিনী এবং আমিও পূর্ণ বিজেত্রী। আমার পতির মধ্যে উত্তম কীর্তি বাস করুক।

যে আত্মোৎসর্গ এর হবি দ্বারা আমার বীর পতি কৃতকৃত্য, যশস্বী এবং সর্বোত্তম সিদ্ধ হয়েছে, সেই হবি আজ আমিও দিয়ে দিয়েছি। আজ আমি নিশ্চয়ই শত্রু-রহিত হয়েছি। আমি শত্রু-রহিত হয়েছি, শত্রুদের আমি বধ করেছি, আমি বিজয় লাভ করেছি, বহিরাগতদের পরাজিত করেছি। রিপু-সেনাদের তেজকে আমি সেভাবেই বিনষ্ট করেছি, যেভাবে অস্থির লোকদের সম্পত্তিসমূহ নষ্ট হয়ে যায়।

হে রাষ্ট্রের নারী! বেদের এই বীরতার সন্দেশ শ্রবণ করো, বীরতার তরঙ্গ দ্বারা নিজের হৃদয়কে তরঙ্গিত করো। তুমি বীরাঙ্গনা হও । তোমার ভেতর বীরত্বের সঞ্চার হবে। হে নারী! তুমি বিজয়ী হও, রাষ্ট্রকে বিজয়ী করো ।

সন্দর্ভঃ যজুর্বেদ [মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী], যজুর্বেদ জ্যোতি [ড. রামনাথ বেদালঙ্কার], বৈদিক নারী [ঐ]

ঈশ্বর সত্যিই থাকলে প্রার্থনা করার পরেও কেন দুঃখ দূর হচ্ছে না ?

" প্রার্থনা করলেও ঈশ্বর দুঃখ দূর করেন না তাই ঈশ্বর নেই " - ন্যায় দর্শনের পঞ্চাবয়ব দ্বারা খণ্ডন -

নাস্তিকের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে খণ্ডন

১। প্রতিজ্ঞা - ঈশ্বর নেই।

২। হেতু - প্রার্থনা করা ব্যক্তির দুঃখ দূর না হওয়ার জন্য

৩। উদাহরণ - ছোট অনাথ শিশুর মত

৪। উপয়ন - একইরকমভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনাকারী ব্যক্তির অবস্থা

৫। নিগমন - অতএব যেহেতু প্রার্থনাকারী ব্যক্তির দুঃখ-দুর্দশা দূর হয় না তাই ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই।

ঈশ্বর বিশ্বাসী ব্যক্তিরা খুব ভোরে অন্ধকারে জেগে ওঠে এবং খুব ভক্তি সহকারে ধর্মীয় অনুষ্ঠান যেমন স্তব গান - মালা, কাহিনী, পূজা-আবৃত্তি, নৈবেদ্য-প্রসাদ, ধ্যান ইত্যাদি ধার্মিক ক্রিয়াকর্ম করার সময় দীর্ঘ প্রার্থনা করে যে হে প্রভু! আমাদের সম্পদ দিয়ে পরিপূর্ণ করুন, আমাদের নিরোগ ও সুস্থ রাখুন, পুত্র-প্রপৌত্র প্রদান করুন, ব্যবসা-চাকরি যেন পাই , পরীক্ষায় যেন উত্তীর্ণ হই, মামলায় যেন জিতে যাই ইত্যাদি ইত্যাদি ।যেভাবে এক অনাথ শিশু, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, শীত-গরমের সময় সে তার মা-বাবাকে ডাকে । কিন্তু কেউ তার কথা শোনে না, একই অবস্থা এই ঈশ্বরভক্ত বিশ্বাসীদের। এই ঈশ্বরভক্ত বিশ্বাসীরা প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক দুঃখ, বঞ্চনা, উদ্বেগ, দুঃখগুলো খুব উচ্চস্বরে কল্পিত ঈশ্বরের সামনে বর্ণনা করে, অনুনয় - বিনয় করে, কান্না করে কিন্তু তাদের দুঃখের কোনটাই দূর হয় না। যদি সত্যিই ঈশ্বর থাকতেন, তাহলে নিশ্চয়ই এই সমস্ত ঈশ্বর-ভক্তদের কষ্ট ও দুঃখ দূর হয়ে যেত; কিন্তু তা হয় না, এটা প্রমাণ করে যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই ।

আস্তিক দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ

১। প্রতিজ্ঞা - ঈশ্বর আছে ,

২। হেতু - পুরুষার্থের সাথে বিধিবৎ সত্য প্রার্থনা করলে দুঃখ দূর হয় ,

৩। উদাহরণ - ভারবহনকারীর (কুলি) মত,

৪। উপয়ন - সেভাবেই পুরুষার্থী , প্রকৃত প্রার্থীর দুঃখ দূর হয়,

৫। নিগমন - অতএব পুরুষার্থের সাথে সঠিকভাবে প্রার্থনার মাধ্যমে দুঃখ দূর করার ফলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিদ্যমান ।

বিশ্বাসী মানব ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, কিন্তু তাদের কষ্ট দূর হয় না, যদি ঈশ্বর থাকতেন, তাহলে প্রত্যেক ভক্তের প্রার্থনা সফল হতো" এই অনুসারে আপনি মেনে নিয়েছেন যে ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই, এটা বিশ্বাস করা আপনার জন্য উচিত নয়।

সর্ব প্রথম এটা জানতে হবে যে "প্রার্থনা " কাকে বলা হয় এবং কখন প্রার্থনা করা উচিত । যারা উপাসনার পরিভাষা ও লক্ষণ জানেন না, তাদের এই ধরনের সন্দেহ আছে। ঋষি দয়ানন্দ নিম্নলিখিত উপায়ে 'প্রার্থনা' এর স্বরূপ প্রদর্শন করেছেন -

স্বীয় পরিপূর্ণ পুরুষার্থের অতিরিক্ত উত্তম কর্ম সিদ্ধির জন্য পরমেশ্বর অথবা কোনও সামর্থ্যবান মানুষের সাহায্য গ্রহণকে "প্রার্থনা" বলে।

[আর্যোদ্দেশ্যরত্নমালা সংখ্যা ২৪ - স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী]

যেভাবে কোন কুলি বা বোঝা বহনকারী শ্রমিক নিজে কোন পরিশ্রম না করে , হাত উপর হাত ধরে দাঁড়িয়ে থেকে এবং অন্যদের এটা বলে যে বোঝাটি আমার মাথায় তুলে দাও তাহলে কেউ তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হবে না । একইরকম ভাবে একজন ছাত্র শিক্ষকের দ্বারা শেখানো পাঠ মনোযোগ দিয়ে শোনে না , লিখে না , মনে রাখে না বা অনুসরণ করে না এবং শিক্ষকের অন্যান্য ভালো ভালো উপদেশ পালন করে না । কিন্তু যখন পরীক্ষার সময় ঘনিয়ে আসে "গুরুজী, গুরুজী" বলে করজোড় করে শিক্ষককে বলে যে আমাকে পাস করিয়ে দিন। এই পরিস্থিতিতে কোন বুদ্ধিমান, ন্যায়পরায়ণ শিক্ষক সেই শিক্ষার্থীকে,যে কিনা পরীক্ষার জন্য কোন চেষ্টা করেননি তাকে দেখে উত্তীর্ণ করে দিবেন ? কখনোই দেবেন না ।

ঠিক একইভাবে ঈশ্বর, প্রার্থনাকারী ব্যক্তিকে সাহায্য করার পূর্বে কিছু বিষয় চান । ঈশ্বর আমাদের ধন, শক্তি, স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, পুত্র ইত্যাদি প্রাপ্তির জন্য এবং অন্যান্য কামনাগুলোর সাফল্যের জন্য বেদের বিধি পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন । যে ব্যক্তি সেই নিয়মগুলি যথাযথভাবে না জেনে এবং সময়মত তাদের আচরণ অনুসরণ না করে প্রার্থনা করে, তাদের অবস্থা পূর্বোক্ত কুলি বা ছাত্রের মতো । বিধিরহিত পুরুষার্থহীন প্রার্থনা শুনে একজন

শিক্ষকরূপী ঈশ্বর প্রার্থীর ইচ্ছা পূরণ করেন না, কারণ ঈশ্বর অত্যন্তজ্ঞানী এবং সর্বোচ্চ ন্যায়বিচারক।

শুদ্ধ জ্ঞান এবং শুদ্ধ কর্ম ছাড়া প্রার্থনা করা একপাক্ষিক । বেদাদি সত্যশাস্ত্র যথার্থরূপে পড়ে না বুঝে এবং সে অনুযায়ী কাজ না করে যতই প্রার্থনা করা হোক না কেন, সেই প্রার্থনা 'প্রার্থনা' বিভাগের আওতায় আসে না ।

যে ঈশ্বরভক্ত 'প্রার্থনা'র জন্য কেবল মন্দিরে যায়, প্রতিমা দর্শন করে , তার সামনে মাথা নত করে, তিলক লাগায় , চরণামৃত পান করলে ,পত্র ফুল অর্পণ করে , কিছু খাদ্য সামগ্রী উপহার দেয় , যে কোনও নাম স্মরণ করে , মাল্য দান করে , দুটি ভজন গেয়ে থাকে, কোন তীর্থযাত্রায় যেয়ে স্নান করে , কিছু দান করে পুণ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে , তাদের প্রার্থনাও সফল হয় না। এইসব প্রার্থী , প্রার্থনা করার সাথে সুকর্মের সাথে যুক্ত হয় না, অনুশীলনের সময়ে ঈশ্বর- যেভাবে পুরুষার্থ, প্রার্থনা করার সময় চেয়ে থাকে , সেই আচরণ তারা করে না। এর ফলে তারা প্রার্থনার সময় ব্যর্থ হয়। এটা আশ্চর্যজনক যে হিংসা, মিথ্যাচার, চুরি, ব্যভিচার, মদ্যপান, অসংযমতা, অলসতা, অসারতা ইত্যাদির মতো অশুভ কাজ, অশান্তি, রোগ, ভয়, শোক, অজ্ঞতা, মৃত্যু, ব্যর্থতা ইত্যাদির দিকে পরিচালিত করে,এই অশুভ কর্ম সম্পাদন করা "প্রার্থী" ঈশ্বরের কাছে সুখ, শান্তি, নির্ভীকতা, স্বাস্থ্য, দীর্ঘ আয়ু ,বল, পরাক্রম, জ্ঞান, খ্যাতি ইত্যাদি চায়, এটা কিভাবে সম্ভব ? একেবারেই না।

যদি পূর্ণ পুরুষার্থের পরও করা প্রার্থনা সফল না হয়, তাহলে শাস্ত্রীয় তত্ত্ব অনুযায়ী তিনটি কারণ থাকতে পারে। সেগুলো হল কর্ম, কর্তা এবং সাধন ।দেখুন ন্যায় দর্শনের ২।১।৫৮ তম সূত্র (ন কর্মকর্তৃসাধনবৈগুণ্যাৎ) যখন এই তিনটি (= কর্ম, কর্তা এবং সাধন) স্বীয় গুণে যুক্ত থাকে, তখন প্রার্থনা অবশ্যই সফল হয় । বিপরীতভাবে এই তিনটির যে কোন একটির যদি অভাব থাকে তাহলে যতই প্রার্থনা করা হোক না কেন, প্রার্থীর প্রার্থনা সফল হয় না ।

উদাহরণস্বরূপ একজন অসুস্থ ব্যক্তি তার রোগ থেকে মুক্তি পেতে একজন দক্ষ ডাক্তারের কাছে যায় এবং ডাক্তারকে বলে - ' আমাকে সুস্থ করে দিন '। এরপর ডাক্তার তার রোগ পরীক্ষা করার পর রোগীকে নির্দেশ দেন যে অমুক ঔষধ ,এই পদ্ধতিতে দিনে এতবার এই পরিমাণে খাওয়া উচিৎ এবং খাদ্যবিষয়েও বলে যে এই জিনিসটি খাওয়া উচিত এবং এই জিনিসটি খাওয়া যাবে না । পাশাপাশি এর সাথে রোগীকে রুটিন করে তাঁর আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করেন ।

এই ধরনের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও যদি রোগী যে ঔষধ, যখন যখন যে মাত্রায়, যত বার গ্রহণ করতে হবে এবং যে বিধিতে গ্রহণ করতে হবে ,সেভাবে না করে তখন এটা কর্মের দোষ হয় । আর যদি ঔষধ সংক্রান্ত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করে, কিন্তু রোগী-রাগ, অলসতা, দুর্ব্যবহার, দুশ্চিন্তা, ভয়, হতাশা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ থাকে তাহলে এটি কর্তার দোষ । রোগী নিজে যতই পারদর্শী হোক না কেন, ওষুধটি নকল থাকে, নষ্ট থাকে তাহলে সেটা সাধনের দোষ ।

ঠিক একইভাবে, একজন ধার্মিক ঈশ্বরভক্ত বিশ্বাসীর প্রার্থনা যদি সফল না হয় এবং তার দুঃখ দূর না হয়, তাহলে এটা মনে করা উচিত নয় যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এমন অবস্থায় এটা অনুমান করা উচিত যে তার পুরুষার্থে কিছু ঘাটতি আছে অর্থাৎ কর্ম,কর্তা ও সাধনে কোথাও না কোথাও কোনো ঘাটতি বা ক্রুটি আছে । সেই ক্রুটিগুলি এবং দোষগুলি জেনে সেগুলি দূর করা উচিত । এটি করার মাধ্যমে আবেদনকারীর প্রার্থনা অবশ্যই সফল হবে । অতএব উপরের বর্ণনা থেকে এটা প্রমাণিত যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে এবং তিনি দুঃখ দূর করেন, কিন্তু সমস্ত প্রার্থনা করা ভক্তদের দুঃখ দূর করেন না কেবল সেই ভক্তদের দুঃখ দূর করেন যারা পুরুষার্থের সাথে সঠিক বিধি অনুসারে ঈশ্বরের প্রার্থনা করেন ।

নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা কিভাবে সম্ভব ?

কমলঃ দাদা ! বলো, ঈশ্বর যদি নিরাকার হন, তাঁকে মনে করব কেমন করে?

বিমলঃ আচ্ছা, শোনো । 'মনে করা'—তাই না? মনে রেখো, 'মনে করা' দুই প্রকারের ।

■ প্রথমতঃ—জগতের প্রাণী ও জগতের পদার্থকে মনে করা।

■ দ্বিতীয়তঃ- সর্বব্যাপক, সর্বনিয়ন্তা, ইন্দ্রিয়াতীত পরম প্রভু পরমাত্মাকে মনে করা। জগতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বস্তু সমূহকে মনে করা যায়, তাদের দর্শন করে, অথবা তাদের বিয়োগ হলে ।

যথা—এক বন্ধুকে আমি কলকাতায় দেখলাম, তার সঙ্গে পরিচয় হলো । ছ'বছর পর আবার আমি তাকে বোম্বাই নগরে দেখলাম । এবার আমার মনে হলো একে তো আমি কলকাতায় দেখেছিলাম । এবার শোনো বিয়োগ হলে কেমন করে মনে করা যায় – যেমন নাকি, – আমার এক বন্ধু, তার সঙ্গে আমার গভীর ভালোবাসা । একদিন সে বেড়াতে চলে গেল । এবার তার কথা বার বার মনে হতে লাগল না জানি এখন সে কোথায় আছে । যত সময় আমরা পরস্পরকে দর্শন করি, তত সময় মনে করার কোনো প্রশ্নই আসে না । কেননা, যে বস্তু চোখের সামনে আছে, তার সম্বন্ধে মনে করা আবার কি? যখন পরস্পর বিযুক্ত হলাম, তখন তার কথা মনে জাগল এ হলো জাগতিক বস্তু সমূহকে মনে করা । ঈশ্বরকে মনে করা এ হতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাপার । ঈশ্বরকে মনে করা বা ঈশ্বরের ধ্যান করা, মানে – মনকে নির্বিষয় করা । 'মনে করা' অর্থাৎ মন এবং ইন্দ্রিয় সমূহে ছড়ানো আত্মিক শক্তিকে আত্মায় একত্র করা । যত সময় মন এবং ইন্দ্রিয় সমূহ জাগতিক বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকবে, তত সময় আত্মা ঈশ্বরের ধ্যান বা ঈশ্বরকে মনে করতে পারবে না । ঈশ্বরের ধ্যান করার জন্যে মন এবং ইন্দ্রিয় সমূহকে নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা বিষয়ের প্রতি ধাবিত হতে না দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

মনে রাখতে হবে যে, যোগের অষ্ট অঙ্গের মধ্যে ধ্যান হলো সপ্তম অঙ্গ । যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা এই ছয়টি অঙ্গের পরিপালন করা সর্বপ্রথম আবশ্যক, তারপর সাধক ধ্যানের অধিকারী হয়। নিয়মানুসারে যোগের ছয়টি অঙ্গের পরিপালন বা অনুশীলন হওয়ার পর ধ্যান স্বাভাবিক ভাবেই হতে থাকে । যখন যোগের ছয় অঙ্গের পর ধ্যানের স্থান, সে অবস্থায় মূর্তির দ্বারা আরম্ভেই কেমন করে ধ্যান হবে ?

কমলঃ দাদা! মন যে বড় চঞ্চল,—ছট্‌ফটে । নিরাকারে সে কেমন করে যুক্ত হবে বুঝতে পারছি না? মনকে অভীষ্ট স্থানে যুক্ত করতে হলে সাকার পদার্থের সাহায্য ছাড়া কেমন করে তা সম্ভব হবে? মন নিবিষ্ট করার জন্য সাকার পদার্থ একান্ত আবশ্যক । সাকার পদার্থ ছাড়া মনে স্থিরতা আসতেই পারে না ।

বিমল - স্নেহের ভাইটি ! তুমি বড় সরল । আরে মন যে নিরাকারেই স্থির হয় একথা জানোনা? সাকারে যে স্থির হতেই পারবে না । কেননা, সাকার পদার্থ যে, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ বিষয় যুক্ত তাই মন ঐ সব বিষয়ে আবদ্ধ হয়ে নিজের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে । যদি সাকার পদার্থে মন স্থির হতো, তাহলে জগৎটাই তো আকার যুক্ত, অর্থাৎ সাকার । যেহেতু জগৎটা সাকার, অতএব সকলের মন জগতে স্থির হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু তা তো হয় না । জাগতিক বস্তুতে যতই মন প্রবেশ করেছে, ততই তার মনে চঞ্চলতা অধিকতর হচ্ছে । যদি আরও একটু গভীরভাবে বিচার করো তাহলে বুঝতে পারবে যে, মন কখনও স্থির হয় না, মন স্থির হওয়া মানেই মরণ । মন অথবা হৃদয়ের গতি রুদ্ধ হওয়াই মরণ । মন কোথাও স্থির হচ্ছে না — মানে, মানুষ মরে নাই । বাস্তবিক পক্ষে মনের বাহ্য বৃত্তি সমূহের অন্তর্মুখী হওয়াকেই মানসিক স্থিরতা বলে । মানুষ যত সময় বেঁচে থাকবে তত সময় তার মন গতিশীল থাকবে ।

কমলঃ তাহলে, তুমি বলতে চাও যে, যারা মূর্তিপূজা দ্বারা ঈশ্বরের ধ্যান করে তারা সব ভুল করে । আমার বিবেচনায় মূর্তি দ্বারা মনের চাঞ্চল্য দূর হতে পারে । এই জন্যই তো মানুষ শ্রীরাম, কৃষ্ণ, দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেব দেবীর মূর্তি পূজা করে থাকে।

বিমল - মূর্তি পূজা দ্বারা ঈশ্বরের ধ্যান কোনো কালেও হতে পারে না । আমি প্রথমেই বলেছি যে, ধ্যান মানে মনকে বিষয় শূন্য করা অর্থাৎ মনের ঝুলিতে কোনো জিনিষটি থাকবে না, মনের ঝুলিটিকে একেবারে খালি করে রাখতে হবে ।

একটু ভেবেই দ্যাখো, মূর্তিতে কী আছে? মূর্তিতে পঞ্চ বিষয় বিদ্যমান । মোটামুটিভাবে বিচার করলে দেখবে মূর্তিতে'রূপ' আছেই । ফল, সন্দেশ, দুধ, জল যা সমর্পণ করা হয় তাতে 'রস' আছে । মূর্তি পূজায় যে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয় সেই ফুলে 'গন্ধ' আছে ।

এই অবস্থায় মনের চঞ্চলতা মূর্তির দ্বারা কেমন করে দূরে হতে পারে?যদি মূর্তি দ্বারা মনের চাঞ্চল্য দূর হতো তাহলে মূর্তিপূজক, শ্রীকৃষ্ণকে যে ভগবান বলে থাকে সেই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে ধনুর্ধর অর্জুনের সামনে কেনো, অতি নিকটে থেকেও, তার মনের চঞ্চলতা দূর হয় নি কেনো? তার মনে চঞ্চলতা যেমন তেমনই ছিল, আদৌ দূর হয়নি । অর্জুনের মনের চঞ্চলতা দূর হলে কি শ্রীকৃষ্ণকে সে প্রশ্ন করত?

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্। তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্।।

[গীতা ৬/৩৪]

অর্থাৎ - হে কৃষ্ণ মন যে বড়ই চঞ্চল, বড় শক্তিধর, হঠকারী, একে স্ববশে আনা, বায়ুকে গাঁঠরী বাঁধার মত দুষ্কর, বড়ই কঠিন ।

একথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে বলেছিলেন—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্। অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।।

[গীতা ৬/৩৫]

অর্থাৎ - হে অর্জুন । মন যে বড় চঞ্চল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, মনকে নিগ্রহ করা দুষ্কর তা আমি জানি, কিন্তু মনে রেখো, এই প্রবল ও দুর্নিগ্রহ চঞ্চল মনকে অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা বশে আনা যায় — অর্থাৎ বশে আনা অসম্ভব নয় ।

বাস্তব শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সামনে মূর্তিমান থেকেও অর্জুনের মন স্থির হলো না, সে সময় তো তাঁকে দিনরাত সে প্রত্যক্ষ করছিল কিন্তু মানুষ আজ তার জড়মূর্তি সামনে রেখে চঞ্চল মনকে স্থির করার দুঃসাহস দেখায় । এতে কি কখনও মন স্থির হতে পারে ?

কমলঃ তাহলে মূর্তিপূজা করাই উচিত নয় বুঝি ?

বিমল - হ্যাঁ, মূর্তি পূজা করতে হবে বৈকি তবে, সে মূর্তির পূজা কেমন জানো? জড় মূর্তির পূজা জড়ের মতো, আর চেতন মূর্তির পূজা চেতনের মত কর উচিত ।

কমলঃ জড়মূর্তির পূজা জড়ের মতো, আর চেতন মূর্তির পূজা চেতনের মতো করা উচিত, এ কথার রহস্য বুঝলাম না। একটু পরিষ্কার করে বললে বুঝতে পারি ।

বিমলঃ 'পূজা' শব্দের ধাতুগত এবং ব্যবহারিক প্রভৃতি কয়েক প্রকারের অর্থ হয় । 'পূজা' অর্থাৎ আদর, যত্ন করা, যাকে সংস্কৃতে — সৎকার বলা হয়। কোনো বস্তুর যথাযথ ব্যবহার, কোনো বস্তুর যথাযথভাবে রক্ষা, কাহাকেও যথাযথ দান দেওয়াকেও পূজা বলে । এবার একটু বিচার-বিবেচনা করে জড়মূর্তি পূজার অর্থ চিন্তা কর । জড়মূর্তি পূজা মানে, সেই জড়মূর্তিকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখা । মূর্তিটিকে এমন স্থানে স্থাপন করবে, যেথায় ,

যেথায় সেই মূর্তিটির কোন প্রকার ক্ষতি না হয় অর্থাৎ যেন ভেঙে না যায়, ময়লা না হয়, তার ঔজ্জ্বল্য নষ্ট না হয়, অবহেলিত হয়ে না থাকে এখানে মূর্তি পূজা অর্থাৎ জড়মূর্তির যথাযথ উপযোগ, উচিত রক্ষণাবেণ। পূজা মানে এ নয় যে, প্রত্যেক বস্তুর সামনে ঢিপ্-টিপ্ করে মাথা ঠুকে তাতে ফুল বেলপাতা, তুলসীপাতা, ফল-মিষ্টি-নৈবদ্য অর্পণ করা । যেমন নাকি, একজন আর একজনকে বলল—আরে ভাই ! এই সাধুজীর 'পেট পূজা' করিয়ে দাও । এর মানে কী? না, সাধুকে খাইয়ে দাও । ওর মানে এ নয় যে, সাধুর পেটের উপর এক গুচ্ছ বেলপাতা, ফুল-ফুল, মিষ্টি রেখে তাকে প্রণাম কর । ঠিক্ এমনি— একজন আর একজনকে বলল—এই যে গুণ্ডাকে দেখছ, কেবল বাজে বকেই যাচ্ছে, যা তা বলছে, পিঠ পুজো করে দাও, তবে এ শান্ত হবে— নইলে হবে না । এর মানে—এর পিঠে আচ্ছা করে কয়েক ডাণ্ডা কষে দাও । পিঠ পূজার অর্থ এ হবেনা যে, কিছু বেলপাতা, ফুল, ফল পিঠের ওপর রেখে প্রণাম কর । দেখলে একস্থানে পূজার অর্থ হল খাওয়ান, আর একস্থানে অর্থ হল মার দেওয়া । ঠিক্ এমনি জড়মূর্তি পূজার অর্থ—মূর্তিকে যথাস্থানে সুরক্ষিত রাখা, যেন তার চাক্‌চিক্য নষ্ট না হয় — ময়লা না হয় । জড়মূর্তির ওপর ফুল-ফল অর্পণ, এবং তার সামনে মাথা ঠুকে প্রণাম করার অর্থ মূর্তি পূজা নয় কেননা, মূর্তিতে সে যোগ্যতা নেই যে, সে তোমার ভক্তি শ্রদ্ধা, অনুভব করবে এবং সে ফল-ফুল-মন্ডামিঠাই খাবে ।

যত সজীব বা চেতন মূর্তি এ জগতে আছে— যথা মাতা, পিতা, গুরু, অতিথি, সন্ন্যাসী, উপদেশক তথা অন্যপ্রাণী, এরা সবাই ফল-ফুল-মন্ডা-মিঠাই পেয়ে লাভবান হয় । ফল-ফুল, মন্ডা, মিঠাই প্রভৃতি দ্বারা বিবিধ প্রকারে তাদের পূজা করা উচিত । এখানে 'পূজা' অর্থ আদর যত্ন করা -সংস্কৃতে যাকে সৎকার বলে । এর নাম সজীব মূর্তি পূজা ।

কমলঃ ঈশ্বর যদি সর্বত্র বিদ্যমান থাকেন, তিনি মূর্তিতেই বা থাকবেন না কেনো? যদি মূর্তিতে ঈশ্বর থাকেন, তাহলে মূর্তি পূজা করায় দোষ কোথায়? যারা মূর্তি পূজা করে তারা মাটি বা পাথরের পূজা করে না, ব্যাপক পরমাত্মারই পূজা করে ।

বিমলঃ একথা সত্য যে, ঈশ্বর সর্বত্র বিদ্যমান বলে, তিনি মূর্তিতেও ব্যাপক । কিন্তু তিনি সর্বত্র আছেন বলে সব স্থানে সর্ববস্তুতে তাঁর পূজা হয়, এর মূলে কোনো যুক্তি নেই! দ্যাখো, পূজা যে করে সে 'জীবাত্মা' পূজার উদ্দেশ্য কী? জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন । কেমন? মিলন—কখন হয় —যখন উভয়ে উপস্থিতি থাকে । মূর্তিতে ঈশ্বর আছেন সত্য, কিন্তু সেখানে 'জীবাত্মা' নেই। এ অবস্থায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন হবে কেমন করে । হ্যাঁ, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়েই বর্তমান, তাই সেখানেই উভয়ের মিলন সম্ভব । অতএব যে মানুষটি ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে চায়, তাকে আপন হৃদয়েই মন এবং ইন্দ্রিয়কে স্ব-অধীন করে ঈশ্বরের পূজা করা কর্তব্য ।

দ্যাখো ! ঈশ্বর সর্বত্র, এ কথা জেনেও কি সব জল পানের যোগ্য ? সিংহ এবং সাপ উভয়েই পরমাত্মায় ব্যাপক, এ অবস্থায় আমি জিজ্ঞাসা করি, সিংহ ও সাপের কাছে যাওয়া কি উচিত? অতএব, পরমাত্মা মূর্তিতেও ব্যাপক আছেন সুতরাং মূর্তির পূজা করা উচিত, একথা বলার মত অজ্ঞানতা ও মূর্খতা আর কী হতে পারে? পরমাত্মা মিছরীর টুকরোতেও আছেন, বিষেও আছেন, তাই বলে কী বিষ খাওয়া উচিত? কদাপি নয় সেই জিনিষই খাওয়া উচিত যা খাওয়ার যোগ্য । মূর্তি পূজক মনে করবে যে, সে মূর্তিতে ব্যাপক পরমাত্মার পূজা করছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মূর্তির দ্বারা ব্যাপক ঈশ্বরের পূজা হয় না । হয়ত তুমি বলবে, কেনো হবেনা? কেনো হবে না, তাই বলছি । যে সমস্ত বস্তু মূর্তির ওপর দেওয়া হয় যথা— বেলপাতা, ফুল, চাল, কলা, গামছা, কাপড় ইত্যাদি, তাতেও তো পরমাত্মা ব্যাপক আছেন । যথা—আকাশ ঘটেও ব্যাপক এবং ইটেও ব্যাপক এই অবস্থায় যদি কোনো ব্যক্তি ঘটে আকাশ ব্যাপক এই মনে করে ইটটা তুলে ঘটাকাশে ছুঁড়ে মারে, তাহলে সে ভুল করবে । কেননা, আকাশ ব্যাপক হওয়ায় আকাশের গায়ে ইঁট লাগতে পারে না, ইঁট তুলে যদি ঘটে আঘাত করা যায় তাহলে ঘট ভেঙে যাবে, কিন্তু আকাশ ভাঙবে না । কেননা আকাশ যে, সে ইটেও ব্যাপক ঠিক তেমনি, যে কোনো ব্যক্তি যদি সে পত্র-পুষ্প, ফল-জল, মিষ্টি আদি মূর্তির সামনে বা মূর্তির উপর, অর্পণ করে তা মূর্তিতেই অর্পিত হয়, ঈশ্বরে নয় । কেননা, ঈশ্বর যে ঐ সব পদার্থেও ব্যাপক।

কমলঃ মূর্তির উপর বা সামনে ফল, ফুল প্রভৃতি না হয় অর্পণ নাই বা করলাম, কিন্তু সেই মূর্তিকে শ্রদ্ধা সহকারে দর্শন করলে ব্যাপক পরমাত্মা এবং তাঁর মহিমার জ্ঞান অবশ্যই হবে।

বিমলঃ এও উল্টো কথা বলছো । একটু ভেবে দ্যাখো, দর্শনে ব্যাপক পরমাত্মার এবং তাঁর মহিমার জ্ঞান কেমন করে হবে? শোনো। তিলে, তেল ব্যাপক আছে,—কেমন? কিন্তু, যে তিলকে দ্যাখে, সে দ্যাখে তিলকে, তিলে তেল দ্যাখে কী? সে তো তিলই দেখবে, তাই তো? সে যতই শ্রদ্ধা এবং মনযোগ সহকারে তিলকে দর্শন করুক না কেনো, সে তিলই দেখবে, তিলে তেল দেখতে পারবে না । তেল দেখবে কখন, যখন সেই তিলকে ঘানিতে ফেলে পেষণ করা হবে,—তখন । এইভাবে মূর্তিতে ঈশ্বর ব্যাপক আছেন, সত্য, কিন্তু দর্শক সেই মূতিকে দর্শন করে মাত্র ঈশ্বরকে সে দর্শন করে না । ঈশ্বর দর্শন তখনই সম্ভব, যখন দর্শক জড়মূর্তির সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করে আত্মায় সেই ব্যাপক পরমাত্মার সন্ধান করবে । বাকী রইল ঈশ্বরের মহিমা জ্ঞান । সেও তো মানুষের গড়া মূর্তিতে ঈশ্বরের মহিমা দর্শন? তাই বা কেমন করে হবে? মানুষের গড়া মূর্তিতে শিল্পীর মহিমাই প্রকাশ পায় । মূর্তি-দর্শক বলবে— "বাঃ, বলাই পাল কী ঠাকুরই না গড়েছে, যেন কথা কইছে, কী অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্য।" এ কার মহিমা? এ সেই মূর্তি রচয়িতার মহিমা, ঈশ্বরের নয় ।

হ্যাঁ, পরমাত্মা যা নিমার্ণ করেছেন তাতে পরমাত্মার মহিমা দর্শন করতে পারবে, দেখতেও পাবে। তুমি পরমাত্মার মহানতা দর্শন করতে চাও তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রচনা বিচার বিবেচনা করে সন্ধান কর, দেখবে ঈশ্বরের রচিত ক্ষুদ্রাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম বস্তুতে কী অপূর্ব সৃষ্টি কৌশল! মানুষের তৈরী জড় মূর্তিতে পরমাত্মার মহিমার কোন চিহ্নটা রয়েছে যে, তুমি তা দেখতে পাবে?

কমলঃ দাদা ! ফল সদাসর্বদা ভাবনাময়ই হয়ে থাকে । মূর্তিকে ঈশ্বর না মেনেও আমরা তাতে ঈশ্বরের ভাবনা আরোপ করে ফল লাভ করতে পারি। দ্বিতীয় কথা, যদি কোনো লোক এক লাফে খুব উঁচুতে উঠতে না পারে, তার জন্য মই বা সিড়ি প্রয়োজন। আমি মূর্তি পূজাকে ঈশ্বর প্রাপ্তির প্রথম সিঁড়ি বলেই মনে করি । অতএব যদি কোন লোক ভগবানের কল্পিত মূর্তি তৈরী করে, তাতে ঈশ্বরের ভাবনা আরোপ করে পূজা করে, আমি তাতে কোনো দোষ দেখি না ।

বিমলঃ তোমার মনে রাখা উচিত যে, ভাবনা কোনো পদার্থের বাস্তবিকর্তাকে অর্থাৎ সত্যকে পরিবর্তন করতে পারে না। কোনো মানুষ যদি অজ্ঞানতা বশতঃ চুনের জলে দুধের ভাবনা আরোপ করে তাকে মন্থন করে, তা বলে তুমি কি বলতে পারো, তা থেকে সে মাখন পাবে? জলে অগ্নির ভাবনা করে শীতার্ত ব্যক্তি কি শীত দূর করতে পারবে? পাথরে রুটির ভাবনা করে কি মানুষ তার ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পারবে? ভাবনা বা মনে করলেই যদি প্রত্যেক জিনিষ পাওয়া যেতো, তাহলে জগতে কেহই দুঃখী ও নির্ধন থাকত না । আর কাহাকেও কোনো বস্তুলাভ করার জন্য হাড়ভাঙা পরিশ্রমও করতে হতে না । সেই ভাবনাই বাস্তবিক ভাবনা, যার আধার সত্য, নইলে সে অভাবনা । কোনো মানুষ যদি জোলাপের গুলিকে হজমীর গুলি মনে করে তা খায়, তার কি পেট খারাপ হবে না? তাই বলছিলাম – কোনো বস্তুতে ভাবনা আরোপ করে সেই বস্তু লাভ করার আশা নিরেট বোকামী ।

দ্যাখো, সোমনাথের মন্দিরের মূর্তিতে পূজারীদের জড় ভাবনা ছিল না, সোমনাথ যে সাক্ষাৎ মহাদেব । যখন মহমুদ গজনবী সোমনাথ মন্দিরের উপর আক্রমণ চালাল, তখন পাণ্ডা এবং পূজারীর দল নিশ্চিন্ত মনে, নিশ্চেষ্ট হয়ে বসেছিল । তারা বলতে লাগল– সকলে মিলে সোমনাথের জপ কর, তিনি নিজেই ম্লেচ্ছকুল নাশ করবেন, আমাদের লড়াই করার কোনো প্রয়োজনই নেই। এই ভাবনা এবং বিশ্বাসের পরিণাম কী হয়েছিল? ইতিহাস পাঠকদের জিজ্ঞাসা করো। তারা বলবে এর পরিণাম কী হয়েছিলো । এর পরিণামের কথা সকলে ভাল করে জানে ।

শুধু সোমনাথই বা কেনো? এই ভাবনার বশবর্তী হয়ে সহস্র মন্দির ও মূর্তি গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল । লুণ্ঠনকারীদল কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি লুটে নিয়ে বিদেশে চলে গেল এ সব দেখে শুনেও মূর্তি পূজকদের অন্ধ বিশ্বাস ঘুচলো না । কী আশ্চর্যের কথা! নির্জীব– অচেতন জড় মূর্তি, যে কিছুই করতে পারে না, মানুষ কিনা সেই জড় মূর্তিতে সৃজন ক্ষমতার ভাবনা আরোপ করল! কী ভয়াবহ অন্ধবিশ্বাস? আর যারা চেতন, যারা সব কিছু করতে সক্ষম তাদের উপর কিনা, না করতে পারার ভাবনা আরোপ করল! আমাদের দেশের এবং জাতির অধঃপতনের মূল কারণই এই । এবার তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছ অজ্ঞানতাপূর্ণ ভাবনা আরোপ কত ভয়াবহ ও দুঃখ-জনক হতে পারে ।

তুমি যে বলছো মূর্তি পূজা ঈশ্বর প্রাপ্তির প্রথম সোপান বা সিঁড়ি - এ একেবারে ডাহা মিথ্যা। হ্যাঁ, চেতন মূর্তির পূজা ঈশ্বর প্রাপ্তির প্রথম সোপান কিছু অংশে স্বীকার করা যেতে পারে । কিন্তু জড় মূর্তির পূজা তো কোনো মতেই স্বীকার করা যেতে পারে না । জড় মূর্তি পূজাকে হিমালয় পাহাড়ের ওপর আরোহণ করার প্রথম সোপান যদিও মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু যে মূর্তি জ্ঞানশূন্য, তাকে ঈশ্বর প্রাপ্তির প্রথম সোপান কেমন করে মেনে নেওয়া যেতে পারে?

যদি কেহ ইংরেজী ভাষায় কথা বলা শিক্ষা করতে চায়, তাহলে তার ইংরাজী ভাষা শিক্ষার প্রথম সোপান হবে, এ, বি, সি, ডি প্রভৃতি বর্ণ । যদি কেহ সংস্কৃত বা হিন্দী ভাষায় কথা বলা শিক্ষা করতে চায়, তাহলে তাকে সংস্কৃত বা হিন্দি শিক্ষার প্রথম সোপান শিক্ষা করতে হবে অ, আ, ই, ঈ প্রভৃতি বর্ণমালা । কিন্তু যদি কেহ এ, বী, সী, ডী প্রভৃতি বর্ণকে সংস্কৃত শিক্ষার প্রথম সোপান মনে করে এ, বী, সী, ডী পড়তে আরম্ভ করে তা হলে কি সে সংস্কৃত শিক্ষা করতে পারবে? যার সিঁড়ি যা, তা দিয়েই কৃতকার্যতা লাভ করা যেতে পারে । ঈশ্বর প্রাপ্তির সিঁড়ি বা সোপান হলো চেতন প্রাণীর নিষ্কাম সেবা, সৎসঙ্গ, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি । এইসব সিঁড়ির উপর নিরন্তর আরোহণ অর্থাৎ এদের বিধিপূর্বক অনুষ্ঠান দ্বারাই ঈশ্বর প্রাপ্তি হতে পারে । তুমি যে প্রশ্ন করলে– ঈশ্বরের কাল্পনিক মূর্তি নির্মাণ করে পূজা করার দোষ কোথায়? দোষ একটা নয়–বহু ।

প্রথম দোষ - নকল বস্তুতে আসল বস্তুর গুণ আছে মনে করে মানুষ নিজে নিজেকে প্রতারণা করবে । পশু, পাখী, পোকামাকড়ও ভালভাবে জানে যে, কোনো মেকীবস্তু আসল হয়ে কাজে লাগবে না। বিড়ালের সামনে মাটি বা রবারের ইঁদুর রেখে দিয়ে দেখো, সে কখনও তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধরতে যাবে না । মৌমাছির সামনে কাগজের ফুল রেখে দিয়ে দেখো, সে ভুলেও আসল ফুল মনে করে তাতে মধু খাওয়ার জন্য বসবে না। এইভাবে অন্য প্রাণীরাও মেকি বস্তুর সঙ্গে প্রেম করে না, করবে না।

কিন্তু মানুষ, যে প্রাণী জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার দাবীদার তারাই মেকি বস্তুর কাছ থেকে যথেষ্ট ফল পাবার আশা করে এবং তাতে আসক্ত হয় । হায়! এর চেয়ে আশ্চর্য আর কী হতে পারে?

দ্বিতীয় দোষ – ঈশ্বরের কাল্পনিক মূর্তি পূজক ঈশ্বরকে নিজের মতই ভাবে । নিজের প্রয়োজনীয় বস্তুর মতো তারও প্রয়োজন আছে মনে করে। যথাঃ—মানুষ যেমন নিজের জন্য ভোজনের প্রয়োজন অনুভব করে, ঠিক্ তেমনি সেও ঈশ্বরের ভোজনের প্রয়োজন আছে মনে করে থালায় নৈবেদ্য ও ভোগ সাজিয়ে দেয় । যেমন সে নিজে কাপড় পরে। তেমনি সে কল্পিত ঈশ্বরের মূর্তিকেও কাপড় পরায়, সে যেমন নিজে স্নান করে, তেমনি সেই কল্পিত ঈশ্বরের মূর্তিকে জল দিয়ে স্নান করায় । সে যেমন নিজে ঘুমায় এবং জাগে, তেমনি সে তার কল্পিত ঈশ্বরের মূর্তিকেও ঘুম পাড়ায় এবং জাগায় । সে যেমন নিজে অলংকার ধারণ করে, তেমনি সে কল্পিত ঈশ্বরের মূর্তিকেও অলংকার ধারণ করায় । মানুষ যখন ঈশ্বরেও নিজের মতো অভাব ও প্রয়োজন অনুভব করে, সেই অবস্থায় অভাবগ্রস্ত ঈশ্বরের কাছে কোনো কল্যাণের আশা করা যেতে পারে কিনা সে বিচার তুমিই কর । যে ঈশ্বর নিজেই অভাবগ্রস্ত সে অন্যের অভাব মোচন করবে কেমন করে? তুমিই বলো— একজন অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখাবে কেমন করে? অন্ধ কি অপর অন্ধকে পথ দেখাতে পারে?

তৃতীয় দোষ—ঈশ্বর এক, আর তাঁর মূর্তি অনেক । কেননা, যতগুলি সম্প্রদায় তারা তাদের আপন আপন বিশ্বাস মতে ততগুলি মূর্তি গড়ে থাকে। পরিণাম পরস্পর রাগ-দ্বেষ, ঝগড়া-বিবাদ থেকেই যায়। ঝগড়া-বিবাদ জাতীয় সংগঠনের পক্ষে মহান ক্ষতিকর এরূপ আরও অনেক দোষ দেখান যেতে পারে।

কমলঃ তোমার বলার উদ্দেশ্য - মূর্তি তৈরী করাও উচিত নয় আর মূর্তির পূজা করাও উচিত নয় । আমার মনে হয়, অবশ্য আমি যতদূর বুঝি— শান্ত-রাগ-রাগিণীময় গীত মহাপুরুষদের চিত্র এবং মূর্তি দর্শনে মনে শান্তি আসে আর ভক্তের চিত্তে তার বেশ ভাল প্রভাবও পড়ে।

বিমলঃ আমার বলার উদ্দেশ্য মোটেই এ নয় যে, কারো মূর্তি গড়বে না, কারো ফটো বা ছবি তৈরী করবে না। আমি চিরদিনই বলে আসছি—মূর্তি গড়া প্রয়োজন । বিশ্বের মহাপুরুষদের মূর্তি অথবা চিত্র তৈরী করলে তাঁদের স্মৃতি রক্ষা করা হয় কিন্তু এর মানে এই নয় যে, চেতন মানুষের মতো তাদের পূজাও করা উচিত । অথবা তাঁদের সকলকে পরমাত্মা বা পরমাত্মার প্রতিনিধি বোধে তাঁদের কাছে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভের আশায় প্রার্থনা করা উচিত ।

প্রাণহীন বস্তু চিরদিনই প্রাণহীন তার মধ্যে জীবিত মানুষের বা সর্বব্যাপক ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত হয়ে কর্ম করার যোগ্যতা কোথায়? যে পিতা জীবিত অবস্থায় সন্তানকে স্নেহ করতে সক্ষম, মৃত্যুর পর সে কি সন্তানকে স্নেহ করতে পারে? যে শরীরে পিতা আপন সন্তানকে কোলে বসিয়ে খাইয়েছে, সেই প্রাণহীন শরীর কি সন্তানের কোনো কাজে লাগে? পিতার সেই প্রাণহীন শরীরে এবং পাথরের বা মাটির তৈরী মূর্তিতে পার্থক্য কোথায়? হ্যাঁ, সামান্য তফাৎ অবশ্যই আছে বলা যেতে পারে । পাথর বা ধাতু নির্মিত মূর্তি পচে গলে যায় না, আর প্রাণহীন শরীর পচে-গলে যায় - তাছাড়া উভয়ের একই অবস্থা । জড় দেবতার পূজার অর্থ হলো তাদের যথাযোগ্য ব্যবহার করা। যদি যথাযথভাবে তাদের ব্যবহার না করা হয়, তাহলে সেই বস্তু সমূহই মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর হতে বাধ্য । যদি বলো সে কেমন করে হয়? তো শোনো ।একজন গঙ্গার বড় ভক্ত। সে রাতদিন তার পূজায় রত থাকে । গঙ্গায় ফুল, নৈবেদ্য অর্পণ করে, গঙ্গা লহরী স্তোত্র পাঠ করে । কিন্তু সে সাঁতার কাটা জানে না । একদিন সে গঙ্গায় নেমে পূজা করছে এমন সময় হঠাৎ সে গঙ্গার গভীর জলে তলিয়ে গেল, – গঙ্গার ভক্ত ডুবে গেল । এতদিন সে গঙ্গার কতো পূজো করেছে–আরাধনা করেছে, আর কিনা সেই গঙ্গা, তার ভক্তকে একেবারে পেটে পুরে নিল ! কই, সে যার এত স্তোত্র পাঠ করত, পুজো পাঠ করত, গঙ্গা তাকে ছাড়ল না তো? এখানে ছাড়াছাড়ি নেই সে তার যত শ্রদ্ধা-ভক্ত দিয়েই পূজা করুক না কেনো? ফুল, বেলপাতা আর যত ইচ্ছা ঘটি বা কলসী-কলসী দুধ ঢালুক না কেনো, সে যত বড় ভক্তই হোক না কেনো, সাঁতার না জানার জন্য তাকে গঙ্গার পেটে যেতেই হবে ।

আর একজন গঙ্গাকে “গঙ্গা মা” মনে না করে নদী মনে করত । সে বোধ হয় কাউকে হত্যা করেছিল । তাই তার হাত পা ছিলো রক্তে রক্তাক্ত । ধরা পড়ার ভয়ে সে সাকার গঙ্গা নদীতে দিল ঝাঁপ । সে সাঁতার জানত, আরকী ভয়? গঙ্গার বুক চিরে সাঁতার কেটে সে পার হয়ে গেল । একজন ‘গঙ্গা মায়ের’ পুজো করে ডুবে মরল, আর একজন গঙ্গাকে জড় জেনে তার যথার্থ ব্যবহার করে রক্ষা পেল এমনটা হলো কেনো জানো? একজন জলের যথাযথ ব্যবহার করা জানত, তাই সে সাঁতার কেটে পার হয়ে গেল, আর একজন জলের যথাযথ ব্যবহার জানত না, তাই গঙ্গার পূজা করেও সে ডুবে গেল । একজন বেঁচে গেল, আর একজন মরে গেল।

আর একজন গঙ্গাকে “গঙ্গা মা” মনে না করে নদী মনে করত । সে বোধ হয় কাউকে হত্যা করেছিল । তাই তার হাত পা ছিলো রক্তে রক্তাক্ত । ধরা পড়ার ভয়ে সে সাকার গঙ্গা নদীতে দিল ঝাঁপ । সে সাঁতার জানত, আরকী ভয়? গঙ্গার বুক চিরে সাঁতার কেটে সে পার হয়ে গেল ।

একজন 'গঙ্গা মায়ের' পুজো করে ডুবে মরল, আর একজন গঙ্গাকে জড় জেনে তার যথার্থ ব্যবহার করে রক্ষা পেল এমনটা হলো কেনো জানো? একজন জলের যথাযথ ব্যবহার করা জানত, তাই সে সাঁতার কেটে পার হয়ে গেল, আর একজন জলের যথাযথ ব্যবহার জানত না, তাই গঙ্গার পূজা করেও সে ডুবে গেল। একজন বেঁচে গেল, আর একজন মরে গেল।

একদল গঙ্গা পূজক আছে তারা মনে করে শুধু গঙ্গা স্নান করলেই মুক্তি হবে। তারা প্রতি বৎসর লক্ষলক্ষ, কোটি কোটি টাকা রেল কোম্পানীকে দিয়ে থাকে। তারা টাকা দেয়, টাকা দিয়ে গাড়ীতে ধাক্কা খায়, তারপর হয়রানি, তারা মনে করে গঙ্গায় স্নান করলে– প্রণাম করলে, ফল-মূল গঙ্গায় দিলে গঙ্গার পূজা হবে। আর একদল আছে যারা গঙ্গা হতে খাল কেটে লক্ষলক্ষ বিঘে জমিতে জল দিয়ে জমিকে উর্বরা করাকে গঙ্গাপূজা মনে করে। তারা গঙ্গার প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করছে, চাকী চালাচ্ছে। তারা কোনোও দিন পুণ্যের আশায় গঙ্গায় স্নান করে না। কিন্তু তারা গঙ্গাকে পাইপের মধ্যে দিয়ে নিজের ঘরে এনেছে, আর নানা প্রকারে তার দ্বারা লাভবান হচ্ছে। এইভাবে তারা জড় পদার্থের যথাযথ ব্যবহার দ্বারা জড়ের পূজা করে চলছে এইভাবে প্রত্যেক জড় পদার্থের বিষয়ে উদাহরণ উপস্থিত করা যেতে পারে।

শেষে রইল, মূর্তি বা ছবি বা ফটো দেখে প্রভাব সৃষ্টির কথা। এ বিষয়ে একটু বিচার বিবেচনা করে দ্যাখো–একটু ভাবো। মনে রাখবে মূর্তি দেখলেই চিত্তে ভাল মন্দের প্রভাব পড়ে না, কিন্তু যে প্রভাবটা পড়ে সেটা আন্তরিক সংস্কারের কারণেই পড়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে। একজন হিন্দু সে শ্রীরাম বা কৃষ্ণের মূর্তি দর্শন করল, সেই মূর্তির সামনে মাথা নত করে প্রণাম করল জানো, সে মূর্তির সামনে মাথা নত করল কেনো? সে শ্রীরাম ও কৃষ্ণের ইতিহাস জানত। তার অন্তরে তাঁদের সম্বন্ধে সংস্কার ছিল যে, শ্রীরাম ও কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার ছিলেন, তাঁরা রাবণ ও কংসকে সংহার করেছিলেন সে পুস্তক পাঠ করেই হোক বা অন্যের কাছে শুনেই হোক্, তার মনের মধ্যে এইরূপ সংস্কার জমা হয়েছিল। তাই সে তাঁদের মূর্তি দেখে প্রভাবিত হয়েছে।

আর যদি সেই হিন্দুর সামনে কোনো জাপানী দেবতা 'কন্‌ফিউশিয়াস' এর মূর্তি রেখে দেওয়া হয় তাহলে কি সেই মূর্তি দেখে তার মনে প্রভাব সৃষ্টি হবে? জাপানী দেবতাকে দেখে তার মনে শ্রদ্ধা জন্মাবে না কেননা, 'কন্‌ফিউশিয়াস' সম্বন্ধে তার কিছুই জানা নেই। যে ব্যক্তিটির অন্তরে'কন্‌ফিউশিয়াস' সম্বন্ধে কোনো সংস্কারই নেই, সেই মূর্তি দেখে তার মাথা নত হয় না।

একজন অহিন্দু সে হিন্দুর কোনো দেব-দেবীর মূর্তিকে দেখে শ্রদ্ধায় মাথা নত করে না। এর কারণ – সেই অহিন্দুদের মনে হিন্দুদের দেব-দেবী সম্বন্ধে কোনো সংস্কার নেই । একজন মুসলমানের কাছে এক দুর্বল তথা কুরূপ মুসলমানের ছবি ভাল, কিন্তু কোনো হিন্দুর দেব দেবীর ছবি তার কাছে ভাল নয়, কেননা, তাদের সম্বন্ধে তার মনে একটুও শ্রদ্ধা নেই । হিন্দু দেব-দেবীদের চিত্র মুসলমানদের কেনো ভাল লাগে না? তার কারণ তারা যে মোমিন বা তারা যে ইসলামের একজন সহায়ক এই সংস্কার তাদের মনে দৃঢ় হয়ে আছে। এবার তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে, মনে যা কিছু প্রভাব পড়ে সে তাদের আপন আপন সংস্কারের জন্য পড়ে, মূর্তি দেখে প্রভাব পড়ে না । যদি মূর্তি দেখে প্রভাব পড়ত, তাহলে প্রত্যেক মানুষের মনে মূর্তির দর্শন মাত্রই তাদের মনে প্রভাব পড়ত এবং তাদের মনে শান্তি আসত, কিন্তু তা হয় না ।

কমলঃ স্কুলে মানচিত্র দেখান হয় । ছোট্ট মানচিত্র দেখে যদি বিশাল পৃথিবীর জ্ঞান হতে পাবে, ছোট্ট ছবি বা মূর্তি দেখলে বিশাল ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ হবে না কেনো?

বিমলঃ দ্যাখো, অক্ষর এবং শব্দ চোখ দিয়ে দেখা যায় না, যায় কী? কিন্তু কান দিয়ে শোনা যায় । বোধ করার জন্য যা কানের বিষয়, মানুষ তাকে চোখের বিষয় করে ফেলেছে । আর যা কোনো ইন্দ্রিয়ের নয়, অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয়াতীত তার বোধ করানোর জন্য কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় করা যাবে বল? যে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়, তাকে কেবল অনুভব দ্বারাই জানা যেতে পারে । আর এ আবশ্যক নয় যে, নিরাকার অক্ষরের এবং শব্দের কল্পিত চিহ্ন গড়লে তবেই বিদ্যা হবে, নইলে হবে না? যদি এমনটি হতো, তাহলে অন্ধ-বিদ্বান ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যেত না । কেননা, অন্ধ তো জীবনেও অ, আ, ই, ঈ এদের রূপ দেখেনি । তারা, এ, বি, সি, ডি ও চোখে দেখেনি, চোখ নেই তো দেখবে কেমন করে? কিন্তু তুমি দেখেছ, অন্ধব্যক্তিও এম. এ./বি.এ. পাশ করেছ, শাস্ত্রী হয়েছে । তারা ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত ভাষা শিখেছে । দ্বিতীয়তঃ লিখিত এবং কল্পিত চিহ্নকে বলা হয়'বর্ণ' । যা মুখে উচ্চারিত হয় তাকে বলা হয়'অক্ষর' । অক্ষর নিরাকার, অক্ষরের কোনো রূপ নেই। যা লেখা যায় তাকে বর্ণ বলে। সেই বর্ণের আকার আছে,–বর্ণ সাকার ।

কমলঃ আচ্ছা, যদি তাই হয়, সময় তো নিরাকার কেমন? কিন্তু সময়েরও মূর্তি সাকার ঘড়ি রূপে তৈরী হয়েছে । আর আমরা নিরাকার সময়কে ঘড়ির মধ্যে সাকার রূপে দেখছি ।

বিমলঃ ঘড়ি সময়ের মূর্তি নয় । ঘড়ি সূর্যের মূর্তি । সূর্যকে দেখে যেমন সময়ের জ্ঞান হয়, তেমনি ঘড়ি দেখে সময়ের জ্ঞান হয় । ঘড়ির যাবতীয় ক্রম সূর্যের উপর নির্ভর করে ।

কমলঃ নিরাকার ধ্যান যদি করতেই হয় তা করব কেমন করে? যদি চোখের সামনে কোনো মূর্তি থাকে তবেই তো তার ধ্যান সম্ভব হয় । নিরাকারের ধ্যান করতে চোখ বন্ধ করলাম, আর কোনো কিছুই দেখতে পেলাম না - এ অবস্থায় মন বসবে কেমন কেরে?

বিমলঃ শোনো, জগৎ দুই প্রকারের, আধ্যাত্মিক আর ভৌতিক। আধ্যাত্মিক জগৎ — অর্থাৎ আত্মা সম্বন্ধীয় বা আত্মা সম্পর্কীয় জগৎ। ভৌতিক জগৎ অর্থাৎ — পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ এই পঞ্চভূত সম্বন্ধীয় বা পঞ্চভূত সম্পর্কীয় জগৎ । মনে রাখতে হবে পরমাত্মা সম্পর্কীয় চিন্তন আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত । যখন তুমি ধ্যান করতে বসেছ, তখন তোমার মাথার মধ্যে মূর্তির আকৃতি ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে । এ অবস্থায়, আধাত্মিক অর্থাৎ পরমাত্মা সম্পর্কীয় চিন্তন হলো কী করে? সে চিন্তন তো ভৌতিক অর্থাৎ পঞ্চভূত সম্পর্কীয় চিন্তন । কেননা, মূর্তি পঞ্চভূতের দ্বারা নির্মিত। আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ তখনই সম্ভব যখন জগতের সমস্ত মূর্তিমান বস্তুর ভাবনা-চিন্তা ত্যাগ করে আত্মাতেই পরমাত্মার ব্যাপকতার অনুভব করতে পারবে । পরমাত্মায় এবং আত্মায় দেশকালের দূরত্ব বা ব্যবধান নেই আছে কেবল জ্ঞানের ব্যবধান । অজ্ঞানতার আবরণ দূর হলেই পরমাত্মার অনুভূতি হতে থাকবে।

বাকী রইল মন বসার কথা । মনকে বসালে সে বসে, না বসালে সে কেমন করে বসবে? জগতে অভ্যাসের দ্বারাই সমস্ত কর্ম সিদ্ধ হয়। এমন অনেক মেয়ে মানুষ আছে, যারা মাথায় পর পর দুটো তিনটে কলস রেখে কোমরে ছেলে নিয়ে, পরস্পর গল্পগুজব করতে করতে উঁচু-নীচু পথের উপর দিয়ে চলে, সাধ্য কী যে মাথার কলসী থেকে এক ফোঁটা জল মাটিতে পড়ে ! পথে ঘাটে যারা বাঁশবাজীর খেলা দেখায়, তারা মাথার উপর পর-পর কয়েকটা কলস, আর দুই কাঁধে দু-দুটো ছেলে নিয়ে লম্বা বাঁশের উপর সর-সর করে উঠে যায় । সার্কাসে মেয়েরা তারের উপর সাইকেল চালায় এসব তো অভ্যাসের পরিণাম ।

রোগা-পটকা মানুষ ভোর চারটের সময় উঠে শীতের দিনে গঙ্গা বা যমুনায় স্নান করতে চলেছে, আর ঠিক সেই সময় মোটা মোটা, তাগড়া-তাগড়া মানুষ লেপের ভিতর থেকে মুখ বার করতে ভয় পায় কেনো? যারা ভোরে স্নান করার অভ্যাস করেছে, তাদের পক্ষে শীত-গ্রীষ্ম সবই সমান । এইভাবে যে ঈশ্বরের চিন্তন করার অভ্যাস করেছে, সে যম, নিয়ম সাধনা দ্বারা ঘন্টার পর ঘন্টা নদী, পাহাড়ে একান্ত স্থানে বসে বসে চিন্তন করতে সক্ষম। আর যারা সমাধিস্থ হয় তারা একই আসনে কয়েকদিন ধরে ধ্যান করতেই থাকে । তারা কি কোনো মূর্তির ধ্যান করে বলতে পারো? একটুখানি গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝবে মূর্তিতে তো মনই বসে না কেননা, মন কখনও নাকের চিন্তন করবে, কখনও বা হাত পায়ের । মূর্তির সারা অঙ্গে মন ঘুরে বেড়াবে যখন মনের সামনে কোনো মূর্তি থাকবে না তখনই তার বৃত্তি সমূহ আত্মার অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকবে।

কমলঃ ময়রার দোকান হতে চার আনার সন্দেশ কিনে আনলাম। সন্দেশ খেয়ে সত্যি খুবই আস্বাদ পেলাম । সন্দেশ সাকার, আর আস্বাদ নিরাকার। যদি ময়রাকে বলা যায় – আমার চার আনার নিরাকার আস্বাদ দাও তো । সে কেমন করে দেবে এ থেকে বুঝলাম যে, সাকার মূর্তি হতেই নিরাকার পরমাত্মার আস্বাদ বা আনন্দ পাওয়া সম্ভব ।

বিমলঃ ভাইটি শোনো । যার যা গুণ, খেলে পরে তা জানা যাবেই । সন্দেশ খেলে সন্দেশের আস্বাদ পাওয়া যাবে, জিলিপী খেলে জিলিপীর আস্বাদ পাওয়া যাবে । সন্দেশ এবং আস্বাদে গুণ ও গুণীর সম্বন্ধ আছে, ব্যাপ্য ব্যাপকের নেই । সন্দেশ দ্রব্য, আস্বাদে গুণ ও গুণীর সম্বন্ধ আছে, ব্যাপ্য ব্যাপকের নেই। সন্দেশ দ্রব্য, আস্বাদ তার গুণ। কিন্তু মূর্তি এবং পরমাত্মা দু'জনেই যে দ্রব্য। সন্দেশ খেলে গুণ আস্বাদ, অনুভব করবে । কিন্তু মূর্তি দ্বারা পরমাত্মার আনন্দ কেমন করে অনুভব করলে বলো? কেননা, পরমাত্মা তো মূর্তির গুণ নয় । আর এক কথা, সন্দেশ খেলে সন্দেশের আস্বাদ পাওয়া যায়, কিন্তু যদি কেউ মাটির নকল সন্দেশ তৈরী করে খাওয়া আরম্ভ করে, তা হলে কি সন্দেশের আস্বাদ পাবে? কোনো মতেই নয় । ঠিক্ তেমনি, পরমাত্মার অনুভূতি হলেই পরমাত্মার আনন্দ লাভ করে, পরমাত্মার পরিবর্তে যদি কেউ মাটি বা পাথরের নকল পরমাত্মার মূর্তি তৈরী করে, তাহলে সে তাতে পরমাত্মার আনন্দ কেমন করে অনুভব করবে?

কমলঃ মূর্তি থাকায়, যেমন – নোটের এবং টাকা পয়সার ব্যবহার সুখদায়ক তেমনি মূর্তির পূজাও সুখদায়ক ।

বিমলঃ প্রথমতঃ – রাজা শরীরধারী, তাই তার মূর্তি ছাপ নোট এবং টাকা পয়সা তৈরী হতে পারে, কিন্তু পরমাত্মা যিনি নিরাকার তাঁর মূর্তি তৈরী হবে কেমন করে?

দ্বিতীয়তঃ – নোট এবং টাকা পয়সা রাজার আদেশ, রাজকীয় ট্যাকশালে তৈরী বলে সুখদায়ক । কিন্তু যদি কোনো মানুষ রাজকীয় বিধি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিজের ঘরে জাল মুদ্রা তৈরী করা আরম্ভ করে, তাহলে রাজা তাকে জেলখানা দর্শন করিয়ে ছাড়বে । সেইরূপ পারমাত্মাকে তৈরী করা এবং তার মূর্তি পূজা করা অনেক যোনিরূপ জেলখানা দর্শনের প্রয়াস ছাড়া কিছুই নয় জানবে ।

কমলঃ মহাভারতে পড়েছি—একলব্য দ্রোণাচার্যের মূর্তি গড়ে শস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করেছিল ।

বিমলঃ দ্রোণাচার্য সশরীর, মূর্তিমান ছিলেন, তাই একলব্য তাঁর মূর্তি নির্মাণ করেছিল । সে তো ঈশ্বরের স্থানে তাঁর পূজা করেনি । তাছাড়া—সেই মূর্তিটি একলব্যকে শাস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিল একথা যদি সত্য হয়, তাহলে একলব্যের শস্ত্র সঞ্চলন অভ্যাস করার প্রয়োজন কী ছিল? মনে রেখো একলব্য সমস্ত শাস্ত্রবিদ্যা অভ্যাস দ্বারাই শিক্ষা করেছিল । শিক্ষার কথা দ্রোণাচার্য জানতেনই না।

যখন তিনি জানতে পারলেন তখান তার পরিণাম একলব্যকে ভোগ করতে হয়েছিল তার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে দিয়ে । কোনো কর্ম বা শিক্ষাদানের যোগ্যতা মূর্তিতে আসবে কোথা হতে? যদি মূর্তিতে শিক্ষাদানের যোগ্যতা থাকে তাহলে সকলের উচিত, ব্যাসের মূর্তি গড়ে তার কাছে বেদ পড়া।

একজন বেয়ারা কোনো ইংরাজের কাছে চাকরী করতে করতে ইংরেজী বলতে শিখে ফেলে । ময়রার কাছে চাকরী করতে করতে মানুষ মিষ্টি করতে শিখে ফেলে । আগুনের কাছে বসলে উষ্ণতা বোধ হবে । যার সঙ্গতি করা যাবে তার গুণ সঙ্গতিকারীর উপর প্রভাব বিস্তার করবে জড় মূর্তির সঙ্গতিতে জড়তা এলো, পিটনী খেলো, মন্দির ভাঙলো, দেশে ভয়াবহ পরাধীনতা ও দারিদ্র্য দেখা দিলো । জড়ের সঙ্গতিতে আত্মবিশ্বাস এবং কর্মশক্তিও হয়ে গেল ।

সব কিছুই ঈশ্বর সৃষ্টি করলে ঈশ্বরকে কে সৃষ্টি করেছেন ?

নিরাকারবাদী: জগতে কোনো কার্যই কারণ ছাড়া সম্ভব নয়। অচেতন কোনো পদার্থ একা একাই সৃষ্টি হতে পারে না। সে হিসেবে এই জগতেরও একজন স্রষ্টা থাকা আবশ্যক।

নিরীশ্বরবাদী: যদি সব কিছুর একজন স্রষ্টা আছে বলে দাবী করা হয়, তাহলে সেই স্রষ্টারও একজন স্রষ্টা থাকা আবশ্যক। স্রষ্টার বেলায় গিয়ে আপনি যদি বলেন তার কোন স্রষ্টা নেই, তাহলে আপনি যে যুক্তিকে ভিত্তি করে তর্ক শুরু করছিলেন, নিজেই সেই যুক্তিরই বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন। যদি স্রষ্টার কোন স্রষ্টার প্রয়োজন না পড়ে, তাহলে একই যুক্তিতে বলা যায় এই মহাবিশ্বের কোনো স্রষ্টা নেই, এটা চিরন্তন সত্তা।

নিরাকারবাদী: অতি উত্তম প্রশ্ন। বেদ ও যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণযোগ্য। আমাদের বৈদিক ধারণা মতে, তিন প্রকার অনাদি সত্তা আছে। যার মাঝে প্রকৃতি হল উপাদান কারণ এবং পরমাত্মা হলেন নিমিত্ত কারণ।

পরমাত্মা কিন্তু একদম ০ থেকে সৃষ্টি করেন নি, বা কাউকে কোনো নির্দেশনাও দেন নি। সৃষ্টির প্রারম্ভের বর্ণনা দেখলেই সৃষ্টিকর্ম পরিষ্কার হবে আমাদের কাছে।

ঐতরেয়োপনিষদের আরম্ভে বলা হচ্ছে -

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ । নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ । স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি।।১।।

সরলার্থঃ নিশ্চিতভাবে এই পরমাত্মা সৃষ্টির পূর্বে একাই ছিলেন, তিনি ভিন্ন অন্য কেউ তখন ক্রিয়াশীল ছিল না। তিনি ইচ্ছা করলেন যে, আমি লোক-লোকান্তরসমূহকে রচনা করবো।।১।।

এই জগতের সৃষ্টির পূর্বে এক পরমাত্মাই ছিলেন, সেই সময় তিনি ছাড়া অন্য কোনো পদার্থ 'মিষৎ' বা ক্রিয়াশীল ছিল না। মিষৎ বলতে মূলত বোঝায় চোখের পলক ফেলা। এর সাথে নঞর্থক নি প্রত্যয় যোগ করে গঠিত হয় 'নিমিষ'। নিমিষেই এই শব্দটি আমরা ব্যবহার করে থাকি নিয়মিত। এর অর্থ চোখের পলক না ফেলতেই। অর্থাৎ সেই সময় পরমাত্মা ছাড়া অন্য কোনো পদার্থের বা সত্তার সক্রিয় অস্তিত্ব ছিল না।

"নাসদাসীন্নো সদাসীত্তাদানীং" ঋক০ ১০।১২৯।১ এবং "ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ" ঋক০ ১০।১২৯।২ ইত্যাদি মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, সৃষ্টি উৎপত্তির পূর্বে না তো জগতের অভাব ছিলো, আর না তো এই জগৎ প্রকটরূপে ছিলো। সেই সময় না মৃত্যু, না অমৃত এবং না রাত্রিদিনের চিহ্ন, সূর্য, চন্দ্র ছিলো। তখন একমাত্র জাগ্রত পরমাত্মাই ছিলেন, অর্থাৎ সৃষ্টির আদিকালে পরমাত্মা ছাড়া অন্য সকল পদার্থ নিশ্চেষ্ট ছিল।

কারণ প্রকৃতি জড় হওয়ার কারণে ক্রিয়াশীল নয় আর অল্পজ্ঞ ও সীমিত হওয়ার কারণে জীবও সৃষ্টি রচনাতে অসমর্থ। এজন্য সৃষ্টি রচনাতে ঈক্ষণকারী একমাত্র পরমাত্মতত্ত্বই সেই সময় বিরাজমান ছিলেন।

প্রলয়ে জগতের বিদ্যমানতা সম্পর্কে মহর্ষি মনু বলেছেন -

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ॥ (মনু০ ১। ৫)" অর্থাৎ এই সমগ্র জগৎ সৃষ্টির পূর্বে প্রলয়কালে অন্ধকারে আবৃত্ত- আচ্ছাদিত, রাত্রিরূপ অবিজ্ঞেয় ছিল। সেই সময় কারো জানার যোগ্য, তর্ক করার যোগ্য বা প্রসিদ্ধ কিছুই ছিল না।

বেদমন্ত্রেও স্পষ্টভাবে এই কথাই বলা হয়েছে -"তম আসীৎ তমসা গূঢমগ্রেপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্। তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং য়দাসীত্তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্" (ঋ০ ১০। ১২৯।৩) অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে প্রলয়কালে এই জগৎ অন্ধকার দ্বারা আবৃত ছিল। এই সবকিছু কারণরূপ প্রকৃতিতে লীন ছিল। অদ্বিতীয় পরমেশ্বর নিজের তপের প্রভাবে কার্যরূপে প্রকট করেছেন। অর্থাৎ প্রলয়েও জীব তথা জগতের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু তখন কেবলমাত্র এক পরমাত্মাই ক্রিয়াশীল ছিলেন; অন্য কেউ ছিল না, সেজন্য সৃষ্টির পূর্বে এক পরমাত্মার বর্ণনা করা হয়েছে।

এই মন্ত্রে উল্লিখিত 'তমসা' বা অন্ধকারই হলো অপ্রকাশিত, অব্যক্ত প্রকৃতি।

এই পুরো প্রক্রিয়াটাই হল রূপান্তর। আমাদের স্রষ্টা হিসেবে যাকে লাগবে, তিনি হলেন নিমিত্ত কারণ অর্থাৎ রূপান্তরকারী। এই পৃথিবীর যে কোনো বস্তুকেই কোনো লৌকিক সত্তা ০ থেকে সৃষ্টি করতে পারে না। স্বর্ণকার স্বর্ণের রূপান্তর করেই অলঙ্কার সৃজন করেন। ভাস্কর পাথর বা ধাতু থেকে ভাস্কর্য নির্মাণ করেন। চিত্রশিল্পী রং দিয়ে ক্যানভাসে চিত্রকর্ম ফুটিয়ে তোলেন। এসবই কোনো এক পদার্থের রূপান্তর।

কিন্তু চিত্রশিল্পী ব্যতীত ক্যানভাসে স্বয়ং চিত্রের নির্মিত হতে পারে না। বা ভাস্কর ব্যতীত ধাতু বা পাথর থেকে কোনো অনবদ্য ভাস্কর্য সৃষ্টি হবে না। অর্থাৎ, আমরা দেখছি, এক অচেতন বস্তুকে রূপান্তর করতে হলে কোনো চেতন সত্তার দরকার, এটিই প্রকৃতি থেকে জগতের রূপান্তরে স্রষ্টার গুরুত্ব।

এখন প্রশ্ন জাগে, পরমাত্মা প্রকৃতিকে রূপান্তর করেন। তাহলে পরমাত্মার নিজ সত্তার কি কোনো রূপান্তর হয়? নাকি পরমাত্মা তাঁর চিরন্তনস্বরূপে অবস্থান করেন? যদি রূপান্তর হত, তাহলে আমরা বলতে পারতাম পরমাত্মার এই রূপান্তরের পেছনেও কোনো পরম শক্তিমান স্রষ্টা আছেন, যিনি পরমাত্মাকেও সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু যেহেতু পরমাত্মার রূপান্তর হয় নি, এবং তিনি নিজ স্বরূপে অবস্থান করছেন, তাই পরমাত্মার কোনো স্রষ্টার আবশ্যকতা নেই।

বেনস্তৎপশ্যন্নিহিতং গুহাসদ্যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্ । তস্মিন্নিদং সং চ বিচৈতি
সর্বং স্য ওতঃ প্রোতশ্চ বিভূঃ প্রজাসু।।১৫।।
[যজু ৩২।৮]

অর্থঃ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি সেই ব্রহ্মকে নিজের বুদ্ধিরূপী গুহাতে স্থিত দেখেন, যে ব্রহ্ম সত্য হওয়ার কারণে নিত্য, ত্রিকালে একরস [অপরিবর্তনীয়] এবং সকল সংসারের আশ্রয়। এই জগৎ প্রলয়কালে যাঁর মধ্যে লীন হয় এবং উৎপত্তিকালে যাঁর থেকে প্রকট হয়ে স্থূলরূপকে প্রাপ্ত হয় এবং নির্মিত সকল জগতে যিনি ব্যাপ্ত, সেই ব্রহ্মকেই ব্রহ্মজ্ঞানী জানেন এবং অনুভব করে কৃতার্থ হন। এখানে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত শব্দ হলো 'সৎ'।

ভোগ্যো ভবদখো অন্নমদহ। য়ো দেবমুত্তারাবন্তমুপাসাতৈ সনাতনম্।।
[অথর্ববেদ ১০।৮। ২২]

অর্থ: যে মহানুভব সেই পরমপ্রিয় সর্বগুণে অলঙ্কৃত সনাতন পরমাত্মাকে প্রেম দ্বারা ভক্তি করে সে মহাভাগ্যবান। তাকে পরমাত্মা অন্নাদি ভোগ্য পদার্থ প্রদান করেন। সেই মহাপুরুষ অন্নাদি পদার্থ দ্বারা অতিথির ন্যায় সকলের সৎকার রূপ পরোপকারের মাধ্যমে সেসকল পদার্থ ভোগ করে এবং সুখ লাভ করে।।

এখানে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত শব্দ হলো 'সনাতনম্' অর্থাৎ শাশ্বত।

সনাতন শব্দের তাৎপর্য বুঝতে গেলে প্রথমে তিনটি বিষয়ে জানা দরকার, [১] নতুন, [২] পুরাতন ও [৩] সনাতন। যেমনঃ [১] নতুন= যা পূর্বে ছিল না কিন্তু বর্তমানে প্রাপ্ত, তাই নতুন। [২] পুরাতন= নতুনের বিপরীত শব্দ পুরাতন অর্থাৎ যা বর্তমানে নতুন কিন্তু কিছুদিন পর জীর্ণ হয়, তাই পুরাতন। [৩] সনাতন= যা নতুন আবার পুরনোও নয়, বরং শাশ্বত ও চিরন্তন, তাই সনাতন।

যেমনঃ মূল প্রকৃতি, আত্মা ও পরমাত্মা, আবার এভাবেও বুঝতে পারেন যদিও মূল প্রকৃতি থেকে দৃশ্যমান সমস্ত কিছুর সৃষ্টি। যেমনঃ চুম্বকের ধর্ম লোহাকে আকর্ষণ করা। তা পূর্বে যেমন ছিল, বর্তমানেও তাই আছে, আর প্রলয়ের পূর্ব পর্যন্ত তাই থাকবে, এমন নয় যে পূর্বে আকর্ষণ করত আর এখন করে না। এরূপ যাঁর কখনো বিনাশ বা পরিবর্তন হয় না, তিনিই সনাতন।

সারসংক্ষেপ: সৃষ্টিকর্ম তা হোক জাগতিক বা ঐশ্বরিক; তার মূল বৈশিষ্ট্য হলো কোনো চেতন সত্তা দ্বারা অচেতন সত্তার রূপান্তর। জগতের ক্ষেত্রে বা জাগতিক বস্তুর ক্ষেত্রে প্রকৃতি হল অচেতন, তাকে পরমাত্মা রূপান্তর করে জগৎ সৃজন করেছেন। কাজেই পরমাত্মা প্রকৃতির রূপান্তরকারী ও এই চরাচর জগতের স্রষ্টা। পরিবর্তন বা রূপান্তর ব্যতীত নতুন কিছুর সৃষ্টি বা সৃজন সম্ভব না। লৌকিক দৃষ্টিতেও আমরা যদি কোনো বাহ্যিক হস্তক্ষেপ না করি, তাহলে বালু কণা, মাটি বা স্বর্ণ ইত্যাদি এখন যেমন আছে সেভাবে অপরিবর্তিতই থাকবে নির্দিষ্ট আয়ুস্কাল অব্দি। এক্ষেত্রে কোনো স্রষ্টার সাথে সম্বন্ধ নেই। তখনই সম্বন্ধ হবে যখন কোনো চেতন সত্তা এসে বালু থেকে কাচ, মাটি থেকে বাসন, সোনা থেকে অলঙ্কার নির্মাণ করবে।

ঈশ্বরের ভেতরে এই পরিবর্তনই অনুপস্থিত। কাজেই ঈশ্বরীয় সম্বন্ধে কোনো দ্বিতীয় স্রষ্টার প্রসঙ্গ আসবে না।

Note: প্রকৃতি: প্রকৃতি হলো এই জগতের মূল অব্যক্ত, অপ্রকাশিত রূপ। প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টির উপাদান কারণ। তা অচেতন কিন্তু অনাদি। প্রকৃতিকে আমরা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের শক্তির ধারণা অনুযায়ী ব্যাখ্যা করতে পারি।

জগৎ: জগৎ এসেছে গতি থেকে। গতিশীল পদার্থমাত্রই জগৎ। প্রকৃতি থেকে ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করেন নিজ ঈক্ষণ বা স্বাভাবিকী জ্ঞানকর্ম দ্বারা।

নিরাকারের স্বরূপ কী ?

নিরাকারের স্বরূপ কী ? নিরাকার বলতে আপনি কী বোঝেন ? বায়ু আদিকে আমরা দেখতে পাই না, এরা কি নিরাকার ?

নিরাকার = নিঃ + আকার, অর্থাৎ আকারের অভাব। যাঁর কোনো আকার থাকা সম্ভব নয়, তিনিই নিরাকার। আকার কোথা থেকে আসে? আমাদের চারপাশে যত বস্তু আছে, যাদের আমরা দেখতে পাই বা পাই না, সবই আকারযুক্ত। যেমন: গোরু, ছাগল, আম, জাম কিংবা চেয়ার টেবিল সবারই আকার আছে, সবাই অণু, পরমাণু, কণিকা দ্বারাই নির্মিত। আমাদের চোখের স্থূলতার বা দূরত্বের দরুণ আমরা দেখতে পাই না, অথচ তারাও অণু পরমাণু আদি দ্বারা নির্মিত। যেমন: আমরা ঢাকায় থেকে চট্টগ্রামে থাকা কোন ব্যক্তিকে দেখতে পারব না। আবার মহাবিশ্বের দূরবর্তী নীহারিকা, নক্ষত্রপুঞ্জ আদিও আমরা দেখতে পাই না। আবার নানা অণুজীব বা বায়ুকণা আছে, আমরা সেগুলোকে দেখতে পাই না। তবে এইসব বস্তুই পদার্থ, এদের আকার রয়েছে। এদের মূল তত্ত্ব বা উপাদান হলো পরমাণু বা নানা কণিকা। বৈশেষিক দর্শনে এই জগতের সব বস্তুর মূল উপাদানের নাম 'পরমাণু' [বৈশেষিক মতে পরমাণু অবিভাজ্য। এখন আমরা পরিভাষাগতভাবে পরমাণু বলতে atom বুঝিয়ে থাকলেও বৈশেষিক অনুযায়ী সর্বোচ্চ অবিভাজ্য কণিকাই পরমাণু] ।

এই পরমাণু বা কোনো পারমাণবিক কণিকাও অনাদি উপাদান নয়, কারণ পরমাণুর সৃষ্টি, ধ্বংস আছে; বিকার আছে, পরিবর্তন আছে। পরমাণুর মূল অর্থাৎ ভরযুক্ত সকল কণিকার মূলভূত উপাদান হলো শক্তি। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের মতে, শক্তি থেকেই ভরের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ এই সমগ্র জগৎ মূলত অচেতন শক্তির বিকার। সাংখ্য দর্শনে এই শক্তিকেই অভিহিত করা হয়েছে "কারণ প্রকৃতি" নামে। এই জগতের সব উপাদান ও আমাদের আত্মা (চেতনা) ব্যতীত শরীর জড় প্রকৃতির বিকার নানা তত্ত্বের দ্বারা নির্মিত, যাদের আকার আকৃতি রয়েছে।

সত্ত্বরজস্তমসাংসাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। প্রকৃতের্মহানমহতোহহঙ্কারঃ।
অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং-তন্মাত্রেভ্যঃস্থূলভূতানিপুরুষঃ ইতি
পঞ্চবিংশতির্গণঃ।।

[সাংখ্য ১।৬১]

যেহেতু সব আকার আকৃতির উৎস প্রকৃতি, এসব বস্তু দ্বারা নির্মিত না, অর্থাৎ জড় প্রকৃতির বিকার নয়, বরং প্রকৃতির মতোই অনাদি বাকি দুই তত্ত্ব ঈশ্বর ও জীবাত্মা নিরাকার।

ঈশ্বরের নিরাকারত্বের শাস্ত্রীয় প্রমাণ কোথায় ?

বেদ, বৈদিক ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষদ্ এবং ষড়দর্শন মতে ঈশ্বর নিরাকার।

প্রত্যক্ষ নিরাকারবোধক কিছু শ্রুতিবাক্যসমূহ -

যজুর্বেদ ৪০।৮ (ঈশ উপনিষদ্, ৮ম শ্রুতি) (অকায়ম্ বা শরীর রহিত)
কেন উপনিষদ ১।৩ (ঈশ্বরকে চোখে দেখা যায় না)
কেন উপনিষদ ১।৭ (লোকে যেসব দৃশ্যমান বস্তুর উপাসনা করে, তারা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নয়)
কঠ উপনিষদ ১।২।২২(অশরীরী বা শরীরবিহীন)
কঠ উপনিষদ ১।৩।১৫(অরূপ বা রূপহীন)
কঠ উপনিষদ ২।৩।৮(অলিঙ্গ বা লিঙ্গ বা চিহ্নবিহীন)
কঠ উপনিষদ ২।৩।৯(চক্ষু দিয়ে দেখা যায় না)
কঠ উপনিষদ ২।৩।১২(ব্রহ্ম-বাক্য, মন, চক্ষুর অগোচর)
প্রশ্ন উপনিষদ ৪।১০(অশরীরী)
মুণ্ডক উপনিষদ ১।১।৬(অপাণিপাদম্ অচক্ষুশোত্রম্ অর্থাৎ ব্রহ্মের হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ নেই।)
মুণ্ডক উপনিষদ ২।১।২(অমূর্ত)
মুণ্ডক উপনিষদ ৩।১।৭(অচিন্ত্যরূপ বা ব্রহ্মের রূপ চিন্তা করা সম্ভব নয়)
মুণ্ডক উপনিষদ ৩।১।৮(চক্ষু দিয়ে দেখা যায় না।)
তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২।৭।২(ব্রহ্ম দর্শনাতীত এবং অশরীরী)
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ২।১৫ (জন্মরহিত)
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৩।১০ (অরূপ বা রূপহীন)
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৩।১৯ (অপাণিপাদম্ অর্থাৎ ব্রহ্মের হাত পা নেই)
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪।১ (বর্ণ রহিত)
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪।১৯ (মূর্তি বা প্রতিমা নেই)

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪।২০ (চক্ষু আদি দ্বারা দেখা যায় না এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন)
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪।২১ (জন্মরহিত)
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৫।১৪ (অশরীরী)
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৬।৮ (ব্রহ্মের শরীর এবং ইন্দ্রিয় নেই)
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৬।৯ (লিঙ্গ বা চিহ্ন নেই এবং তাঁর কোন জনক বা পিতা নেই)

ব্রহ্মের নিরাকারত্ব নিয়ে সন্দেহ থাকা অসম্ভব। এর আরেকটি কারণ ব্রহ্ম তিন কালে একরস বা অপরিবর্তিত। আমরা জানি, প্রকৃতির নির্মিত সকল পদার্থেরই বিকার বা পরিবর্তন রয়েছে। বিকার মোট ছয় প্রকার, উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, রুগ্নতা, ক্ষয় এবং বিনাশ। ব্রহ্মের শরীর থাকলে ব্রহ্মের পক্ষে তিনকালে একরস হওয়া সম্ভব নয়।

সারসংক্ষেপ -

নিরাকার হল আকারের অভাব। সব আকারের উৎস প্রকৃতি থেকেই নির্মিত এই জগতের নানা পদার্থ। আমাদের দেহস্থিত ইন্দ্রিয়, মন আদিও প্রকৃতির বিকার। দেহস্থিত ইন্দ্রিয় আর পদার্থের কারণভূত মূল তত্ত্ব এক থাকায়, আমরা পদার্থের নানা ধর্মকে আমরা দেখতে পাই, স্বাদ গ্রহণ করি, শুনতে পাই, স্পর্শ করে অনুধাবন করতে পারি, আঘ্রাণ নিতে পারি। প্রকৃতি ব্যতীত অন্য দুই সৎ ও অনাদি তত্ত্ব ব্রহ্ম ও জীবাত্মার কোনো আকার বা শরীর নেই।

হস্তমৈথুন নিয়ে সনাতন ধর্মের শাস্ত্রীয় বিধান কি ? বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা

সনাতন ধর্মে ব্রহ্মচর্য নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । সাধারণতঃ আমাদের সমাজে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় না । যার ফলে আমাদের জীবযাপনের সমস্ত বিধিবিধান থাকা সত্ত্বেও আমাদের নবপ্রজন্ম বিশেষ কিছু মতবাদীদের নিকট ' অমুকই পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ' জাতীয় হাস্যকর মন্তব্য শোনার পরেও জ্ঞানের অভাবে হীনমন্যতায় ভোগে । এমতাবস্থায় আমাদের বিধিবিধানের যৌক্তিক ব্যাখ্যার প্রচার অত্যাবশ্যক । আজকে আমরা হস্তমৈথুন নিয়ে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত ও ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করবো ।

ব্রহ্মচারীর প্রতি ১৮ উপদেশে আচার্য ব্রহ্মচারীকে উপদেশ দিচ্ছেন -

স্বয়মিন্দ্রিয়মোচনমিতি

[গোভিল গৃহ্যসূত্র ৩।১।২৬]

অনুবাদঃ হস্তমৈথুন করবে না ।

অনেকে বলতে পারেন স্বাভাবিকভাবে যদি কম করে করা হয় , উপকারিতা আছে, অতিরিক্ত না করলেই হয় , এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে ইত্যাদি -

তবে -

১. ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে নিষিদ্ধ ।

২. যেটাতে আসক্তি হতে পারে সেটাকে উৎসাহিত করার যুক্তি নেই এটাকে ন্যাচারাল ও রিল্যাক্সিং বলে । সেটা সামান্য মদের বেলাতেও প্রযোজ্য । পাশাপাশি এখানে পরবর্তী যে আসক্তিগত ইফেক্ট দেখানো হয়েছে কোনটাই বানানো না ।

মোটা দাগে এখানে একটা লেখা আছে -

It's important to remember that it's totally okay not to masturbate.

https://www.healthline.com/health/masturbation-side-effects?fbclid=IwAR0V8BzP1t5PsNodpJlqSV-INCuCDbwO1NLEYsJvlavNnxIxFPDcXEnep1s#side-effects

অর্থাৎ , হস্তমৈথুনে সাময়িকভাবে হরমোন রিলিজ , শান্তি ও উপকারিতা দেখা গেলেও আসক্তির আশঙ্কায় [মানবমাত্রে স্বাভাবিক] ধর্মশাস্ত্রে নিষেধ করা হয়েছে । ধর্মীয় দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ আর এভাবে খুঁজলে সামান্য পরিমাণ মদ্যপানেও গুণ পাওয়া বিচিত্র নয় , প্রটেকশনযুক্ত অবৈধ সম্পর্কেও বৈজ্ঞানিক বাধা দেখা যাবে না । বরং তখন সেখানে দেখা যাবে শারীরিক সম্পর্কের উপকারিতা । কিন্তু এই যে অবৈধতার নেশায় যে বিকৃতি ও পরবর্তীতে এক্সট্রিম পর্যায়ে উঠলে সেটার দায় কার ? মদ অল্প খাওয়া ভালো সেটা দেখিয়ে যে অনুমোদন দেওয়া হলো সেটার নিয়ন্ত্রণ কে করবে ? পরে অনিয়ন্ত্রিত হলে দায় কার ? এগিয়ে দেওয়ার পর আর থামানো যাবে সেই বিষয়টা আড়াল কেন ?

গুগল করে সবকিছু জানা সম্ভব। সার্চ করে আপনি অনেক তথ্য পেতে পারেন, তবে এর সবকিছু যে সঠিক হবে এমন কোন কথা নেই। যেমন আপনি কলা খাওয়ার উপকারীতা নিয়ে জানতে চাইছেন, আপনি এমন অনেক লিংক পাবেন যেগুলো আপনাকে দেখাবে কলা খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে। আবার কলা খাওয়ার অপকারিতা সম্পর্কে জানতে চাইলে আপনি সেটিও পাবেন। এরমানে আপনি গুগলে কিছু নিয়ে সার্চ করলে আপনি সেটিই পাবেন, তবে সেটি যে সঠিক হবে এমন কোন কথা নেই। এটি একধরনের অবজারভার বায়াস। মানে আপনি যা খুঁজতে চাইছেন সেটি খুঁজে নেয়া। আপনি যখন গুগল থেকে কিছু তথ্য খুঁজতে যাচ্ছেন আপনি নিজেই Observer Bias (পর্যবেক্ষকের পক্ষপাতিত্ব) নিয়ে আসছেন। এখন তাহলে আপনি অথেনটিক তথ্য কীভাবে পাবেন- এখানে হচ্ছে পড়াশুনার প্রয়োজনীয়তা। সঠিক তথ্য জানতে হলে আপনাকে আরো পড়তে হবে, আরো জানতে হবে, যে বইয়ের রেফারেন্স পাচ্ছেন সেই বইগুলো পড়তে হবে। এবং তখন আপনার উপলব্ধি হবে- না, এই লিখাটি ভুল হতে পারে! তখন আপনাকে অন্য বই দেখতে হবে। এভাবে আপনি সঠিক একটি তথ্যে পৌঁছোতে পারেন।

হয়তো আপনি গুগল করে অনেক পরিসংখ্যান পেলেন কোনো একটি বিষয় নিয়ে। তাহলে বিভিন্ন পরিসংখ্যান কীভাবে আসে ?

পরিসংখ্যান আসে বিভিন্ন রিসার্চের ভিত্তিতে। রিসার্চগুলো হয় কিছু জনসংখ্যা বাছাইয়ের মাধ্যমে, যাদেরকে বলা হয় স্টাডি পপুলেশন । সেই বাছাই করা জনসংখ্যায় গবেষণা চালানো হয়। চালিয়ে একটা ফলাফলে পৌঁছানো হয়। এখন পপুলেশন বাছায়ের উপর নির্ভর করে এর ফলাফল কেমন আসবে। যেমন- বিবাহিত দম্পতির যৌনজিবন নিয়ে যদি একটি গবেষণা চালানো হয় এবং এর জন্য আমরা বেছে নিতে পারি ১৩ হাজার দম্পতিকে তাহলে এর ফলাফল কী আসবে? এটা নির্ভর করে আমরা ১৩ হাজার দম্পতি যে নিচ্ছি, তাঁদের ওপর। সেটি কি বাংলাদেশের ১৩ হাজার দম্পতি (যাঁদের সেক্স লাইফ বেশ ভাল)? নাকি এটি জাপানের ১৩ হাজারের দম্পতি যারা সেক্স করার সময় ই পায় না? নাকি সেটি কেনটাকির ১৩ হাজার দম্পতি, এই ১৩ হাজার দম্পতির মধ্য 'জিহোভা'স উইটনেস' কয়জন, যারা মাস্টারবেশন করা পুরোপুরি নিষিদ্ধ মনে করে? এ সবকিছুর উপর নির্ভর করবে এই ফলাফল কেমন আসবে। রিসার্চের রেজাল্ট আসলে পুরোপুরি নিখুঁত হবেনা, কারণ যখনই আমরা একটা নির্দিষ্ট একটা পপুলেশন বাছাই করব, তখনই সেখানে সিলেকশন বায়াস চলে আসবে (একে আমরা এভাবে বলতে পারি যে – এই রিসার্চে খাদ আছে, যেই খাদ কে বলা হয় বায়াস) । আমি কাদেরকে নিয়ে গবেষণা করছি ,সেটির উপর নির্ভর করে আমার ফলাফল কী আসবে।

আমি যদি ১৩ হাজার ছেলের উপর গবেষণা করি, তাঁদের সেক্স লাইফ কেমন, কিন্তু সে ছেলেমেয়ে হচ্ছে বাংলাদেশের ১২/১৩ বছরের ছেলেমেয়ে শহরের ছেলেমেয়ে যাঁদের জীবন কড়া শাসনে আবদ্ধ, তাহলে আমরা দেখব তাঁদের সেক্স শূন্য, মাস্টারবেশন করার সুযোগ ও তেমন পায় না, কিন্তু সেটি যদি গ্রামের ১২/১৩ বছরের ছেলেমেয়ে হয়, দেখবো তাদের অলরেডি যৌন অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। এগুলো হচ্ছে সিলেকশন বায়াস।

পক্ষপাতিত্ব ছাড়া কোন গবেষণা হওয়া সম্ভব নয়। আমরা চাইলে পক্ষপাতিত্ব কমাতে পারি। কিন্তু একেবারে কমানো বাস্তবে সম্ভব নয়। কাজেই রিসার্চের যে রেজাল্টগুলো আসে, সেগুলো আমরা থিউরিটিক্যাল রেজাল্ট ধরে নেই। এগুলো আসলে পুরোপুরি প্র্যাক্টিকাল না। এবং স্ট্যাসিস্টীকস ও পুরোপুরি গড় বিষয়টিকে নির্দেশ করে।

এসব রিসার্চ কারা করে? স্পষ্ট করে বলতে গেলে, এসব ক্লিনিকাল রিসার্চ কারা করে? কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সি এসব গবেষণা পরিচালনা করেন। রিসার্চের আরেকটা বড় ত্রুটি হচ্ছে, এসব প্রতিষ্ঠান সচরাচর গবেষণায় তাই প্রচার করে ছাড়ে যা তারা প্রমাণ করতে চায়। এ পরিস্থিতিকে বলা হয় পর্যবেক্ষকের পক্ষপাতিত্ব বা অবজার্ভার বায়াস।

অবজারভার বায়াস হচ্ছে যে গবেষণা টি পরিচালনা করছে সে তার মনমানসিকতা, ইচ্ছা গবেষণার উপর প্রভাব ফেলা (পিগ্মালিয়ন ইফেক্ট) । যেমন ধরি কোন কন্টাক্ট লেন্স কোম্পানি গবেষণা করে দেখতে চাইল তাঁদের লেন্স ভাল তখন তারা লেন্সের ভাল দিক গুলো নেবে, খারাপ দিক গুলো এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। অবজারভার বায়াস একেবারে সাধারণ জিনিস। এটি এড়াবার জন্য আমরা যেটা করতে পারি সেটি হচ্ছে Double Blind Study Method। এই পদ্ধতি হচ্ছে যার উপর গবেষণা হচ্ছে তিনিও জানেন না তার উপর কীভাবে গবেষণা (বা পর্যবেক্ষণ) চলছে, যিনি গবেষণা করছেন তিনিও জানেন না ঠিক কাদের নিয়ে গবেষণা করছেন, শুধুমাত্র থার্ড পার্টি জানেন, কী গবেষণা হচ্ছে, কার উপর গবেষণা হচ্ছে।

কিন্তু এভাবে করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা গবেষণা চালাতে পারি না। এটি শুধুমাত্র সম্ভব ল্যাবে, বা একটা রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে অল্প কিছু মানুষ নিয়ে গবেষণা করলে । অন্যথায় বায়াস চলে আসছেই! এর মানে হচ্ছে রিসার্চ স্ট্যাটিস্টিক্স একটা গড়পড়তা ধারণা দেবে , কিন্তু নিখুঁত ধারণা দিতে পারে না

[কিছু সূত্র কারটেসি - বিসিবি]

হস্তমৈথুন তৈরি করবে নানা ধরনের যৌন জটিলতা

আপনার যৌনজীবনকে বিষিয়ে তোলার জন্য এই এক হস্তমৈথুনই যথেষ্ট। আর যদি তার সাথে যোগ হয় পর্নোগ্রাফি, তাহলে তো সোনায় সোহাগী। পাশাপাশি হাত ধরে চল এই দুভাই আপনার জীবনকে লন্ডভন্ড করে দেবে, বুকের জমিনে সুখস্বপ্নের যে খেত আপনি বহু যত্নে গড়ে তুলেছিলেন তা নিমিষেই পুড়িয়ে দেবে চৈত্রের খরতাপের মতোই।

অকাল বীর্যপাত বা Premature Ejaculation এর অন্যতম কারণ হস্তমৈথুন। হস্তমৈথুন করার সময় আপনি চেষ্টা করতে থাকেন কত তাড়াতাড়ি চূড়ান্ত মুহূর্তে পৌঁছানো যায়, পাওয়া যায় শীর্ষসুখ। দেরি হলে ভালো লাগে না, অসহ্য বিরক্তি এসে ভর করে। এভাবে কিছুদিন হস্তমৈথুন করার পর আপনার মস্তিষ্ক বুঝে ফেলবে খুব তাড়াতাড়ি অপিনি চূড়ান্ত মুহূর্তে পৌঁছাতে চাচ্ছেন। সে তখন এভাবেই নিজেকে প্রোগ্রাম করে নেবে। অল্প সময়েই আপনি শীর্ষসুখ পেয়ে যাবেন। স্ত্রীর সঙ্গে স্বাভাবিক অন্তরঙ্গতার সময়েও আপনার প্রোগ্রামড ব্রেইন অল্প সময়েই আপনাকে চূড়ান্ত মুহূর্তে পৌঁছে দেবে। আপনার স্ত্রী থাকবেন অতৃপ্ত।

হস্তমৈথুন আপনাকে যৌনমিলনের জন্য অযোগ্য, অক্ষম বানিয়ে দেবে। মেডিক্যাল সায়েন্সের ভাষায় একে বলা হয় লিঙ্গোত্থানজনিত সমস্যা বা Erectile Dysfunction (ED)! European Federation of Sexology 49 প্রেসিডেন্টসহ আরও অনেক বিশেষজ্ঞের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে পর্ন-আসক্তি এবং হস্তমৈথুনের যুগলবন্দী লিঙ্গৌত্থানজনিত সমস্যার অন্যতম কারণ। লিঙ্গোত্থানজনিত সমস্যার ফলে যৌনমিলনের সময় আপনার লিঙ্গ (Penis) উত্থিত হবে না, যতটুকু কাঠিন্য দরকার ততটুকু থাকবে না, অথবা যত সময় ধরে শক্ত থাকা প্রয়োজন তত সময় ধরে থাকবে না। ফলে আপনি হারাবেন স্বাভাবিক যৌনমিলনের সক্ষমতা।

হস্তমৈথুনের কারণে আপনি স্বাভাবিক যৌনক্রিয়ার প্রতি আগ্রহ হারাতে থাকবেন। ২০১৫ সালের একটি গবেষণাপত্র অনুযায়ী হস্তমৈথুন এবং পর্ন দেখার ফলে বিবাহিত পুরুষেরা, তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। স্ত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা তাদের কাছে একঘেয়ে লাগে। হস্তমৈথুনের কারণে Chronic Penile Lymphedema নামের ঘিনঘিনে একটি রোগে আক্রান্ত হবারও আশঙ্কা থাকে। যার ফলে লিঙ্গ কুৎসিত আকার ধারণ করে।

দাম্পত্যজীবনে অশান্তি

স্বাভাবিক যৌনমিলন যেখানে সুখী দাম্পত্যজীবন উপহার দেয়, ধুলো কাদামাটির এ পৃথিবীর বুকে সুখের এক পশলা বৃষ্টি নামায় সেখানে, হস্তমৈথুন, অ্যানাল সেক্স, ওরাল সেক্স দাম্পত্যজীবনে মিশিয়ে দেয় অশান্তির ফ্লেভার। হতাশী, অতৃপ্তি, অশান্তি, ঝগড়াঝাঁটির অন্যতম প্রভাবক এই বিকৃত যৌনাচারগুলো। কর্নেল ইউনিভার্সিটির ইউরোলজি এবং রিপ্রোডাক্টিভ মেডিসিনের ক্লিনিকাল প্রফেসর ড. হ্যারি ফিশ হস্তমৈথুনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বলেন, "ঘন ঘন হস্তমৈথুনের কারণে একজন মানুষ লিঙ্গোত্থানজনিত (erection) সমস্যায় ভুগতে শুরু করবে। হস্তমৈথুনের সাথে সাথে পর্নোগ্রাফি দেখতে থাকলে একসময় যৌনমিলনের ক্ষমতাই সে হারিয়ে ফেলবে।

হস্তমৈথুনের ফলে টেস্টোস্টেরোনের (Testosterone) পরিমাণ কমে যেতে পারে

প্রথমে আমাদের জানতে হবে যে টেস্টোস্টেরোন আসলে কী? এর প্রয়োজনীয়তাই বা কী? টেস্টোস্টেরোন পুরুষের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় একটি হরমোন। সহজ ভাষায় এটা হলো ওই হরমোন যা পুরুষকে পুরুষ বানায়।

মানবদেহে টেস্টোস্টেরনের ভূমিকাগুলো কী কী?

দেখা যাক: ১) এনার্জি ২) স্মৃতিশক্তি ৩) মনোযোগ ৪) আত্মমর্যাদাবোধ ৫) আত্মনিয়ন্ত্রণ ৬) সুগঠিত পেশি ৭) দৈহিক শক্তি ৮) কাজ করার সক্ষমতা ৯) গলার স্বরের গম্ভীরতা ১০) মানসিক প্রশান্তি ১১) পুরুষালি আচরণ ১২) প্রভাবশালী আচরণ ১৩) লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন ১৪) হাড়ের স্বাভাবিক গঠন ১৫) যৌনক্রিয়ার জন্য পর্যাপ্ত আমিষ সরবরাহ করা ১৬) দীর্ঘস্থায়ী যৌনক্রিয়াতে সক্ষম করা ১৭) স্বাস্থ্যকর মেটাবলিম উৎপাদন ১৮) লিভারের কার্যাবলি ১৯) সুগঠিত প্রস্টেট গ্রন্থি গঠন।

শরীরে যদি টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ কমে যায়, তাহলে কী হতে পারে?

১) ক্লান্তিভাব। ২) বিষণ্ণতা। ৩) দুর্বল স্মৃতিশক্তি ৪) মনোযোগ কমে যাওয়া ৫) অতিরিক্ত অস্থিরতা ৬) কম শারীরিক সক্ষমতা ৭) আত্মনিয়ন্ত্রণ কমে যাওয়া ৮) পুরুষালি আচরণ কমে যাওয়া। ৯) আচরণে মিনমিনে ভাব আসা ১০) স্বাভাবিক যৌনক্রিয়াতে আগ্রহ না থাকা ১১) দ্রুত বীর্যপাত ১২) দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া। ১৩) মেরুদণ্ডে ব্যথা ১৪) পেশি সুগঠিত না হওয়া ১৫) শরীরে চর্বি জমে যাওয়া ১৬) হাড় ক্ষয়ে যাওয়া। ১৭) চুল পড়ে যাওয়া।

হস্তমৈথুন করে করে আপনি শরীরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই টেস্টোস্টোরোন শেষ করে ফেলছেন। আফসোস! বড়ই আফসোস! এখন তর্কের মেজাজে থাকলে আপনি বলতে পারেন যে, "হস্তমৈথুন করলে যদি টেস্টোস্টেরোন কমে যায়, তাহলে তো স্বাভাবিক যৌনক্রিয়ার কারণেও তা কমে যাবে? তাহলে কী মানুষ স্বাভাবিক যৌনক্রিয়াও বাদ দিয়ে থাকবে?" আসলে হস্তমৈথুন আর স্বাভাবিক যৌনক্রিয়ার মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এটা শুধু মুখের কথা না, বৈজ্ঞানিকভাবেই প্রমাণিত।
হস্তমৈথুন আর স্বাভাবিক যৌনক্রিয়ার সময় আমাদের মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখায়। স্বাভাবিক যৌনক্রিয়ার কারণে শরীরে টেস্টোস্টেরোন তো কমেই না, বরং উল্টোটা হয়। শরীরে টেস্টোস্টেরোনের পরিমাণ বাড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে স্বাভাবিক যৌনক্রিয়া। ১৯৯২ সালে ৪ জোড়া দম্পতির ওপর একটি পরীক্ষা করা হয়েছিল।

তাদের দাম্পত্যকালীন স্বাভাবিক যৌনক্রিয়ার দিন এবং তাদের মাঝে যেদিন কোনো যৌনক্রিয়া হয়নি, এ দু-ধরনের দিনে তাদের টেস্টোস্টেরোনের পরিমাণ কী অবস্থায় থাকে সেটা দেখার জন্য। দেখা গেল, যে রাতে তারা স্বাভাবিক যৌনক্রিয়া করেছেন, তার পরদিন তাদের শরীরে টেস্টোস্টেরোনের পরিমাণ বেড়েছে। অন্যদিকে যে রাতে তাদের মধ্যে কোনো যৌনক্রিয়া হয়নি, তার পরের দিন তাদের শরীরে টেস্টোস্টেরোনের পরিমাণ বাড়েনি।

২০০৩ সালে, হস্তমৈথুন বন্ধ রাখলে শরীরে টেস্টোস্টেরনের পরিমাণের ওপর কী প্রভাব পড়ে তা নিয়ে একটি পরীক্ষা চালানো হয়। ফলাফলে দেখা যায়, হস্তমৈথুন থেকে বিরত থাকার প্রথম ১ থেকে ৫ দিন পর্যন্ত টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ স্বাভাবিকভাবে বাড়তে থাকে। ৬ষ্ঠ আর ৭ম দিনে এই বৃদ্ধির হার হয়ে যায় ১৪৭%! এ ৭ দিন পরে, টেস্টোস্টেরোনের পরিমাণ স্বাভাবিক পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

প্রস্টেট (মূত্রথলির) ক্যান্সারের ঝুঁকি

প্রস্টেট ক্যান্সার বা প্রস্টেটগ্রন্থিতে নানা রকম সমস্যা হয়েছে এমন রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ জন্য দায়ী মূলত হস্তমৈথুন। অথচ আমরা আবার অনেকেই উল্টো ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে আছি যে, হস্তমৈথুনই প্রস্টেট ক্যান্সার রোধ করে। আচ্ছা এ ব্যাপারে তর্কবিতর্ক বাদ দিয়ে দেখা যাক, গবেষণার ফলাফল কী। পলিক্সেনি দিমিত্রোপুলু (পিএইচডি), রোসালিন্ড ঈলস (পিএইচডি, এফআরসিপি) এবং কেনেথ আর মিওয়ার (পিএইচডি) ৮৪০ জন মানুষের ওপর গবেষণা করেন। তারা এ ৮৪০ জনের যাবতীয় যৌনতথ্য সংগ্রহ করেন। এদের মধ্যে অর্ধেক ৬০ বছর বয়স হবার আগেই প্রস্টেট ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছে, বাকি অর্ধেক হয়নি।তাদের এই গবেষণার ফলাফল

ছিল বিস্ময়কর। "স্বাভাবিক যৌনক্রিয়া প্রস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকিকে প্রভাবিত করে না, কিন্তু হস্তমৈথুন করে। ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সের মাঝে হস্তমৈথুন প্রস্টেট ক্যান্সারের ঝুঁকিকে বাড়িয়ে দেয়। যারা মাসে একবারেরও কম হস্তমৈথুন করে তাদের তুলনায়, এ বয়সে যারা সপ্তাহে ২-৭ বার হস্তমৈথুন করে তাদের ৬০ বছর বয়সে প্রস্টেট ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি ৭৯% বেশি। আবার এই ২০-৩০ বয়সের মাঝে যারা হস্তমৈথুন থেকে দূরে থাকে, তাদের প্রস্টেট ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি ৭০% কম।" হস্তমৈথুন নারীদের স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিও বাড়িয়ে দেয়।

হস্তমৈথুন আপনার পেশিগুলোকে দুর্বল করে ফেলবে

টেস্টোস্টেরোন হরমোন সুগঠিত মাংসপেশির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর সেই হরমোন যদি আপনি হস্তমৈথুন করে ক্রমশ শেষ করে ফেলেন, তাহলে আপনার শরীর কীভাবে সুগঠিত থাকবে? একজন সুস্তগ মানুষের শরীর হবে সুগঠিত, স্টিলের মতো পেটানো, কঠিন ।

হস্তমৈথুন আপনাকে করে তুলবে চরম অমনোযোগী

২০০১ সালের একটি গবেষণার দেখা গেছে, হস্তমৈথুন করার ৩০ মিনিটের মধ্যে হস্তমৈথুনকারীর শরীরে Noradrenaline এর পরিমাণ অনেক কমে যায়। শরীরে Noradrenaline কমে যাবার ফলাফল কী? Noradrenaline°° হলো এমন একটি হরমোন, যা কোনো কিছুর প্রতি অখণ্ড মনোযোগ ধরে রাখতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আর সেই গুরুত্বপূর্ণ হরমোন আপনি হস্তমৈথুন করে কমিয়ে ফেলছেন! তাহলে মনোযোগ থাকবে কীভাবে! চিন্তা করে দেখুন, হস্তমৈথুন করার দিনটাতে আপনি ক্লাসে, পড়ার টেবিলে বা অন্যকোনো কাজে কি মনোযোগ দিতে পারেন, না সব সময় মাথার মধ্যে লাগামছাড়া চিন্তাভাবনা ঘোরাফেরা করে?

হস্তমৈথুন ডোপামিনের (Dopamine) কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়

পর্ন ও হস্তমৈথুন ডোপামিনের ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। Receptor Nerve গুলোর কার্যক্ষমতা হ্রাস করে দেয়, এমনকি একপর্যায়ে Receptor Nerve গুলো ধ্বংসও হয়ে যায়। ডোপামিনের ভারসাম্যহীনতা তৈরি করে আরও অনেক নতুন সমস্যা।

বিষণ্ণতা

মানুষের আনন্দের অনুভূতি আসে মূলত ডোপামিন থেকেই। আর কেউ যখন তার ডোপামিন খরচ করে এই হস্তমৈথুন থেকে পাওয়া সস্তা আনন্দের পেছনে, তখন আর তার হস্তমৈথুন ছাড়া অন্য কিছু ভালো লাগে না। বিষণ্ণতায় ভুগতে শুরু করে। হতাশী, উৎকণ্ঠা, কর্মক্ষেত্রের মেন্টাল স্ট্রেস থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্য অনেকেই মুক্ত বাতাসের খোঁজে হস্তমৈথুন করে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে হতাশী, উৎকণ্ঠা, মেন্টাল স্ট্রেস আবারও ফিরে আসে শতগুণ শক্তিশালী হয়ে।

আপনি হয়ে যাবেন অসামাজিক

হস্তমৈথুন করে করে ডোপামিনের ভারসাম্য নষ্ট করে ফেললে মন চাইবে সব সময় অন্ধকার ঘরের কোণায় বসে পর্ন দেখে হস্তমৈথুন করতে। বন্ধুদের সাথে দেখা করা, আড্ডা দেয়া, দলবেঁধে ঘুরতে যাওয়া, এগুলো অবধারিতভাবেই বিরক্তিকর লাগবে। পর্ন দেখা বা হস্তমৈথুন করার উত্তেজনার কাছে মামার বাসায় বেড়াতে যাওয়ার উত্তেজনা নিছকই দুধভাত।

জীবনের ছোট ছোট ব্যাপারগুলো থেকে আপনি কম আনন্দ পাবেন হস্তমৈথুন করে যদি আপনি ডোপামিন নিঃসরণকারী স্নায়ুগুলোকে দুর্বল বা একেবারে ধ্বংসই করে ফেলেন আর আপনার মস্তিষ্ক যদি ডোপামিনের স্বাভাবিক মাত্রা নির্ধারণ করতে না পারে,তাহলে নিত্যদিনের সেই সব ছোট ছোট বিষয় আপনাকে আনন্দ দেবে না যেগুলো থেকে একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ অনিন্দ পেয়ে থাকে। যেমন ধরুন, ছোট বাচ্চাদের সঙ্গে সময় কাটানো, ক্রিকেট খেলা, বৃষ্টিতে ভেজা, চাঁদনি পসর রাতে জ্যোৎস্না স্নান করা... এ কাজগুলো আপনার কাছে মনে হবে একেবারেই বিরক্তিকর, অপ্রয়োজনীয় আদিখ্যেতা।

আপনি হয়ে পড়বেন উদ্যমহীন, কুঁড়ে তরতাজা অনুভূতি নিয়ে দিন শুরু করলেন, নতুন সূর্য আর সকালের এক কাপ চা অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার রসদ দিলো আপনাকে। যেকোনো কারণেই হোক হস্তমৈথুন করে ফেললেন, তারপর আপনার আর কিছু করার ইচ্ছে হবে না। ঝিমিয়ে, ঘুমিয়ে দিন পার করে দিতে ইচ্ছে করবে।

কেন এমনটা হয় ?

আমরা হয়তো অনেকেই অ্যাড্রেনালিন (Adrenaline) হরমোনের নাম শুনেছি। অ্যাড্রেনাল গ্রন্থিগুলো থেকে এর উৎপত্তি। মূলত যখন খুব বেশি ধকল যায় তখন এ হরমোন নিঃসৃত হয়। এর ফলে ব্লাড সার্কুলেশন বৃদ্ধি পায়। আর ডোপামিন নিঃসরণের ফলেই অ্যাড্রেনালিনের নিঃসরণ শুরু হয়। অতিরিক্ত ডোপামিন বের হলে অতিরিক্ত অ্যাড্রেনালিনও বের হতে শুরু করে। এর মধ্যে আবার ডোপামিন সংশ্লেষিত হয়ে তৈরি হয় নরঅ্যাড্রেনালিন (Noradrenaline) যা আমাদের রক্তে হরমোন হিসেবে থাকে। এদের বাহিনীতে যোগ দেয় আরেক স্ট্রেস হরমোন। কর্টিসোল (Cortisol)। এই তিনে মিলে আমাদের হার্ট রেট বাড়াতে থাকে, শক্তি সঞ্চয়কারী কোষগুলো থেকে গ্লুকোয় বের করে আনে এবং স্কেলেটাল পেশিগুলোতে রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি করে। আর এসবই আমাদের শরীরে মারাত্মক ধকল সৃষ্টি করে। ফলে আমরা অনেক সময় উদ্যমহীন, ক্লান্ত বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। হস্তমৈথুনের কারণে ঠিক এ ঘটনাগুলোই ঘটে। নতুন কিছু করার আগ্রহ থাকে না। মন চায় ঘুমিয়ে বাকি সময়টুকু কাটিয়ে দিতে। টেবিলে ফাইলের স্তূপ হয়, ক্লাসের পড়া জমতেই থাকে, কিন্তু কিছুই করতে ইচ্ছে করে না।

হস্তমৈথুন আপনার আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে দেয়।

হস্তমৈথুনের ঠিক পরের অবস্থাটার কথা চিন্তা করুন। আপনি হস্তমৈথুন করে ঠান্ডা হয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। বদ্ধ ঘরের স্যাঁতস্যাঁতে বাতাসে দলবেঁধে ভেসে বেড়াতে লাগল জীবনের সেই সব প্রশ্নগুলো, যার উত্তর আপনি এখনো পাননি। একে একে আসতে শুরু করল জীবনের হিসেব না-মেলা সব ঘটনাগুলো। মন খারাপ। হওয়া শুরু হলো আপনার। "ধুর! শালা! আমার জীবনটা তো পুরোপুরিই নষ্ট হয়ে গেল, আমি একটা ফেলটুস, আমি একটা গান্ডু, আমি কিছু করতে পারি না, আমার দ্বারা কিসসু হবে না।

বড় হতে হলে, সফল হতে হলে, আত্মবিশ্বাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক ফ্যাক্টর। হস্তমৈথুন। আপনার নিজের ওপর বিশ্বাসটাকে একেবারেই খুঁড়িয়ে দেয়। এক-দুমাস হস্তমৈথুন থেকে দূরে থাকুন। দেখবেন আপনার ভেতরটা আত্মবিশ্বাসে টইটম্বর হয়ে আছে। এ ছাড়া হস্তমৈথুন রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও সমস্যার সৃষ্টি করে।

আর্ষদৃষ্টিতে বাল্যবিবাহের অসুবিধা এবং বিয়ের বয়স

হে মানবগণ ! পথিক যেমন পথের মধ্যে অবস্থিত কূপ পরিহার করে পথকে পরিষ্কার করে জীবকে সুখপূর্বক চলাফেরা করতে দেয়, তেমনি তোমরাও তোমাদের সন্তানদের শৈশবে বিবাহ প্রভৃতি বাধা দূর করে তাদের শিক্ষিত করো এবং তাদেরকে সুখের পথে চালনা করো ।
[যজুর্বেদ ভাবার্থ ২৮.১৩]

যে মানব ব্রহ্মচর্যের ব্রত ত্যাগ করে মূর্খ হয়ে, শীঘ্র বিয়ে করে এবং নপুংসকের মতো দূর্বল, রোগাক্রান্ত, লম্পট, নিষ্ঠুর ও দূরাসক্ত হয় তার শতবর্ষের আগেই দেহ বিনষ্ট হয় এবং তার মানবদেহ লাভ করা দুর্ভাগ্যবশত নিষ্ফল হয়ে যায় ।
[ঋগ্বেদ ভাবার্থ ৬.৬৬.৪]

হে কন্যা ! তুমি শৈশবে- ষোড়শ বৎসরের পূর্বে ও হে বালক! তুমি পঁচিশ বছর বয়সের আগে বিয়ে করবে না । যারা এইভাবে ব্রহ্মচর্যের পর বিবাহ করেন, তখন তাদের স্বরূপবান, পুণ্যবান, দীর্ঘজীবী ও সম্মানিত ব্যক্তিদের দ্বারা উত্তম সন্তানের জন্ম হয় ।
[ঋগ্বেদ ভাবার্থ ৫.২.২]

সকল ছেলে-মেয়ে বৈধভাবে ব্রহ্মচর্য গ্রহন করে সমস্ত বিদ্যা অধ্যয়ন করে, পূর্ণ যৌবনে তাদের অনুরূপ গুণ-কর্ম-স্বভাব পরীক্ষা করে, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রতি অগাধ প্রেম তৈরি করে বিয়ে করবে । যিনি পূর্ণবিদ্যাবতী তিনি মেয়েদের শিক্ষা দিবেন এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র বর্ণের জন্য যোগ্য হয় তবে তাদের নিজ নিজ বর্ণের জন্য যোগ্য করে তুলবেন ।
[ঋগ্বেদ ভাবার্থ ১.৫৬.২]

যেমন প্রথম বয়সে [কুমারী অবস্থায়] বর্তমান, শিক্ষিত এবং বাল্যকাল অতিক্রম করে, ব্রহ্মচারিণীরা নিজের মতো স্বামী পেয়ে আনন্দ করে, তেমনি বিদ্বান লোকেরাও সমস্ত জ্ঞান প্রাপ্ত করে আনন্দিত হয়।

[ঋগ্বেদ ভাবার্থ ৩.৫৫.১৬]

পিতামাতা প্রভৃতির জন্য অত্যন্ত উচিত তাদের সন্তানদের উপদেশ দেওয়া - তারা যখন সুশিক্ষা, জ্ঞান, দেহ ও আত্মার শক্তি, সুন্দর চেহারা, সৌন্দর্য, সদাচার, স্বাস্থ্য, ধর্ম এবং ঈশ্বর-সম্পর্কিত বিজ্ঞান ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ হয়, তখন নিজের ইচ্ছায় ও পরীক্ষার দ্বারা স্বয়ম্বর পদ্ধতিতে যে সমস্ত ছেলে-মেয়েরা পূর্ণ যৌবনে উপনীত হয়েছে এবং একই গুণ - কর্ম - স্বভাবের অধিকারী হয়েছে তারা বিয়ে করে এবং ঋতুপূর্ণ হয়ে ও ধর্ম পালন করে সর্বোত্তম উপায়ে সন্তান প্রসব করে । এটা ছাড়া কখনই বংশের উন্নতি হতে পারে না । সেজন্য বিদ্বানদের সবসময়ই এমন করা উচিত।

[ঋগ্বেদ ভাবার্থ ১.১১৭.১৩]

হে মানবগণ ! তোমরা পূর্ণ ব্রহ্মচর্য, শিক্ষা, বিদ্যা, যৌবন এবং পারস্পরিক ভালোবাসা ব্যতীত সন্তানদের বিয়ে করাবে না । যারা এটা পালন করে তারা সকলেই উৎকৃষ্ট সন্তান লাভ করে পরম সুখ লাভ করে । যারা এরকম তাদের নিকট দারিদ্র্যতা, মূর্খতা তথা দরিদ্র ও মূর্খ মানুষ কোনো ধরনের বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে না ।

[ঋগ্বেদ ভাবার্থ ৫.২.৩]

সমস্ত উষা যেমন সমান, তেমনি পুরুষদের সমান যে স্ত্রীরা হয়, তারা সকলের নিকট প্রশংসনীয়। তারা যেন যৌবনে তরুণ [স্বামী] পেয়ে আনন্দ করে । কোন প্রভাত নতুন আর কোনটা পুরাতন তা যেমন জানা যায় না, তেমনি ব্রহ্মচর্য পালনকারী কন্যারাও হয়ে থাকে।

[ঋগ্বেদ ভাবার্থ ৪.৫১.৬]

মহাপুরুষ বা আপ্ত মানবকে কিভাবে চিনবো ?

তাঁর বৈশিষ্ট্য কী ?

যিনি সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের সেবক, ধার্মিক, বিদ্বান , পরোপকারী তিনি তৃপ্ত হন । এমন বিদ্বানের সংস্পর্শ ব্যতীত কেউই বিদ্যা তথা রাজ্যের স্থিতিশীলতা লাভ করতে পারে না ।

[যজুর্বেদ ভাবার্থ ১২.২৯]

যেমন কোনো মানুষ বিদ্বান ব্যক্তির থেকে বিদ্যা লাভ করে, পরোপকারী হয়ে সকল প্রাণীদের কল্যাণ করে এবং বিদ্যাদান করে আনন্দ লাভ কর "আপ্ত" মানুষও তেমনই হয়ে থাকে।

[ঋগ্বেদ ভাবার্থ ১.৭৬.৫]

সেই বিদ্বানই "আপ্ত" হন,যিনি কুটিলতাবর্জিত হয়ে প্রতিদিন যোগ্য ব্যক্তিদের বিদ্যারূপ জ্ঞান দান করেন ।

[ঋগ্বেদ ভাবার্থ ৬.২৮.২]

হে মানবগণ ! যে ব্যাক্তি অন্যের কাজে বাধা প্রদান করে না, চুরি করেনা, তৃষ্ণার্তের নিকট জলের মতো শান্তিদায়ক হয়ে শরীর এবং আত্মার বলবৃদ্ধি করে সেই মানবই "আপ্ত" হয়।

[ঋগ্বেদ ভাবার্থ ৫.৫২.১২]

যে বিদ্বান দিন-রাত পরিশ্রমের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করে এবং অন্যকে উপদেশ প্রদান করে তাকেই "আপ্ত" বলে জানবে।

[ঋগ্বেদ ভাবার্থ ৫.৫৩.৩]

হে মানবগণ ! সূর্য যেমন দূরে অবস্থিত হয়েও নিজ জ্যোতি দ্বারা প্রসিদ্ধ হয়, তেমনি "আপ্ত" মানবও নিজ কীর্তি দ্বারা প্রসিদ্ধ হয়ে থাকেন।

[ঋগ্বেদ ভাবার্থ ৫.৩০.৫]

যিনি অপরের মধ্যে বিদ্যার বল তথা সম্পদ (লাভের উপায়) স্থাপিত করেন এবং যিনি কায়মনোবাক্যে এক হয়ে থাকেন তাঁকেই "আপ্ত" জানবে।

[ঋগ্বেদ ভাবার্থ ৫.৪৪.৬]

যিনি (সকলকে) উত্তম শিক্ষা এবং বিদ্যা দানের মাধ্যমে বদঅভ্যেস, দুর্গুণ তথা অধর্মাচরণ থেকে বিরত করে শুভগুণ এবং ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত করে, তিনিই এই জগতের কল্যাণকারী "আপ্ত"মানব।

[ঋগ্বেদ ভাবার্থ ১.১২৮.৫]

সেই "আপ্ত" হয়, যাঁর সর্বস্ব পরোপকারের উদ্দেশ্যে নিবেদিত, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

[ঋগ্বেদ ভাবার্থ ৩.৩০.১৯]

তিনিই "আপ্ত" হন, যিনি সকল মানবের মধ্যে বুদ্ধি আদি পদার্থের বিকাশের মাধ্যমে নিজ সমকক্ষ করতে তৎপর থাকেন।

[ঋগ্বেদ ভাবার্থ ৩.৩৯.২]

যে মানব বলার উপযুক্ত কথা বলেন, পানযোগ্য পদার্থকে পান করেন, প্রণাম করার যোগ্য ব্যক্তিকে প্রণাম করেন, শাস্তিযোগ্য পাপীকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করেন এবং জানার যোগ্য (জ্ঞাতব্য) বিষয়কে জানেন, তিনিই "আপ্ত" পুরুষ।

[ঋগ্বেদ ভাবার্থ ২.১৯.৭]

যে বিদ্বান চাঁদের মতো শান্ত স্বভাবের এবং সূর্যের মতো জ্ঞানের জ্যোতি প্রকাশ করার মনোভাব নিয়ে সকলের মাঝে জ্ঞানের জ্যোতি প্রদান করেন , তিনিই "আপ্ত" মানব ।

[ঋগ্বেদ ভাবার্থ ১.১০৫.১৮]

যে বিদ্বানের প্রশংসা লোকমুখে প্রচারিত হয় এবং সকল প্রজাগণ যে-ই বিদ্বানের প্রশংসা করেন, সেই "আপ্ত" মানবের আশ্রয় গ্রহণ করবে।

[ঋগ্বেদ ভাবার্থ ১.১২৭.২]

সেই "আপ্ত" মানব , যিনি সকলের সুখ চান। তাঁর সংস্পর্শে বিদ্যালাভ, অবিদ্যার নাশ, ধন প্রাপ্তি এবং দারিদ্র্যতার বিনাশ হয়।

[যজুর্বেদ ভাবার্থ ২৯.৩৭]

যে ব্যক্তি "আপ্ত" মানবের সংস্পর্শে থেকে সকল শাস্ত্র বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে এবং তাঁর(আপ্ত পুরুষের) কৃপাপূর্বক অন্যকেও উপদেশ দান করে থাকেন, তিনিও "আপ্ত" পুরুষ হন।

[ঋগ্বেদ ভাবার্থ ৫.৪৩.১]

যে "আপ্ত" পুরুষ ব্যর্থ সময় নষ্ট করে না, উত্তম নিয়ম পালনের সাথে কর্তব্য কর্ম করেন এবং ত্যাগের উপযুক্ত কর্ম ত্যাগ করেন, তাঁর প্রাতঃকাল, দিন-রাত, পক্ষ, মাস, ঋতুসমূহ সুষ্ঠুভাবে অতিবাহিত হয়।

এজন্য মানুষ উন্নতি প্রাপ্ত করার প্রচেষ্টা করে, উত্তম মার্গে চলে শুভ গুণসমূহ এবং সুখসমূহ প্রাপ্ত করে । উত্তম লক্ষণযুক্ত বাণী ও কর্ম দ্বারা ধর্ম কে গ্রহণ এবং অধর্মের ত্যাগে সর্বদা সচেষ্ট থাকে ।

[যজুর্বেদ ভাবার্থ ২৭.৪৫]

"আপ্ত" পুরুষ জ্ঞান বা উপদেশ প্রদান করা অথবা শিক্ষাদান ব্যাতীত অন্য কোনো কার্য কে মানবের কল্যাণকারী মনে করেন না। সে কারণে "আপ্ত" পুরুষ অজ্ঞানী ব্যক্তিদের কৃপাপূর্বক সর্বদা উপদেশ প্রদান করেন, শিক্ষাদান করেন।

[যজুর্বেদ ভাবার্থ ২৭.৪৩]

মানুষ যেমন নিজের সুখ কামনা করে, তেমনি অন্যের সুখ কামনাকারী "আপ্ত" পুরুষ পূজনীয় হয়ে থাকেন।

[যজুর্বেদ ভাবার্থ ১২.১১০]

তিনিই পূজ্য, সূর্যের তেজের মতো বিদ্যাকে প্রকাশকর্তা "আপ্ত" বিদ্বান, যিনি শুভ গুণ-কর্ম সবার মাঝে প্রেরণ করেন। ঋত্বিকগণ যেভাবে উত্তম সংস্কারের সহিত যজ্ঞ করে সংসারের উন্নতি করেন, তেমনি (আপ্ত পুরুষ) শুভ গুণযুক্ত বিদ্যার্থীদের মাঝে বিদ্যা এবং ধর্মের স্থাপনা করে সকল মানুষকে সুখী করেন।

[ঋগ্বেদ ভাবার্থ ৩.৫৯.৫]

বেদে প্রযুক্ত নারীবাচক শব্দ ও তার তাৎপর্য

বেদে নারী সম্বন্ধে বহু শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে । প্রতিটি অর্থই নারীর বৈশিষ্ট্য এবং গূঢ় অর্থ প্রকাশ করে । বেদমাতা আমাদের উক্ত শব্দের অর্থ দ্বারা একজন নারীর কি স্বভাব ও গুণ হওয়া উচিত তা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন । পুরুষের কর্তব্য নিয়ে বহুবিধ আলোচনা হলেও নারীর বিষয়ে পরমেশ্বরের সর্বজনীন উপদেশের চর্চা নগণ্য । আজকে আমরা সেই শব্দ নিয়েই আলোচনা করবো । বৈদিক বাঙ্‌ময়ের নারী বিষয়ক শব্দকে আমরা ৩টি শ্রেণিতে বিভক্ত করতে পারি ।

(১) অভিধাবৃত্তি দ্বারা প্রযুক্ত নারী বাচক শব্দ ।

যে সকল শব্দ দ্বারা বিশেষ্য বা বিশেষণ রূপে সরাসরি নারীকে সম্বোধিত করা হয়েছে ।

(২) উপমা দ্বারা প্রযুক্ত নারী বাচক শব্দ ।

এইসকল শব্দ দ্বারা নারীগণকে উপমিত করা হয়েছে ।

(৩) ঋষি দয়ানন্দ দ্বারা বিশেষ ব্যাখ্যাকৃত নারী বাচক শব্দ ।

মহর্ষি ভাষ্যকালে আর্ষদৃষ্টিতে সমাধিজাত প্রজ্ঞাবলে যে ব্যাখ্যা করেছেন ।

(১) অভিধাবৃত্তি দ্বারা প্রযুক্ত নারী বাচক শব্দ

১. অঘ্ন্যা (যজু০ ৮ ।৪৩) = আঘাত না করার যোগ্য ।

২. অজুর্যা (ঋ০ ২।৩।৫) = রোগ রহিত ।

৩. অদিতি: (যজু০ ৮।৪৩) = অসীম ক্ষমতাবান ।

৪. অরণ্যানী (ঋ০ ১০ ১৪৬ । ১) = সন্ন্যাসাশ্রম প্রাপ্ত ।

৫. অশ্বসূনৃতা (সা০ পূ০ ১৭৪১) = প্রিয় শব্দকারী ।

৬. ইডা (যজু০ ৮।৪৩) = প্রশংসনীয় গুণযুক্ত ।

৭. ইন্দ্রাণী ইত্যাদি (অথর্ব০ ৭ । ৪৯ । ২) = ঐশ্বর্যশালী পুরুষের পত্নী।

৮. উরুধারা (যজু০ ৮ । ৪২) = জ্ঞান এবং সুশিক্ষা ধারণকারিণী ।
৯. কাম্যা (যজু০ ৮।৪৩) = মনোহর স্বরূপযুক্ত ।
১০. কুলপা (অথর্ব০ ১ | ১৪ | ৩) = কুল রক্ষাকারিণী ।
১১. কুলায়িনী (যজু০ ১৪ । ২) = প্রশংসিত গৃহিণী ।
১২. কুহূঃ (অথর্ব০ ৭।৪৭।১) = অদ্ভুত স্বভাবযুক্তা ।
১৩. ঘৃতবতী (যজু০ ৪। ২) = তেজস্বরূপা ।
১৪. ঘোরা (যজু০ ১২ । ৬৪) দুষ্টদের ভয়ভীতকারিণী ।
১৫. চতুষ্কপর্দা (ঋ০ ১০ । ১১৪ । ৩) = যজ্ঞের মর্মার্থজ্ঞাতা
১৬. চন্দ্রা (যজু০ ৮ । ৪৩) = অত্যন্ত প্রদাত্রী ।
১৭. জ্যোতিঃ (যজু০ ৮ । ৪৩) = শ্রেষ্ঠ গুণে প্রকাশিতা ।
১৮. ধ্রুবা (যজু০ ১২ ।৫৩) দৃঢ় সঙ্কল্পযুক্তা ।
১৯. নির্ঋতিঃ (যজু০ ১২ । ৬৫) সত্যাচরণ যুক্তা ।
২০. পুণ্যগন্ধা (ঋ০ ৭1৫৫1৮) উত্তম যশসম্পন্ন নারী ।
২১. পুরন্ধিঃ (যজু০ ১৪ ।২) ঘর বা সমাজের নেত্রী ।
২২. পূষা (যজু০ ৩৮ । ৩) =পোষণকারিণী ।
২৩. পৃথুষ্টুকা (অথর্ব০ ৭।৪৬ । ১) = অত্যন্ত প্রশংসিত ।
২৪. প্রতরণী (অথর্ব০ ১৪ । ২ । ২৬) জীবনের উত্তীর্ণকারিণী ।
২৫. প্রতীচী (অথর্ব০ ৭ । ৪৬ । ৩) নিশ্চিত জ্ঞানযুক্তা ।
২৬. প্রথমা (যজু০ ৩৩ । ৫৯) = যশস্বিনী স্ত্রী ।
২৭. বহুসূবরী (অথর্ব০ ৭ । ৪৬ । ২) = বীর সন্তানদের জন্মদাত্রী ।
২৮. মহী (যজু০ ৮।৪৩) = অতিপূজনীয় ।
২৯. মাতৃমৃষ্টা (ঋ০ ১ । ১২৩ । ১১) = বিদুষী মাতার শিক্ষায় পবিত্র কন্যা ।
৩০. রাস্না (যজু০ ৩৮ । ৩) = দানশীলা ।
৩১. বশিনী (ঋ০ ১০ । ৮৫ । ২৬) = সবাইকে বশীভূতকারিণী ।
৩২. বাজিনীবতী (যজু০ ৩৪ ।৩৩) = কর্মঠ স্ত্রী ।
৩৩. বায়্যা (সা০ পূ০ ১৭৪১) = বিস্তারযুক্তা।
৩৪. বিশ্পত্নী (অথর্ব০ ৭ । ৪৬ । ৩) = সন্তানদের পালক ।
৩৫. বিশ্রুতি: (যজু০ ৮ । ৪৩) = বহুশ্রুত স্ত্রী ।
৩৬. ব্যচস্বতী (ঋ০ ২।৩।৫) = সমস্ত গুণ দ্বারা ব্যাপক ।
৩৭. শিবা (অথর্ব০ ১৯ ।৪০।৩) = কল্যাণকারিণী ।

৩৮. শৌচদ্রথা (সা০পূ০ ১৭৪১) = সুন্দর স্বরূপযুক্তা ।
৩৯. সত্যশ্রবসী (সা০পূ০ ১৭৪১) = উত্তম যশযুক্তা ।
৪০. সরস্বতী (যজু০ ৮ । ৪৩) = প্রশংসিত বিজ্ঞানযুক্তা ।
৪১. সহস্রস্তুকা (অথর্ব০ ৭ । ৪৬ । ৩) = সহস্র মানব যার স্তুতি করে ।
৪২. সহীয়সী (সা০ পূ০ ১৭৪১) = অত্যন্ত বলশালী ।
৪৩. সিনীবালী (অথর্ব০ ৭।৪৬ । ১) = অন্নপূর্ণা বা স্নেহশীলা ।
৪৪. সুজাতা (সা০ পূ০ ১৭৪১) = শোভন উৎপত্তিযুক্ত ।
৪৫. সুনীথা (সা০ পূ০ ১৭৪১) = সুন্দর প্রাপ্তিযুক্তা ।
৪৬. সুভদ্রিকা' (যজু০ ২৩ । ১৮)= উত্তম কল্যাণযুক্তা ।
৪৭. সুমঙ্গলী (অথর্ব০ ১৪ । ২ । ২৬) = মঙ্গল আচরণকারিণী ।
৪৮. সুলাভিকা (ঋ০ ১০।৮৬ । ৭) উত্তম ঐশ্বর্যযুক্তা ।
৪৯. সুশেবা (অথর্ব০ ১৪ । ২ । ২৬) কল্যাণপ্রদা ।
৫০. সুষদা (যজু০ ১০ । ২৬) = সুন্দর আশ্রয়যুক্তা ।
৫১. সুষূমা (অথর্ব০ ৭ । ৪৬ । ২) = উত্তম গুণের প্রতি প্রেরণাদাত্রী
৫২. সুসঙ্কাশা (ঋ০ ১ । ১২৩ । ১১) = উত্তমভাবে প্রকাশিত।
৫৩. স্তোমপৃষ্ঠা (যজু০ ১৫ । ৩) = স্বাধ্যায়শীলা ।
৫৪. স্যোনা (যজু০ ১০ । ২৬) = সুখরূপা ।
৫৫. স্বৌপশা (যজু০ ১১।৫৬) = স্বাদিষ্ট ভোজন রন্ধনকর্ত্রী ।
৫৬. হব্যা (যজু০ ৮।৪৩) = স্বীকারযোগ্যা ।

(২) উপমা দ্বারা প্রযুক্ত নারী বাচক শব্দ

১. অপ্ (যজু০ ১০।৭) = জল তুল্য শান্ত স্বভাব নারী ।
২. ইষ্টকা (যজু০ ১৩ । ২১) = ত্যাগময়ী সহিষ্ণু দেবী ।
৩. উষা (যজু০ ৩৪।৩৩) = প্রাতঃ কালের ন্যায় ঐশ্বর্যযুক্ত মঙ্গলময়ী নারী।
৪. দূর্বা (যজু০ ১৩ ।২০) = দূর্বা ঘাসের ন্যায় স্বীয় কুলকে বৃদ্ধিকারী ।
৫. দেবীদ্বরঃ (ঋ০ ৫।৫।৫) = শোভাযুক্ত দ্বারের ন্যায় সুখপ্রদাত্রী ।
৬. প্রাচী ইত্যাদি (যজু০ ১৪ । ১৩) = পূর্ব দিকের ন্যায় জ্ঞানালোক দ্বারা প্রকাশিতা ।
৭. রাকা (অথর্ব০ ৭।৪৮ । ১) = পৌর্ণমাসীর [পূর্ণিমা] ন্যায় শোভায়মান ।
৮. রাত্রিঃ (ঋ০ ১০ । ১২৭ । ১) = রাত্রির ন্যায় শান্তিপ্রদাত্রী নারী ।

(৩) ঋষি দয়ানন্দ দ্বারা বিশেষ ব্যাখ্যাত নারী বাচক শব্দ

১ . উপজিহ্বিকা (যজু০ ১১ । ৭৪) = অনুকূল রসনা তথা বাণীযুক্তা ।
২. মণ্ডূকী (যজু০ ১৭।৬) = সুভূষিতা বিদুষী স্ত্রী ।
৩. বিষূচিকা (যজু০ ১৯ । ১০) = বিবিধ অর্থের সূচনাকারী রাণী ।
৪. সরমা (যজু০ ৩৪ । ৫৯) = সমানভাবে রমণকারিণী অর্থাৎ পতির অনুকূল গমনকারিণী , চতুর বৈদ্যা ।
৫. অশ্বাজনী (যজু০ ২৯।৫০)= অশ্বের প্রশিক্ষক নারী ।

অলমিতি ।

আরো পড়ুন -

বেদে নারীর জয়গান -পর্ব ১

বেদে নারীর জয়গান -পর্ব ২

বেদে নারীর জয়গান -পর্ব ৩

বেদে নারীর জয়গান -পর্ব ৪

বেদে নারীর জয়গান -পর্ব ৫

বেদে নারীর জয়গান -পর্ব ৬

ব্রহ্মচর্য পালন করে বিদ্যালাভের পরই বিয়ে করা উচিত

হে বিদ্বানগণ ! তোমরা সবাই এমন প্রয়াস করো, যার ফলে মনুষ্যের সন্তান যতদিন যুবাবস্থায় থাকবে, ততদিন পর্যন্ত পূর্ণ বিজ্ঞান লাভ করে, পরিপূর্ণ যুবাবস্থায় নিজেদের ভেতর প্রেম আর অনুমতির দ্বারা স্বয়ম্বরের মাধ্যমে বিবাহ করে সদা আনন্দিত থাকবে ।

[ঋগ্বেদ ভাবার্থ ৪.৩৫.৫]

যে কুমার এবং যে কুমারী দীর্ঘকালের ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অঙ্গ এবং উপাঙ্গের সহিত বেদকে পড়ে, নিজের প্রসন্নতা পূর্বক স্বয়ম্বর বিবাহ করে ঐশ্বর্যলাভের জন্য প্রয়াস করে এবং ধর্মাচরণের দ্বারা ব্যভিচার ত্যাগপূর্বক উত্তম সন্তান উৎপন্ন করে পরোপকারে প্রবৃত্ত হবে, সে ইহলোক এবং পরলোকে সুখ লাভ করবে, অন্য মূর্খ তা পাবেনা ।

[যজুর্বেদ ভাবার্থ ১২.৫৬]

কুমার ধর্মপূর্বক আচরণকৃত ব্রহ্মচর্যের দ্বারা পূর্ণ বিদ্যা প্রাপ্ত করে, স্বয়ং ধার্মিক হয়ে পূর্ণ যুবাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পর, কন্যাকে পুরুষ আর পুরুষকে কন্যা পরীক্ষা করে, অত্যন্ত প্রেমের কারণে আকৃষ্ট হৃদয়যুক্ত হয়ে, নিজের ইচ্ছানুসারে বিবাহ করে, ধর্মের দ্বারা সন্তান উৎপন্ন করে আর সেবার দ্বারা মাতাপিতাকে সন্তুষ্ট করে আপ্ত বিদ্বানদের পথ নিরন্তর অনুসরণ করবে । যেভাবে সরল ধর্ম-মার্গের স্থাপনা করবে সেভাবে ভূমি, জল এবং অন্তরিক্ষের মার্গেরও নির্মাণ করবে ।

[যজুর্বেদ ভাবার্থ ১৫.৫৩]

সুখ প্রাপ্তির ইচ্ছা পোষণকারী পুরুষ এবং স্ত্রীদের ধর্মের সাথে আচরিত ব্রহ্মচর্যের দ্বারা পূর্ণ বিদ্যা প্রাপ্ত করে যুবাবস্থা আসার পর নিজের সদৃশতার অনুসারেই বিবাহ করা উচিত অথবা ব্রহ্মচর্য অবস্থাতেই অবস্থান করে নিত্য স্ত্রী-পুরুষদের উত্তম শিক্ষা দেওয়া উচিত । সমান গুণ-কর্ম-স্বভাব ছাড়া গৃহাশ্রমকে ধারণ করে কেউ কোনসুখ অথবা উত্তম সন্তান প্রাপ্ত করতে পারেনা, এজন্য এই উপায়ে বিবাহ করা উচিত ।

[ঋগ্বেদ ভাবার্থ ১.১১২.১৯]

যখন স্ত্রী এবং পুরুষ বিবাহ করতে চায়, তখন সে ব্রহ্মচর্যপূর্বক বিদ্যা-গ্রহণের দ্বারা স্ত্রী এবং পুরুষের ধার্মিক আচরণাদি জ্ঞাত হয়েই বিবাহ করবে ।

[যজুর্বেদ ভাবার্থ ৩৮.২]

সকল মাতা-পিতা, অধ্যাপিকাগণ এবং বিদুষীদের , কন্যাদেরকে এভাবে সম্বোধিত করতে হবে - হে কন্যাগণ ! তোমরা সকলে যদি পূর্ণ অখণ্ড ব্রহ্মচর্যে থেকে সম্পূর্ণ এবং উত্তম শিক্ষা প্রাপ্ত করে এবং যুবতী হয়ে নিজের সমান বরের সাথে স্বয়ম্বর বিবাহ করে গৃহাশ্রম করো তাহলে সকল সুখ লাভ করবে এবং উত্তম সন্তানোৎপাদন হবে ।

[যজুর্বেদ ভাবার্থ ১২.৫৩]

মনুষ্যদের উত্তম নিয়মপূর্বক বেদের অর্থকে বিশেষ রূপে জ্ঞাত হয়ে, পূর্ণ যুবাবস্থায় স্বয়ম্বর বিবাহ করে, ধর্মের দ্বারা সন্তান উৎপন্ন করে, তাদের সম্যক্‌কৃত্ত পালন করে এবং যথারীতি ব্রহ্মচর্যপূর্বক তাদের সুশিক্ষিত করকে তথা বিদ্বান তৈরি করে সুখের বৃদ্ধি করা উচিত ।

[ঋগ্বেদ ভাবার্থ ২.২৪.১৬]

যেভাবে ২টি উত্তম অশ্ব রথের মাধ্যমে সুখপূর্বক রথের স্বামীকে অন্য স্থানে পৌছায় দেয়, সেভাবেই নিজেদের ভেতর প্রেমযুক্ত এবং যোগ্য বিদ্বান স্ত্রী-পুরুষ গৃহাশ্রমকে সুশোভিত করতে পারে ।

[ঋগ্বেদ ভাবার্থ ৩.৫৩.৪]

যেই কুলে ব্রহ্মচর্য পালনকৃত স্ত্রী-পুরুষ রয়েছে, ঐ কুলকে ভাগ্যবান্ মনে করা উচিত ।

[ঋগ্বেদ ভাবার্থ ৫.৫৬.৯]

যেই বিদ্যাবান পুরুষের সাথে বিদুষী স্ত্রীর বিবাহ হয়, তারা সদা সমৃদ্ধ হয় । যিনি উত্তম গুণগুলোকে গ্রহণ করে, তিনি এই জন্মে পুরুষার্থী হয়ে পরজন্মেও সুখী হয় ।

[ঋগ্বেদ ভাবার্থ ১.১৪০.৭]

যেভাবে বিদুষী ব্রহ্মচারিণী পূর্ণ বিদ্যা তথা শিক্ষা আর নিজের তুল্য এবং হৃদয় প্রিয় পতিকে পেয়ে সুখী হয়, সেভাবে অন্য ব্রহ্মচারিণীদেরও প্রয়াস করা উচিত ।

[ঋগ্বেদ ভাবার্থ ১.১২৩.১০]

কোন মনুষ্যের দ্বারা ব্রহ্মচর্য, উত্তম শিক্ষা, বিদ্যা, শরীর তথা আত্মার বল, স্বাস্থ্য, পুরুষার্থ, ঐশ্বর্য, সজ্জনদের সঙ্গতি, আলস্যত্যাগ, যমনিয়মাদি আচরণ এবং উত্তম সহায়ক ছাড়া গৃহাশ্রম ধারণ করা সম্ভব নয় এবং গৃহাশ্রম ব্যতিরেকে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের সিদ্ধি হয়না । এজন্য সবার এই গৃহাশ্রমের প্রচেষ্টাপূর্বক আচরণ করা উচিত ।

[যজুর্বেদ ভাবার্থ ৮.৩১]

যেই ব্রহ্মচারীদের ব্রহ্মচারিণী স্ত্রী প্রাপ্তি হয়, তারা কি সুখকে না পেয়ে থাকে ?

[অর্থাৎ তারাই সুখ লাভ করে]

[ঋগ্বেদ ভাবার্থ ১.৭৯.২]

আর্যের দৃষ্টিতে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ

গৌতম চন্দ্র ঘরামী

আপনারা তো শ্রীকৃষ্ণকে অবতার রূপে স্বীকার করেন না। তাহলে আপনারা তো কৃষ্ণকে মানেন না।

উত্তর: আমরা কৃষ্ণকে অবতার রূপে স্বীকার করিনা এই কথাটি বললে সবাই ভাববে আমরা শ্রীকৃষ্ণ বিরোধী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরাই শ্রীকৃষ্ণের অনুসারী।

পবিত্র বেদে বলা হয়েছে ঈশ্বর জন্ম-মৃত্যু রহিত, শরীররহিত, ইন্দ্রিয়-স্নায়ু রহিত নিরাকার, সর্বব্যাপী ও সকল দুঃখ-কষ্ট রহিত সচ্চিদানন্দময়। এবার আপনি বলুন ঈশ্বর কি তবে নরাকারে আবির্ভূত হতে পারেন? যার দেহ নাই, মৃত্যু নাই কিংবা যার কোনো পরিবর্তন নাই অর্থাৎ অজড়, অমর ও অক্ষয় তিনি যদি দেহধারণ করেন তবে তো তার জন্ম-মৃত্যু, ক্ষয়-দুঃখ থাকবে। তার তো পুরুষ বা স্ত্রী লিঙ্গ থাকবে। তবে তিনি কি প্রকারে অবতার ধারন করতে পারেন ?

তবে আপনারা তো শ্রীকৃষ্ণকে মানেন না এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান। কারন গীতায় ভগবান বলেছেন সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে আমার স্মরণ নাও। তাইতো আমরা সকল কিছু ছেড়ে দিয়ে তাঁর নাম জপি।

উত্তর: আপনি যদি আপনার বাবা-মায়ের কথা না শুনে অবাধ্য ছেলের মতো জীবনযাপন করেন আর কেবল নিজ প্রয়োজনে তাদের কাছে গিয়ে বলেন, তোমাদের অনেক ভালোবাসি মা-বাবা। আমি দিবানিশি কেবল তোমাদেরই কল্যাণ চাই। মা-বাবা কি এই ফাকা বুলি শুনে খুশি হবেন? আপনি তাদের কোনো কথা শুনেন না, তাদের সেবা করেন না অথচ নিজে নিজে দাবী করছেন বাধ্য সন্তান

তেমনি শ্রীকৃষ্ণ গীতায় প্রণবাক্ষর জপ করতে বলেছেন, বৈদিক যজ্ঞাদি ক্রিয়া করতে বলেছেন, স্বধর্ম পালন করতে বলেছেন, শ্রেষ্ঠ মন্ত্র বলেছেন মহামন্ত্র "গায়ত্রী" কে। তার শরণ নেওয়ার অর্থই তো তিনি যা বলেছেন সেটিই পালন করা, তার উপদেশ অনুসারে নিজের জীবন পরিচালনা করা। তাই তো? অর্জুন তো শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিয়ে তার ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম পালন করেছিলেন।

অথচ আপনি কৃষ্ণের কোনো কথা শুনলেন না! মহামন্ত্র নিজেরা অন্য একটি বানিয়ে নিলেন, স্বধর্ম ভুলে গেলেন, যজ্ঞাদি ক্রিয়া বাদ দিলেন। আর মুখে মুখে বলে বেড়াচ্ছেন, আমরা শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিয়েছি কিন্তু কর্ম করছেন শ্রীকৃষ্ণের ঠিক বিপরীত। আমরাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে প্রত্যহ গায়ত্রী মন্ত্র জপ করি, বৈদিক সন্ধ্যোপাসনাবিধি পালন করি, বেদাধ্যয়ন করি ও শ্রীগীতাকে অন্তরে ধারন করি। তবে আমরা কি করে শ্রীকৃষ্ণের শরণ বিমুখ হলাম।

আপনারা তো শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলাকে মানেন না। তবে তো আপনারা শ্রীকৃষ্ণ বিরোধী।

উত্তর: শ্রীকৃষ্ণ আমাদের জন্য আদর্শ। যুগের ক্রান্তিকালে তিনি জগতের ত্রাতা রূপে আবির্ভুত হয়েছিলেন। অর্জুন যুদ্ধ করবেন না বলেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাকে অনার্য বলে তিরস্কার করলেন। মানীর মান হানি অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় এই উক্তি দ্বারা তিনি অর্জুনকে তার কর্তব্য কর্ম স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি সকল কর্ম ও ফলের উর্ধ্বে তবুও তিনি কর্ম করে যান লোকহিতার্থে এই কথাও তিনি অর্জুনকে বলে বোঝালেন যে, জ্ঞানীর কর্মবিমুখ হতে নেই কারন জ্ঞানী কর্মবিমুখ হলে সাধারনেরাও তার অনুসরন করে উচ্ছন্নে যাবে। এভাবে জ্ঞানীরাই সাধারনদের বিনাশের কারন হয়ে যাবে।

যিনি এত সুন্দরভাবে অর্জুনকে কর্মযোগের শিক্ষা দিয়েছিলেন তাকে কি করে মাখন চোর, ননী চোরা, বস্ত্র হরণকারী, গোপীদের যৌন হেনস্থাকারী এইসব অপবাদ দিয়ে হাসিমুখে লীলা বলে মেনে নিই। আমরা শ্রীকৃষ্ণের প্রেম ও শক্তির বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই মহাভারতে ও হরিবংশে। সেই সুদর্শন চক্রধারী বীরপুরুষ ও এক স্ত্রী রুক্মীনি দেবীর প্রতি প্রেম নিবেদনকারী মহাপুরুষই আমাদের আদর্শ। কি নেই তার চরিত্রে? জ্ঞানী, কর্মযোগী, মহাবলশালী, রাজনীতিবিদ, প্রেমিক, নগর নির্মাতা, ন্যায়বিচারকারী, কৃপালু-দয়ালু ও আরও অনেক সৎ গুণাবলির অনুসারী তিনি। তাকে চোর ও কামুক রূপে কল্পনা করতে চাই না আমরা। আমরা কৃষ্ণকে অনুসরণ করতে চাই। তাকে দেবতা বানিয়ে পূজা করবো অথচ তারই কুৎসা রটিয়ে সবার সামনে তাকে অপমানিত করবো এরকমটা আমরা কদাপি করতে চাই না।

আমরাই প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের অনুসারী। তার গুণগ্রাহী ও তার প্রশংসা বাক্য জগতের প্রতিটি কোণে কোণে পৌছে দেওয়ার অঙ্গীকার রক্ষাকারী।

জয় শ্রীকৃষ্ণ

জয় বেদমাতা

কেন বেদ পড়বেন ?
বেদ পড়ার ফল কি ?

সামবেদে বলা হয়েছে -

পাবমানীঃ স্বস্ত্যয়নীস্তাভির্গচ্ছতি নান্দনম্ । পুণ্যাংশ্চ ভক্ষান্ভক্ষয়ত্যমৃতত্বং চ গচ্ছতি ॥

[সামবেদ ১৩০৩]

পদার্থঃ (পাবমানীঃ) পরমাত্মার পবিত্রকারক মন্ত্রসমূহ (স্বস্ত্যয়নীঃ) কল্যাণকারিণী । (তাভিঃ) সেই মন্ত্রসমূহ দ্বারা চতুর্বেদ অধ্যয়নকারী মানব (নান্দনম্) আনন্দধাম মোক্ষ (গচ্ছতি) প্রাপ্ত করেন, (পুণ্যান্ চ) ও পুণ্য দ্বারা প্রাপ্য (ভক্ষান্) ভোগসমূহ (ভক্ষয়তি) ভোগ করেন, (অমৃতত্বং চ) এবং অমৃতস্বরূপকে (গচ্ছতি) লাভ করেন।

সরলার্থঃ পরমাত্মার পবিত্রকারক মন্ত্রসমূহ কল্যাণকারিণী। সেই মন্ত্রসমূহ দ্বারা চতুর্বেদ অধ্যয়নকারী মানব আনন্দধাম মোক্ষ প্রাপ্ত করেন ও পুণ্য দ্বারা প্রাপ্য ভোগসমূহও ভোগ করেন এবং অমৃতস্বরূপকে লাভ করেন ।

ঋগ্বেদে মোক্ষের স্বরূপ দেওয়া হয়েছে -

ওতম্ যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে। কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামস্তত্র মামমৃতং কৃধীন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ॥

[ঋগ্বেদ ৯।১১৩।১১]

অর্থাৎ যেখানে আনন্দ - হর্ষ - তৃপ্তি - প্রমোদ রয়েছে ; যেখানে মনোরথ পূর্ণ হয় সেই মোক্ষধামে নিয়ে গিয়ে আমাকে অমৃত করো । জীবাত্মাস্বরূপ জ্ঞানযোগী আমার জন্য - হে পরমাত্মা ! পূর্ণাভিষিকের কারণ হও ।

এই জন্য মানবমাত্রেই বেদের পঠন-পাঠন ও আচরণ করা পরম ধর্ম ।

সন্দর্ভঃ সামবেদ [উত্তরার্চিক] - ড. রামনাথ বেদালঙ্কার

ত্রৈতবাদ কি ও কেন ?

ত্রৈতবাদ বাস্তবিকতা , বুদ্ধিগ্রাহ্যতা , সত্য , সম্ভাব্যতা এবং বৈজ্ঞানিক যথার্থ আধারের উপর প্রতিষ্ঠিত । ত্রৈতবাদ হচ্ছে বেদভিত্তিক একটি দর্শন । এই দর্শন অনুসারে , পরমাত্মা , জীবাত্মা এবং প্রকৃতি– এই তিনটি সত্তা অনাদি , নিত্য ও পৃথক। এদের মধ্যে পরমাত্মা এই সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ , প্রকৃতি উপাদান কারণ এবং জীবাত্মা সাধারণ কারণ। এই দর্শন অনুসারে , পরমাত্মা এক , অদ্বিতীয় , চেতন , সর্বজ্ঞ , সর্বব্যাপী , আনন্দময় , একরস , বিকারশূন্য । অপরদিকে জীবাত্মা বহু , চেতন , একদেশী অল্পজ্ঞ । আর প্রকৃতি অচেতন , সর্বব্যাপী নয় ।

ত্রৈতবাদ নিয়ে ভালো ভাবে বুঝতে বিস্তর আলোচনার প্রয়োজন । একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর আরো প্রশ্নের উদয় হবে এটাই স্বাভাবিক । স্বাধ্যায় এবং প্রশ্ন করার মাধ্যমে সম্যকরূপে জানতে সমর্থ হওয়া যাবে । কিন্তু এই একটা পোষ্টে সেটা কখনোই সম্ভব নয় ।

ত্রৈতবাদ অনুসারে পরমাত্মা , জীবাত্মা এবং প্রকৃতিকে অনাদি বলা হয়েছে । সাংখ্য এবং গীতায় এর নাম প্রকৃতি ও পুরুষ । পুরুষ শব্দটি পরমাত্মা এবং জীবাত্মা-উভয়ের বাচক । গীতাতেই জীবাত্মা ছাড়াও অন্য এক পুরুষের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে , যা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে শ্রুতি , দর্শন এবং স্মৃতিপ্রস্থান একই সিদ্ধান্ত দিচ্ছে । উক্ত শাস্ত্রাদিতে পরমাত্মা , জীবাত্মা এবং প্রকৃতি উভয়কেই অনাদি বলা হয়েছে । অনাদি কী ?

- যার কোনো সূচনা নেই । অর্থাৎ পরমাত্মা , জীবাত্মা এবং প্রকৃতির কোনো আদি নেই । আর আদি না থাকলে অন্তও আসবে না ।

এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন । প্রকৃতি বলতে কেবল পৃথিবীকে বুঝানো হচ্ছে না । পৃথিবীর উপাদান-কারণকে বুঝানো হচ্ছে । অর্থাৎ পৃথিবীর আদি এবং অন্ত থাকলেও পৃথিবী যেসকল উপাদানে প্রস্তুত হয়েছে সেগুলোর সৃষ্টি বা বিনাশ নেই । অর্থাৎ যেমন শক্তির ধ্বংস নেই কেবল রূপান্তর হয় , এ ব্যাপারটাও অনেকটা তেমনই ।

এষা সনত্নী সনমেব জাতৈষা পুরাণী পরি সর্বং বভূব। মহী দেব্যুষসো বিভাতী সৈকেনৈকেন মিষতা বি চষ্টে ॥

[অথর্ববেদ: ১০/৮/৩০]

পদার্থ: (এষা) এই (সনত্নী) সনাতন প্রকৃতি (সনং এবং) সর্ব্বদাই (জাতাঃ) কার্যোৎপাদন কারিণী (এযা) এই (পুরাণী) পুরাতন (সর্ব্বম্) সব কার্যে (পরিবভূব) পুর্ণভাবে অবস্থান করে (মহী) মহতী (দেবী) কান্তিময়ী (উসসঃ) কমনীয় পদার্থ সকলকে (বিভাতী) বিশেষরূপে আলোকিত করে (সা) সেই প্রকৃতি (একেন একেন) প্রত্যেক (মিষতা) গতিশীল জীবের সঙ্গে (বিচষ্টে) স্ব স্বরূপ বর্ণনা করে ।

অনুবাদ: এই নিত্য প্রকৃতি সর্ব্বদাই পরিণাম যুক্তা , পুরাতন , নব নব রূপ ধারিণী এবং সর্ব্ব কার্যে করণ রূপে বিরাজমানা । প্রত্যেক গতিশীল জীবের সঙ্গেই এই প্রকৃতি নিজের স্বরূপ ও সত্ত্বা প্রকাশ করিতেছে ।

ত্রয়: কেশিন ঋতুথা বি চক্ষতে সংবৎসরে বপত এক এষাম্। বিশ্বমেকো অভি চষ্টে শচীভির্ধ্রাজিরেকস্য দদৃশে ন রূপম্ ॥

[ঋগ্বেদ: ১/১৬৪/৪৪]

পদার্থ: (ত্রয়ঃ) তিন (কেশিনঃ) প্রকাশময় পদার্থ (ঋতুথা) নিয়মানুসারে (বিচক্ষতে) বিবিধ কার্য করিতেছে। (এষাম) ইহাদের মধ্যে (একঃ) এক (সংবৎসরে) সৃষ্টিকালে (বপতে) স্বপন করে (একঃ) এক (শচীভিঃ) শক্তি দ্বারা (বিশ্বম্) বিশ্বকে (অভিচষ্টে) দুই দিক হইতে দেখে (একস্য) একের (ঘ্রাজিঃ) বেগ (দদৃশে) দৃষ্ট হয় (রূপন) রূপ নয় ।

অনুবাদ: তিন প্রকাশময় পদার্থ সময়ানুসারে বিবিধ কার্য করিতেছে । ইহাদের মধ্যে ব্রহ্ম সৃষ্টিকালে বীজ বপন করে , জীব সামর্থ দ্বারা সংসারকে শুভ অশুভ দুই দিক হইতে ভোগ করে । প্রকৃতির শুধু বেগ দেখা যায় কিন্তু রূপ দেখা যায় না ।

ভাবার্থ: ব্রহ্ম, জীব ও প্রকৃতি এই তিনটি প্রকাশময় পদার্থ । ইহারা জগতের কারণ । প্রকৃতির কার্য চর্ম্ম চক্ষুতে দেখা যায় কিন্তু সূক্ষ্ম বলিয়া তাহার রূপ দেখা যায় না ।

এই তিন তত্ত্ব পরস্পর স্বরুপ থেকে ভিন্ন তথা প্রলয়বস্থা এবং সৃজনাবস্থায় একত্রে থাকে । এই পরমাত্মা , জীবাত্মা এবং প্রকৃতির কোনো সমষ্টি হয় না । সেজন্য এদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আলাদা সত্ত্বারও প্রয়োজন হয় না । তাহলে এই তিনটি আলাদা আলাদা হওয়া সত্ত্বার মধ্যে সম্পর্ক কী ? কীভাবে এরা কী কাজ করে ?

- পরমাত্মা নির্গুণ , তাই তিনি সর্বতোভাবে মুক্ত এবং প্রকৃতির গুণত্রয় তাকে আবদ্ধ করতে পারে না ।

সর্বব্যাপী হওয়ায় তিনি প্রকৃতি উপাদানসমূহকে রূপান্তর করেন এবং ভোগ হেতু নির্মাণ করেন । কিন্তু প্রকৃতি নিজের এই ভোগ গ্রহণ করতে পারে না । কেবল পরমাত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় । অন্যদিকে জীবাত্মাকে প্রকৃতির গুণসমূহ (সত্ত্ব , রজঃ , তমঃ) আবদ্ধ করতে পারে । কারণ সে পরমাত্মার মতো নির্গুণ নয় । প্রকৃতির ভোগসমূহ সে ভোগ করে । কিন্তু এই জীবের অন্তিম চেষ্টা থাকে পরমাত্মা প্রাপ্তি । এখানে পরমাত্মা প্রাপ্তি বলতে জীবাত্মা গিয়ে পরমাত্মায় মিশে যাবে এমনটা ভাবা যাবে না । কারণ এরকম ভাবলে মনে হবে পরমাত্মা কোনো আলাদা স্থানে আছেন এবং তিনি সর্বব্যাপী নন । তাই জীবাত্মা প্রকৃতির ত্রিগুণ থেকে মুক্ত হয়ে সেখানে গিয়ে পরমাত্মায় মিশে যাবে , ব্যাপারটা এমন নয় । বস্তুতঃ জীবাত্মাও পরমাত্মার মতোই নির্গুণ হতে পারে তার কর্মের মাধ্যমে । জীবাত্মা যখন গুণত্রয়ের বন্ধন ছিন্ন করে নির্গুণ হয়ে যান তখন তিনি মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত করেন । শাস্ত্রে সেই জীবাত্মাকে মুক্ত পুরুষ বলা হয়েছে । তাহলে এখানে পরমাত্মা প্রাপ্তি বলা হলো কেন ?

পরমাত্মা প্রাপ্তি কথাটি এখানে পরমাত্মার স্বরূপার্থে ব্যবহৃত । তাহলে জীবাত্মা কী পরমাত্মার মতোই হয়ে যায় ?

না । মুক্ত পুরুষ কখনোই পরমাত্মার মতো সৃষ্টিক্রিয়াদি কার্য সম্পন্ন করতে পারে না । কেবল নির্গুণতা লাভ করে । অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হয় । তবে নির্গুণতা প্রাপ্ত হওয়ার পর ইচ্ছা করলেই সে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে পারে । অন্যদিকে পরমাত্মা কখনো জন্মগ্রহণ করে না । কেননা পরমাত্মা সর্বতোভাবে উদাসীন থাকেন এবং সর্বব্যাপী হওয়ার কারণে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে , নির্দিষ্ট শরীরে আবদ্ধ হন না ।

আর অন্যদিকে প্রকৃতি কেবল রূপান্তর হয় । মুক্ত পুরুষ সম্পর্কে বেদ থেকে প্রমাণ -

অপশ্যং গোপামৈনপদ্যমানমা চ পরা চ পৃথিভিশ্চরন্তম্ । স সধ্রীচীঃ স
বিষূচীর্বসান আ বরীবর্তি ভুবনেষ্বন্তঃ।।

[অথর্ববেদ - ৯/১০/১১]

১.(গোপাম্) যারা ইন্দ্রিয়ের রক্ষা করে (অনিপদ্যমানম্) বার বার বিবিধ যোনীতে অবতরণ করতে (অপশয়ম্) আমি দেখেছি। জিতেন্দ্রিয়তা দ্বারা মুক্ত হওয়া ওই পুরুষকে (আ চ পরা চ) নিকটে এবং দূরে - আমাদের নিকট আসে আবার আমাদের ছেড়ে দূরে চলে যায় (মার্গং সে চরন্তম্) বিচরণ করতে আমি দেখেছি । যেখামে আমরা আছি সেখানেও আসে আবার অন্য লোক-লোকান্তরেও চলে যায় ।

২.(সঃ)ওই মুক্তাত্মা মানবকল্যাণ/লোকহিতের জন্য (সধ্রীচী) যে শরীরের সাথে আমাদের ওঠা-বসা সেই শরীর ধারণ করে । এই শরীরের মাধ্যমেই আমাদের উপদেশ দেন এবং নিজের জন্মের উদ্দ্যেশ্য পূরণ করে । (সঃ বিষূচী) সেই মুক্তাত্মা বিভিন্ন লোকে শরীর ধারণ করে এবং (ভূবনেষু অন্ত) এই ভূবনে বিচরণ করে । লোকহিতের জন্য এই পুরুষকে " অতিমানব " বা মহাপুরুষ বলা হয় ।

ভাবার্থ : জিতেন্দ্রিয় পুরুষ মুক্তাত্মা হয়ে যায়। সে সময় - সময় লোকহিতের জন্য শরীর ধারণ করে এই ভূবনে বিচরণ করেন ।

[আধ্যাত্মিক ভাষ্যঃ পণ্ডিত হরিশরণ সিদ্ধান্তালংকার]

স স্মা কৃণোতি কেতুমা নংক্ত চিদ্ দূর আ সতে। পাবকো যদ্বনস্পতীন্প্র স্মা মিনাত্যজরঃ।।

[ঋগ্বেদ ৫/৭/৪]

পদার্থঃ (সঃ) সেই (পাবকঃ) প্রভু আমাদের জীবনকে পবিত্রকারী (নংক্ত চিত্) রাত্রিতেও , অত্যন্ত অন্ধকারেও এমনকি (দূরে আসতে) সর্বদা দূরে স্থিত পুরুষের জন্যেও (কেতুম্) [জ্ঞানের আলোকে] প্রকাশিত (আকৃণোতি স্ম) করেন প্রভু। বস্তুত প্রভুর কৃপাতেই আমরা [জ্ঞানের] আলোকে প্রাপ্ত হই। এই আলোকে তখন প্রাপ্ত করি (যদ্) যখন (অজরঃ) কখনো জীর্ণ হয় না সেই প্রভু (বনস্পতীন্) জ্ঞান রশ্মির [প্রাপ্তকারী] স্বামীদের , জ্ঞানী পুরুষদের , মুক্তাত্মা পুরুষদের (প্র আ মিনাতি স্ম) একবার পুনরায় পৃথিবীতে স্থাপন করেন । প্রভুর প্রেরণাতেই এই মুক্তাত্মা জন্ম-মৃত্যুর কষ্টকে স্বীকার করে এই পৃথিবীতে আসেন আর লোকজনকে প্রভুর সন্দেশ শুনান ।

ভাবার্থঃ প্রভুর থেকে দূরে স্থিত অন্ধকারে মগ্ন পুরুষকে প্রভু স্বেচ্ছায় জন্ম নেওয়া মুক্তাত্মাদের দ্বারা, জ্ঞানের সন্দেশ শুনান , আর এইভাবে তাদের অজ্ঞানতার অন্ধকারকে দূর করেন।

[আধ্যাত্মিক ভাষ্যঃ পণ্ডিত হরিশরণ সিদ্ধান্তালংকার]

মূলত মোক্ষ প্রাপ্ত জীবাত্মা - কেই মুক্তাত্মা বলা হয়ে থাকে । মুক্তাত্মা কি করতে পারে এই সম্পর্কে শতপথ ব্রক্ষাণ গ্রন্থ থেকে দেখুন-

শৃণ্বন্ শ্রোত্রং ভবতি, স্পর্শয়ন্ ত্বগ্ভবতি, পশ্যন চক্ষুর্ভবতি,রসয়ন্ রসনা ভবতি, জিঘ্রন্ ঘ্রাণং ভবতি, মন্বানো মনো ভবতি, বোধয়ন্ বুদ্ধির্ভবতি, চেতয়ঁশ্চিত্তম্ভবত্যহঙকুর্বাণো হঙ্কারো ভবতি।।

[শতপথ ব্রাহ্মণ কাং ১৪]

অর্থাৎ মুক্তি অবস্থায় জীবাত্মা শুনিতে ইচ্ছা করিলে স্বশক্তি দ্বারাই শ্রোত্র , স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করিলে ত্বক, দেখিবার সংকল্প হইলে চক্ষু, স্বাদ গ্রহণের জন্য ঘ্রাণ, সংকল্প বিকল্প করিবার জন্য মন, নিশ্চয় করিবার জন্য বুদ্ধি, স্মরণ করিবার জন্য চিত্ত, অহংবুদ্ধির জন্য যেমন ইন্দ্রিয়গোলকের দ্বারা স্বকার্য সিদ্ধ করে সেইরূপ মুক্তি অবস্থায় স্বশক্তি দ্বারা সমস্ত আনন্দ ভোগ করে ।"এর থেকে একেবারে নিশ্চত ভাবে যানা যায় যে মুক্ত আত্মারা চাইলে অবতরণ করতে পারেন ।

ত্রৈতবাদ ভারতীয় আস্তিক ষড়দর্শন গুলোর সমন্বয়াত্মক দৃষ্টিকোণের প্রতিনিধিত্ব করে তথা বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দর্শনগুলোর কিছু না কিছু তত্ত্বের প্রতিনিধিত্বও করে ।

ত্রৈতবাদ অনুসারে জীবাত্মা অনাদি । জীবাত্মার স্বরূপ হল আনন্দময় না । তাই সে আনন্দ পেতে চায় । এই আনন্দ হল ব্রহ্মের সংস্পর্শ । এটাই মোক্ষ । জীব ভোগের জন্য বার বার জন্ম হয় যতক্ষণ পর্যন্ত মোক্ষ প্রাপ্তি না হয় । তার কর্ম অনুসারে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু মোক্ষ প্রাপ্তি করবে পরে ঐ জীবাত্মা পুনরায় জন্মগ্রহণ করে ।

ঈশ্বর কর্তৃক জগৎ সৃষ্টির কারণ কী ? এটি আমাদের অনেক কমন প্রশ্ন । ঈশ্বর কেন এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন ? ত্রৈতবাদ অনুযায়ী আমরা এর খুব সুন্দর ব্যাখ্যা পাই যা কিনা যোগ দর্শনে পতঞ্জলি মুনি করে গেছেন ।

যেকোনো কাজের তিনটি কারণ থাকে ।

নিমিত্ত কারণ , উপাদান কারণ , সাধারণ কারণ ।

নিমিত্ত কারণ হল কর্তা (who) , উপাদান কারণ কর্ম (what) , সাধারণ কারণ হল কার জন্য (why) ।

সহজভাবে বোঝালে , যদি একটা বাড়ির নির্মাণকে কার্য ধরি , তো মিস্ত্রি সেই বাড়ির নিমিত্ত কারণ , উপাদান কারণ ইট , বালু , সিমেন্ট , রড আর সাধারণ কারণ সেই বাড়িতে যারা থাকবে তারা ।

ত্রৈতবাদ মতে সাধারণ কারণ হল জীবাত্মা । কেননা ঈশ্বর নিজে এই জগৎকে কখনোই ভোগ করেন না । কাজেই এই জগতের সৃষ্টি জীবাত্মার ভোগের নিমিত্ত ।

সূত্র - তদর্থ এব দৃশ্যস্যা ্যাত্মা। (যোগ দর্শন ২।২১)
শব্দার্থ - (তদ্-অর্থঃ) ওই জীবাত্মার ভোগ এবং অপবর্গের জন্য (এব) অবশ্যই (দৃশ্যস্য) দৃশ্যের (আত্মা) স্বরূপ হয় ।
সূত্রার্থ - দৃশ্যের স্বরূপ জীবাত্মার ভোগ ও অপবর্গকে সিদ্ধ করার জন্য হয় ।

ব্যাখ্যা - এই সূত্রে দৃশ্যের কী প্রয়োজন ; সেই বিষয়ে বলা হয়েছে এই দৃশ্যের রচনা ঈশ্বর , যাতে জীবাত্মা ভোগ এবং অপবর্গ রূপ প্রয়োজনকে সিদ্ধ করতে পারে সেই জন্য করেছেন । এই সংসারে তিনটি পদার্থ রয়েছে ঈশ্বর , জীব ও প্রকৃতি । ঈশ্বর সকল কামনা হতে রহিত ; তাই তাঁর কাছে এই দৃশ্যের কোনো প্রয়োজন নাই । প্রকৃতি একটি জড়পদার্থ হওয়ায় সে নিজেকে স্বয়ং ভোগ করতে পারে না । কিন্তু জীবাত্মার নিজস্ব কোনো আনন্দ না থাকায় সে এই দৃশ্যকে ভোগ করে ।

সূত্রঃ যোগ দর্শন ভাষ্য- আচার্য কপিল আর্য ।

মহর্ষি ব্যাসদেব বলেছেন—

"ন কর্মাবিভাগাদিতি চেন্নান্যানাদিত্বাৎ; (ব্র০ সূ০ ২।১।৩৫)" অর্থাৎ জীবের কর্মপ্রবাহ অনাদি , যেহেতু জীবাত্মা স্বয়ং অনাদি । যদি প্রলয়কালে পরমাত্মা ভিন্ন জীব না থাকতেন , তবে মহর্ষি ব্যাস জীবের কর্মকে অনাদি বলতেন না । এই সৃষ্টিচক্রের কোন প্রারম্ভিক বিন্দু নেই । যদি অনাদি জীবের কোন শুরু বা জন্ম থাকতো , তখনই বলা যেতো জীবাত্মা উৎপন্ন হবার পর থেকে শুভ-অশুভ কর্ম করে , তারপর থেকে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নানা যোনিতে ভ্রমণ করছে । কিন্তু এই সৃষ্টি ও প্রলয়রূপী চক্রের কোন Starting point নেই । অনাদিকাল থেকেই অনাদি জীবগণ কর্ম করেই আসছে , সেই অনুযায়ীই তারা মনুষ্য , পশু, কীটাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করছে ।

আর , যদি সৃষ্টিচক্রের কোন প্রারম্ভিক বিন্দু থাকতো , মানে একদম প্রথম সৃষ্টি বলে কিছু থাকতো , তাহলে ঈশ্বরের ওপর এই দোষ আরোপ হতো– কেন তিনি প্রথম কল্পের সৃষ্টিতে কোন জীবাত্মাকে মনুষ্যদেহ দিলেন এবং কোন জীবাত্মাকে পশুদেহ অথবা কীটপতঙ্গের দেহ দিলেন ? কোন পাপের ফলে , কী দোষে ওই আত্মাগুলো নিম্নযোনির দেহ লাভ করলো ? তাহলে ঈশ্বর অন্যায়কারী ও পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়তেন ।

ঋগ্বেদ: ১/১৬৪/২০ ঋগ্বেদ: ১০/৮২/৬ যজু: ১৭/৩১ যজু: ১১/৪ ঋগ্বেদ: ৭/৩২/২৬ সামবেদ: পূর্বাচিক: ৩/২/৭ অথর্ববেদ: ২০/৭৯/১ ঋগ্বেদ: ১/৫৭/৪ অথর্ববেদ: ২০/১৫/৪ যর্জুবেদ: ৩২/১৫ ঋগ্বেদ: ৮/১৩/৯ যজু: ৩১/১৫ ঋগ্বেদ: ৮/৯৬/৬ অথর্ব: ১০/৭/১ যজু: ৪/৪০ যজু: ৪০/৪ অথর্ব: ১০/৮/১২ যজু: ৩২/৮ অথর্ব: ১০/৮/১২ অথর্ব: ১০/৮/৪০ অথর্ব:১০/২১/১ অথর্ব:১০/৪/১ ঋগ্বেদ: ১০/৯০/২ ঋগ্বেদ: ১০/৮২/৩ , ৬/৯/৩) ঋগ্বেদ: ১/১৬৪/৬ , ১০/১৬৪/৩৭ , ১০/৭৯/৬ ঋগ্বেদ: ৫/৫১/১৬, ১০/৮২/৩ ঋগ্বেদ: ১০/১৮/৩ , ১০/৩৬/৮ ঋগ্বেদ: ১০/৮২/৭ অথর্ববেদ: ২/৩৬/৩ যজুর্বেদ: ৩৮/২০ ঋগ্বেদ: ১/১/৯ ঋগ্বেদ: ১/১০/৬ যজু: ৩২/৩ অথর্ব: ৯/৯/২০

ততঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্। মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীৎ তমোনুদঃ।। (মনু. ১/৬) যোহসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোহব্যক্তঃ সনাতনঃ। সর্বভূতময়োহচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ।। (মনু. ১/৭)সোহভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ। (১/৮)স্বানি স্বান্যভিপদ্যন্তে তথা কর্মাণি দেহিনঃ।। (১/৩০)কর্মণাঞ্চ বিবেকার্থং ধর্মাধর্মৌ ব্যবেচয়ৎ। দ্বন্দ্বৈরযোজয়চ্চেমাঃ সুখদুঃখাদিভিঃ প্রজাঃ।। (মনু. ১/২৬)মনু. (১/৩৭-৪০) তথা ৪৩-৪৬স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি।। (মনু. ২/৮২)আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ।। (মনু. ১/৫) ইন্দংজগৎ তমোভূতং তমসি স্থিতং লীনমাসীৎ । তমঃ শব্দেন গুণবত্যা প্রকৃতিনির্দিশ্যতে।।কুল্লূকভট্টভাষ্য, মনু. পৃ. ৪ মনু. ২/৬তভোনুদঃ প্রকৃতিপ্ররেকঃ।। (কুল্লূকভট্টভাষ্য, পৃ. ৬)দেখিয়ে - মণিপ্রভা হিন্দী ভাষ্য, পৃ. ৩ দেখুন --- (মনু. ১/৮)য়তকারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্। তদ্বিসৃষ্টং স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্যতে।। (মনু. ১/১)ব্রহ্মপুরাণ (১/৩৩) । বিষ্ণুপুরাণ (১/২/১৯-২০)। কূর্মপুরাণ পূর্বার্দ্ধ ৪/৬)] ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষ কর্তাফল্যদর্শনাত্।। (ন্যায়. ৪/১/১৬) পুরুষোহয়ংসমীহপানাং নাবশ্যং সমীহাফলমাপ্মোতি তেনানুমীয়তে পরাধীনং পুরুষস্য কষেফলারাধনমিতি। যদধীনং স ঈশ্বরঃ।। তস্মাদীশ্বরঃ কারণমিতি।। --(বাৎস্যায়নভাষ্য, ন্যায়. পৃষ্ঠা- ২৬০)

গুণবিশিষ্টমাত্মান্তরমীশ্বর।। (ন্যায়. পৃ.- ২৬২)
গুণৈনিত্যজ্ঞানেচ্ছাপ্রয়ত্নৈঃ সামান্যগুণৈশ্চ সংয়োগাদিভির্বিশিষ্টমান্ত রং জীবেভ্যো ভিন্ন আত্মাজগদারাভ্যঃ সৃষ্টি কর্তা বেদদ্বারাহিতাহিতোপদেশকোজ-গতঃ পিতেতি।।
(বাৎস্যায়নভাষ্য, ন্যায়. পৃ. ২৬২)
ইচ্ছাদ্বেষপ্রয়ত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনো লিগমিতি।। (ন্যায়. ১/১/১০) ন্যায়. ৩/১/১, ৩/১/২৫
দর্শনস্পর্শনাভ্যামে--র্থ গ্রহণাত্।। (ন্যায়.৩/১/১)
শরীরদাহে পাতকাভাবাত্।। (ন্যায়. ১/১/৪)
ন, কার্যাশ্র্যকৃর্তৃবধাত্।। (ন্যায়. ১/১/৬)
পূর্বাভ্যস্তস্মৃত্যনু বন্ধাজ্জাতস্য হর্ষভয়শোকসংপ্রতিপত্তেঃ।। (ন্যায়. ৩/১/১৬)
প্রেত্যাহারাভ্যাসকৃতাৎস্তন্যাভিলাষাত্।।
(ন্যায়. ১/১/২২)পরং বা ক্রুটেঃ।। (ন্যায়. ৪/২/১৫)
অস্পর্শত্বাত্।। (ন্যায়. ২/২/২২) ন কর্মানিত্যত্বাত্।। (ন্যায়. ২/২/২৩)নাণুনিত্যত্বাত্।।
(ন্যায়. ২/২/২৪)
ন বিনষ্টেম্যো নিষ্পতেঃ।। (ন্যায়. ৩/২/১৭)
ন বিমষ্টাদ্বীজাদংকুর উৎপদ্যত ইতি্ তস্মান্নাভাবাদভাবোত্ভাবোৎপত্তিরিতি।। (ন্যায়. বাৎস্যায়ন ভাষ্য, পৃ০ ৪/২/১৪)
ক্রমনির্দশাদত্রতিষেধঃ।। (ন্যায়. ৩/২/১৮) ন প্রলয়োহণুমদভাবাত্।। (ন্যায়. ৪/২/১৪)
ভাই পরমানন্দ, মেরে অন্ত সময় কা আশ্রয়, পৃ, ৫০।।
যোগ. (১/২৬) প্রণিধাতাত্ভক্তিবিশেষাত্।। (যোগ, ব্যাসভাষ্য, পৃষ্ঠা ৫৮)তত্র ভক্তি বিলেষো বিশিষ্টমুপাসনং সর্ব ক্রিয়াণাং তত্রার্পণম্।।

যোগ. ১/২৪ পুরুষবিশেষঃ অন্যেভ্যঃ পুরুষেভ্য বিশিষ্যত ইতি বিশেষঃ। দেখিয়ে ভোজবৃত্তি, (যোগ.পৃ. ৬৩) যোগ০ (১/২৫) কশ্চিত্ কশ্চিদেবাতীতাদি গৃহ্ণাতি কশ্চিদবহুতরং, কশ্চিত্ বহুতমমতি গ্রাহ্যাপেক্ষয়া গ্রহণে হ স্যাল্পতত্বং বহুত্বং কৃতম্--- এতদ্বিবর্ধমানং যত্র নিষ্কান্তমতিশয়াত্ স সর্বজ্ঞ ইতি।। (বাচস্পতিমিশ্র টীকা. যোগ., পৃ. ৩৭)যত্রকাষ্ঠাপ্রাপ্তির্জ্ঞানস্য স সর্বজ্ঞঃ।। (ব্যাসভাষ্য)যোগ. ১/২৫ তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ।। যোগ. ১/২৭ইৎথমুক্ত স্বরূপস্যেশ্বরস্য বাচকোভিধায়কঃ প্রকর্ষেণ নুয়তে স্তুয়তে অনেনেতি নীতি স্তৌতি বা প্রণব ওঙ্কারঃ, তয়োশ্ব বাচ্যবাচক ভাবলক্ষণ সম্বোন্ধ নিত্যঃ ।। ভোজবৃত্তি, পৃ. ৭৩ যোগ. ১/১৮ প্রণবস্য জপঃ প্রণবাভিবেদ্যস্য চেশ্বরস্য ভাবনম্ । তদস্য যোগিনঃ প্রণবং জপতঃ প্রণবার্থ চ ভাবয়তশ্চিত্তমে কাংগ্রসম্পদ্যতে ।। যোগ. ব্যাসভাষ্য. পৃ. ৭৩ । তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়া যোগঃ । ২/১।। তথা সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাত্ ।। ২/৪৫ ।

অর্থ প্রধানপুরুষব্যতিরিক্তঃ কোয়মীশ্বরোনামিতি ।। ব্যাস ভাষ্য, পৃ.৫৮
।। যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেককখ্যাতেঃ ।। ২/২৮
যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যহারধারণাধ্যান সমাধয়োষ্টাংগানি ।। ২/২৯।।
যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ।। যোগ. ১/১ যোগ. ১/২ সত্যার্থ প্রকাশ: নবম সমুল্লাস
স্বরূপ প্রতিষ্ঠা তদানী চিতশক্তির্য়থা কৈবল্যে, ব্যাস ভাষ্য: পৃ. ১১। তথা দ্রষ্টুঃ
পুরুষস্য তস্মিনকালে স্বরুপে চিন্মাত্রতায়ামবস্থানং স্থিতির্ভবতি -- ভোজবৃত্তি
বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র ।। যোগ. ১/৪ দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণাস্য বশীকার সঙ্গা বৈরাগ্যম্
।। ১/১৫যোগ. ১/১৬ দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়দোষ দর্শীবিরক্তঃ পুরুষদর্শনাভ্যাসাত্তচ্ছুদ্ধিপ্র-
বিবেকাপ্যায়িত বুদ্ধিগুণেভ্যো ব্যক্তাব্যক্ত ধর্মকেভ্যো বিরক্তইতি ।। যোগ.
ব্যাসভাষ্য. পৃ. ৩৭ অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ ।। যোগ. ২/৩
সতিমুলেতদ্বিপাকোজাত্যায়ুর্ভোগঃ । যোগ. ২/১৩ তদাজ্ঞাতশ্চিত্তবৃত্তয়স্তৎপ্রভোঃ
পুরুষস্যাপরিণামিত্বাত্ ।। যোগ. ৪/১৮ যোগ. ১/৪৫ অতঃ প্রধানে সৌক্ষ্ম্যং নিরতিশয়ং
ব্যাখ্যাতম্ ।

যোগ. ব্যাসভাষ্য. পৃ. ১১৫ লয়ং গচ্ছতি তল্লিঙ্গ ন লয়ং গচ্ছতি তদলিঙ্গম্ ন ক্বেচিল্লীয়তে - ইত্যলিঙ্গ প্রধানং তৎপর্যন্তং সূক্ষ্মবিষয়ত্বম্ ।। ভোজ বৃত্তি, পৃ. ১১৬ অলিঙ্গম্ প্রধানং তদ্ধি ন ক্বেচিল্লয়ং গচ্ছতি । বাচস্পতি মিশ্রটীকা । পৃ. ৬২ যোগ. ২/১৯ গুণাংনাং পর্বাণ্যবস্থাবিশেষাশ্চত্বারো জ্ঞাতব্যা ইত্যুপদিষ্টং ভবতি । বিশেষা মহাভুতেন্দ্রিয়াণি অবিশেষাস্তন্মাত্রান্তঃ করণানি, লিঙ্গমাত্রং বুদ্ধিঃ অলিঙ্গমব্যমিত্যুক্তম্ ।। ভোজ বৃত্তি, পৃ. ১৬৪ সাংখ্য যোগৌপৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ । এক মব্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োবিন্দতে ফলম্ । গীতা. ৫/৪ যত্যাংখ্যৈঃ প্রাব্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে ।। ৫/৫ পরমর্ষিকপিলঃ সাংখ্য বিদ্যায়াস্তদনুগত যোগবিদ্যাশ্চআদিম প্রবক্তেতি শিষ্টপরম্পরা সপ্রসিদ্ধিঃ । সম্পাদক শ্রীরামশঙ্কর ভট্টাচার্য. যোগের ভূমিকা. পৃ.
অতঃ সাংখ্যযোগৌ পরস্পরপুরকাবিতি কথয়িতুং শক্যতে ।। পৃ. ২

ন্যায় দর্শনে ত্রৈতবাদের বিবেচনে যেটা নিষ্কর্ষ হয় যে , ন্যায় দর্শন অনুসারে ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা । তিনি পরমাণু থেকে যা নিত্য মূল উপাদান , তা থেকে সৃষ্টি করেন অতএব তিনি সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ । তিনিই জীবের কর্মফল প্রদান করেন । তিনি জীবাত্মা থেকে ভিন্ন । জীবাত্মা শরীর এবং ইন্দ্রিয় থেকে ভিন্ন চেতন সত্ত্বা । দেহান্তের সময় যার মৃত্যু হয় না । নিজের কর্মের দ্বারা নতুন শরীর ধারণ করে অতএব জীবাত্মা নিত্য । ঈশ্বর, জীবাত্মা , পরমাণু এই তিনটি স্বতন্ত্র স্বত্তা তথা পরস্পর ভিন্ন । ঈশ্বর , জীব এবং মূল উপাদান পরমাণুকে নিত্য মানার কারণে ন্যায় দর্শনে ত্রৈতবাদের সত্ত্বা বিদ্যমান ।

যোগ দর্শনেও সৎকার্যবাদকে সিদ্ধান্ত হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়েছে । প্রলয়কালে সম্পূর্ণ জগৎ প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায় । পরন্তু প্রকৃতির কোনো উপাদান কারণ নাই অতএব কোনো প্রকার উপাদান কারণে লীন হয় না । অতএব প্রকৃতিকে এই সূত্রগুলোতে অলিঙ্গ বলা হয়েছে । যোগ দর্শনে ঈশ্বর বিষয়ক মান্যতা বেদানুকূল আস্তিক পরম্পরা দ্বারা সম্বন্ধ রাখে । ভিত্তিহীন অবৈদিক অদ্বৈতপ্রতিপাদিত ঈশ্বরের কোনো সংকেতই নাই । ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ , অতএব অবিদ্যা রহিত স্বীকার করো্া হয়েছে । সেই ঈশ্বর জীবাত্মার জন্য অর্থ সহিত জপ এবং ধ্যান করার যোগ্য তাঁর প্রণব বাচক ও৩ম্ শব্দ দিয়েছেন । এখানে পুরুষ শব্দ শুধুমাত্র জীবাত্মার জন্য প্রযুক্ত হয়েছে । জীবাত্মা শরীরী, অবিদ্যাগ্রস্থ এবং কর্মফলের চক্রে আবদ্ধ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে । সমাধি দ্বারা জীবাত্মা কৈবল্যকে প্রাপ্ত করে । প্রকৃতি নিত্য তথা পরিণামবালী । প্রকৃতি স্বয়ং কার্য জগতের উপাদান কারণ । প্রকৃতির কোনো উপাদান কারণ নাই । ঈশ্বর , জীব এবং প্রকৃতি এই তিন সত্তা স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে যোগ দর্শনে প্রতিষ্ঠিতেঁদঁনদরঁ হয়েছে। অতএব ,এখানে স্পষ্টভাবে ত্রৈতবাদের পরম্পরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সাংখ্যে ঈশ্বর সত্তাকে স্বীকার করা হয়েছে এবং সেই সর্বোচ্চ সত্তাকে বুঝাতে ঈশ্বর শব্দের প্রয়োগ হয়েছে । সাংখ্যে জীবাত্মাকে বুঝাতে পুরুষ শব্দের প্রয়োগ হয়েছে । সাংখ্যে পরিণামিনী প্রকৃতির বর্ণনা রয়েছে । সাংখ্যে জীবাত্মার বন্ধন হিসেবে প্রকৃতিকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে এবং এর হেতু অবিদ্যাকে বলা হয়েছে । জ্ঞান দ্বারা মুক্তির মান্যতা দেওয়া হয়েছে । সাংখ্যে কৈবল্য মুক্তির বর্ণনা রয়েছে । সাংখ্যে চেতন তত্ত্বকে অপরিণামী বলা হয়েছে ।

ঈশ্বরের কি পরিবর্তন হয় ?

পরমাত্মা:

পরমাত্মা,চিরন্তন,শাশ্বত,নিত্য,শুদ্ধ,চৈতন্য,স্বয়ম্ভু,নিরাকার,সর্বব্যাপি,জগতের,অধিপতি, জন্মরহিত,মৃত্যুরহিত,হিংসারহিত,দুঃখরহিত,কামনা-বাসনা শূন্য, আনন্দস্বরুপ, যিনি সৃষ্টিকর্তা,ধংসকর্তা এবং কর্মফল প্রদাতা,সর্বজ্ঞানী, এবং সর্বশক্তিমান।এই মহাবিশ্বে এমন কোন স্থান শূন্য নেই যেখানে তিনি নেই। সমগ্র জগৎকে যিনি ধারণ করেন এবং বারংবার রচনা করেন। তার সৃষ্টির এই সমগ্র জগৎ এ তার প্রকাশ বিদ্যমান। পরমাত্মার মূল নাম ওঁ বা ওঙ্কার। এছাড়াও তার আছে অগণিত নাম।

জীবাত্মা:

পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মাও অনাদি, চিরন্তন। পরমাত্মা,এবং জীবাত্মার, উভয়ের কোনো আদি এবং অন্ত নেই, সৃষ্টি এবং ধংস নেই। পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার তুলনা করলে দেখা যায়, জীবাত্মা অসংখ্য কিন্তু পরমাত্মা এক এবং অদ্বিতীয়,, পরমাত্মা সর্বজ্ঞানী কিন্তু জীবাত্মা নির্দিষ্ট জ্ঞানে সীমাবদ্ধ,, পরমাত্মা সর্বত্রই বিরাজিত আর জীবাত্মা শুধুমাত্র চেতন দেহে বিরাজিত,, পরমাত্মা সর্বশক্তিমান আর জীবাত্মার শক্তি সীমিত। ঋগ্বেদে একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে যে একটি বৃক্ষে দুইটি পক্ষী অবস্থান করেছে। বৃক্ষটি জগৎ এবং দুইটি পক্ষীর একটি জীব(জীবাত্মা), অন্যটি ব্রহ্ম(পরমাত্মা)। প্রকৃতি, জীব ও ব্রহ্ম এরা অনাদি। জীবাত্মা সংসারে পাপ পূণ্যের ফলভোগ করেন এবং পরমাত্মা ফল ভোগ না করিয়া সাক্ষী রূপে বর্ত্তমান থাকেন। আমাদের দেহের চেতন গুণকেই জীবাত্মা বলা হয়। এই জীবাত্মার দ্বারাই আমারা সুখ, দুঃখ এবং আনন্দ ভোগ করি। যতক্ষন এই দেহের মধ্যে জীবাত্মা বিদ্যমান ততক্ষন আমরা জীবিত থাকি। শরীর এবং জীবাত্মার বিয়োগ হলে শরীর অচল(মৃত,জড়) হয়ে যায়। কর্ম অনুযায়ী এই জীবাত্মা এক শরীর থেকে অন্য শরীরে বিচরণ করে কর্মের ফল ভোগ করে।জীবাত্মার কোনো লিঙ্গ বিশেষ নেই তিনি যখন যেরুপ দেহে আরোহণ করেন সেই রুপেই আবদ্ধ হয়ে যান।

ন্যায় সূত্র অনুযায়ী আত্মার বৈশিষ্ট হল -

কোনো কিছু অর্জন করার ইচ্ছা , কোনো কিছু থেকে অপছন্দ (দ্বেষ) , চেষ্টা করার ইচ্ছা (প্রযত্ন) , সুখ অনুভব করা ,দুঃখ অনুভব করা , জ্ঞান আছে ।

বৈশেষিক ৩/২/৪ সূত্র অনুসারে যখন আত্মা মরণশীল শরীরে থাকে তখন আত্মার বিস্তারিত বৈশিষ্ট গুলি হল -

শ্বাস গ্রহণ , শ্বাস ত্যাগ , সংকোচন , শিথিলকরণ , মন এবং আত্মবোধ , চলাচল , ইন্দ্রিয় এবং কাজ করার অঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ , রূপান্তর । আত্মা যখন একটি শরীরের মধ্যে থাকে , এই বৈশিষ্ট গুলি উদ্ভাসিত হয় ।যখন এটি শরীর ছেড়ে যায় , এই বৈশিষ্ট গুলি আর উপস্থিত থাকে না । এই সকল বিষয় গুলো থেকে জ্ঞানীগণ আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন ।

প্রকৃতি:

ঈশ্বরের ন্যায় প্রকৃতিও অনাদি, চিরন্তন। প্রকৃতির সৃষ্টি হয়না এবং ধংস ও হয়না। ঈশ্বর এবং জীবাত্মা ছাড়া এই মহাবিশ্বে যা কিছু বিদ্যমান তা সব মিলিয়েই প্রকৃতি। ঈশ্বর এই প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করেন। তিনি এই জগৎকে এবং জগৎ এর নিয়ম কে প্রকৃতির দ্বারাই গঠন করেছেন। তাই এই প্রকৃতি জগৎ এর উপাদান কারন এবং ঈশ্বর নিমিত্ত কারন। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই অব্যাক্ত প্রকৃতি হতে জগৎ কে বার বার রচনা করেন। যখন জগৎ ধ্বংস হয়ে যায় তখন প্রকৃতি পুনরায় এমন এক অবস্থায় চলে যায় যখন সেখানে অন্য কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকেনা। সেই প্রকৃতি হতেই ঈশ্বর নিজ সামর্থ্য দ্বারা জগৎকে পুনরায় রচনা করে থাকেন। স্বত্তঃ, রজঃ এবং তমঃ গুণের সমন্বয় দ্বারা সমস্তকিছুই আচ্ছাদিত হয়ে থাকে আর এই মেলবন্ধন কে প্রকৃতির নিয়ম বলা হয়ে থাকে। প্রকৃতি নিজে থেকেই কিছু করতে পারার সামর্থ্য রাখে না, ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় প্রকৃতি হতে সমস্তকিছু প্রকটিত হয় এবং পরবর্তীতে প্রকৃতির নিয়মেই এই জগৎ চালিত হয়, প্রকৃতির নিয়মেই এই জগৎ সৃষ্টি এবং ধংস হয়। মহাবিশ্বে এই অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তন প্রকৃতির চিরন্তন আইন।

এষা সনত্নী সনমেব জাতৈষা পুরাণী পরি সর্বং বভূব। মহী দেব্যু ষসো
বিভাতী সৈকেনৈকেন মিষতা বিচষ্টে।।

[অর্থববেদ, ১০/৮/৩০]

এই নিত্যাপ্রকৃতি সর্বদায় পরিণাম যুক্তা,পুরাতন, নব নব রূপ ধারিণী এবং সর্বকার্য্যে কারণরূপে বিরাজমানা। প্রত্যেক গতিশীল জীবের সঙ্গেই এই প্রকৃতি নিজের স্বরূপ ও সত্ত্বা প্রকাশ করিতেছে।

কিন্তু প্রকৃতি অনাদি অর্থাৎ,যেমন ঈশ্বর অনাদি কিন্তু ঈশ্বর প্রকৃতি হতে ভিন্ন! ঈশ্বর ও জীবাত্মা অনাদি । কর্মফল ও পূর্বকল্প অনুযায়ীই জীব দেহধারণ করেন ।
ঈশ্বর সর্বশক্তিমান । তিনি নিজে আনন্দ ও রসস্বরূপ । তাঁর নিজস্ব কোন কামনা বা ইচ্ছা নেই । তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ । এজন্য বলা হয়েছে তিনি 'অকামো ধীরো অমৃতঃ স্বয়ম্ভু রসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চনোনঃ - অথর্ববেদ ১০.৮.৪৪ ' । তথাপি জীবাত্মা যেহেতু তাঁর সাথেই অনাদি ও তিনি তাদের পালক রক্ষক ও কর্মফল বিধাতা তাই তিনি জীবাত্মাদের সখাত্ব ও তাদের মোক্ষপথে ধাবিত ইচ্ছা করেন । এটা পরমেশ্বরের কোন দুর্বলতা নয় । বরং আমাদের উন্নতি ও মঙ্গল কল্পেই তিনি তা করেন ।

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা ।অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্তা ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ।। ৯ ।।

সরলার্থঃ সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম এবং অজ্ঞ জীব— এই উভয়েই অনাদি। এদের মধ্যে সর্বস্বামী ব্রহ্ম অনন্ত সামর্থ্যবান, কিন্তু জীব অসমর্থ। তৃতীয় নিশ্চিতরূপে এক অজন্মা প্রকৃতি, ভোক্তা জীবের ভোগের সামগ্রীযুক্ত। সেই অনন্ত পরমাত্মা, বিশ্বরূপ অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বই সর্বব্যাপক পরমেশ্বরের অবয়ব স্বরূপ এবং নিশ্চিতরূপে তিনি কর্ম ও কর্মফলের বন্ধনে লিপ্ত হন না। যখন মানুষ, উক্ত (ব্রহ্ম, জীব এবং প্রকৃতি) তিন সত্তাকে যথার্থভাবে জানেন, তখন তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়ে মোক্ষসুখ ভোগ করেন ।। ৯ ।।(শেতাশ্বতর উপনিষদ)

ঈশ্বর যেমন অনাদি, জীবাত্মাও তেমন অনাদি। যা অনাদি, তার কখনও সৃষ্টি হয় না৷ যেহেতু জীবও অনাদি ও তাদের কর্মও আনাদি, ফলে অনাদি কাল থেকে জীব কর্ম করে আসছে। আর সেই কর্মের ফল প্রদানের জন্যই ঈশ্বর জীবাত্মাকে জীব দেহ প্রদান করেন।

এতজ্ জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থম্ নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ ।ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ।। ১২।।

সরলার্থঃ এই ব্রহ্মকে সর্বদাই আত্মায় স্থিত বলে জানা উচিত, নিশ্চিতরূপে এর থেকে শ্রেষ্ঠ কোন কিছুই জানার যোগ্য নেই। সুখ-দুঃখ ভোগকারী জীবাত্মা, ভোগ্য প্রকৃতি এবং প্রেরক পরমাত্মা—জ্ঞানীগণের দ্বারা কথিত এই ত্রিবিধ অনাদি তত্ত্বকে (ব্রহ্ম, জীব এবং প্রকৃতিকে) সর্বপ্রকারে জেনে, জীব এই ব্রহ্মকে লাভ করেন ।। ১২ ।।(শেতাশ্বতর উপনিষদ)

ঈশ্বর যেমন অনাদি, জীবাত্মাও তেমন অনাদি। যা অনাদি, তার কখনও সৃষ্টি হয় না। যেহেতু জীবও অনাদি ও তাদের কর্মও আনাদি, ফলে অনাদি কাল থেকে জীব কর্ম করে আসছে। আর সেই কর্মের ফল প্রদানের জন্যই ঈশ্বর জীবাত্মাকে জীব দেহ প্রদান করেন।

তাহলে কি ঈশ্বর সাকার রুপ ধারণ করতে পাড়েন?

উত্তরঃ না পাড়ে না,কারণ।

অংগুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ। ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ। এতদ্বৈ তৎ ॥

[কঠোপনিষদ ২.১.১৩]

পদার্থঃ (অংগুষ্ঠমাত্রঃ) অঙ্গুষ্ঠমাত্র স্থানীয় (পুরুষঃ) পুরুষ (অধূমকঃ) ধূমরহিত (জ্যোতিঃ,ইব) জ্যোতির ন্যায় নির্ভ্রান্ত জ্ঞান-প্রকাশস্বরূপ (ভূতভবস্য) ভূত এবং ভবিষ্যতের (ঈশানঃ) স্বামী (সঃ এব) তিনিই (অদ্য) আজ যেমন রয়েছেন (শ্বঃ) আগামীকালও তেমনি থাকবেন (এতৎ, বৈ, তৎ) ইনিই সেই ব্রহ্ম।।

সরলার্থঃ অঙ্গুষ্ঠমাত্র স্থানীয় পুরুষ ধূমরহিত, জ্যোতির ন্যায় নির্ভ্রান্ত জ্ঞান-প্রকাশস্বরূপ, ভূত এবং ভবিষ্যতের স্বামী। তিনিই আজ যেমন রয়েছেন আগামীকালও তেমনি থাকবেন, ইনিই সেই ব্রহ্ম।। অর্থাৎ ঈশ্বররের কোনো পরিবর্তন হয় না।

ঈশ্বকে সচ্চিদানন্দ বলা হয় -

(টুনদি সমৃদ্ধৌ) আঙ্ পূর্বক এই ধাতু দ্বারা 'আনন্দ' শব্দ সিদ্ধ হয়। 'আনন্দন্তি সর্বে মুক্তা যস্মিন্, যদ্বা যঃ সর্বাঞ্জীবনানন্দযতি স আনন্দঃ' যিনি আনন্দ স্বরূপ, যাঁহাতে সকল মুক্ত জীব আনন্দ লাভ করে এবং যিনি সকল ধর্মাত্মা জীবকে আনন্দিত করেন, সেই কারণে সেই পরমেশ্বরের নাম ‘আনন্দ'। (অস ভুবি) এই ধাতু হইতে ‘সৎ' শব্দ সিদ্ধ হয়। 'যদস্তি ত্রিযু কালেষু ন ৰাধ্যতে তৎসদ্ ব্রহ্ম' যিনি সর্বদা বর্তমান, অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ এব বর্তমান কালে যাহার নাস্তিত্ব নাই, সেই কারণে সেই পরমেশ্বকে ‘সৎ' বলা হয়। (চিতী সংজ্ঞানে) এই ধাতু হইতে ‘চিৎ' শব্দ সিদ্ধ হয়। 'যশ্চেততি চেতষতি-সংজ্ঞাপযতি সর্বান্ সজ্জনান্ যোগিনস্তচ্চিৎ পরং ব্রহ্ম' যিনি চেতনা স্বরূপ, সকল জীবকে চেতনা যুক্ত করেন। এবং যিনি সত্যাসত্যের জ্ঞাপয়িতা, সেই পরমেশ্বরের নাম “চিৎ”।

এই তিন শব্দের বিশেষণে পরমেশ্বরকে 'সচ্চিদানন্দ স্বরূপ' বলে।।

সচ্চিদানন্দ শব্দে তিনটি পদ আছে। সৎ-চিৎ-আনন্দ। সৎ অর্থাৎ ভূত-ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান। তিন কালেই যে এক রস হয়ে বিদ্যমান থাকে। আর এক কথায় বলা হয়, যাতে কোন প্রকার পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়, তাকে বলা হয় সৎ। যে জ্ঞান যুক্ত সে চিৎ, আর ত্রিকালে যাতে দুঃখের অত্যন্ত অভাব সে আনন্দ। ঈশ্বর এই কারনেই সচ্চিদানন্দ। যেহেতু ঈশ্বরের কখনো পরিবর্তন হয় না, তার জ্ঞান কখনো নষ্ট হয় না, আর তাতে কখনো দুঃখ ব্যপ্ত হয় না। তাই ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ। জগতে যত সাকার পদার্থ দৃষ্ট হয়, সেই সমস্ত পদার্থে পরিবর্তন দেখা যায়, তাই তারা সৎ নয়। চিৎ কেবল নিরাকার আত্মা এবং পরমাত্মা উভয়েই পাওয়া যায়। কোন সাকার বা দেহধারী দুঃখের হাত হতে রেহাই পেতে পারে না। ত্রিকালে তাতে আনন্দও থাকতে পারে না।

শীত,গ্রীষ্ম, খুধা, তৃষ্ণা, ভয়, রোগ, শোক, বৃদ্ধত্ব মৃত্যু প্রভৃতি প্রত্যেক সাকার বা দেহধারীকে গ্রাস করে দুঃখ দেয়। ঈশ্বর সর্বদা এই সমস্ত হতে পৃথক। অতএব ঈশ্বরকে সাকার স্বীকার করলে তাকে দোষ স্পর্শ করবে, সে অবস্থায় ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ এবং নির্বিকার হতে পারবেন না। কেননা প্রত্যেক সাকার পদার্থে জন্ম, বৃদ্ধি, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি বিকার দোষ থাকে।

ঈশ্বরকে সাকার স্বীকার করলে তিনি সর্বব্যাপক হতে পারবেন না। কেননা প্রত্যেক সাকার পদার্থ একদেশী অর্থাৎ এক স্থানে স্থিতিশীল।

ঈশ্বর অনাদি অনন্ত হতে পারবেন না। কেননা প্রত্যেক সাকার বা অবয়বী বা দেহধারী উৎপন্ন হয়ে থাকে। যে বস্তুর আরম্ভ আছে অর্থাৎ সে সাদি। এই অবস্থায় ঈশ্বরের অনাদিত্ব গুণের অভাব হবে। ঈশ্বর অনাদি হতে পারবেন না, অনন্তও হতে পারবেন না। যার আদি আছে তার অন্তও অবশ্যই আছে। যার উৎপত্তি আছে তার বিনাশও আছে। যে নদীর এক পাড় থাকে তার অপর পাড়ও থাকে। ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব গুণের অভাব হবে। কেননা যদি ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ স্বীকার করা যায়, তাহলে ঈশ্বর সাকার হওয়ায়, একদেশে অবস্থিতির কারণে, সর্বত্র বিদ্যমান থাকা সম্ভব হবে না। যদি ঈশ্বর সর্বত্র না থাকেন তাহলে তার মধ্যে সব স্থানের জ্ঞান থাকাও সম্ভব হবে না, তার জ্ঞান এক স্থানেরই হবে। ঈশ্বর যে দেশে বা যে স্থানে থাকবেন তার সেই দেশের বা সেই স্থানের জ্ঞানই হবে। পরিণাম- ঈশ্বর অন্তর্যামী ও হতে পারবেন না। কেননা তিনি প্রত্যেকের মনের কথা জানতে পারবেন না।

ঈশ্বরের নিত্যত্ব গুণের অভাব হবে। ঈশ্বর অনিত্য হয়ে যাবেন। সেই নিত্য যার অস্তিত্ব থাকবে অথচ কোনও কারণ থাকবে না। সে কোন পদার্থের সংযোগ দ্বারা উৎপন্নও হবে না। কেননা যে সাকার, সে বস্তু তত্ত্বের মিশ্রণে বা যোগে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

পরমাত্মা সর্বাধার গুন রহিত হবেন। তিনি সর্বাধার না হয়ে অপরাধার হয়ে যাবেন। পরমাত্মা সর্বাধার কেন জানো? কেননা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার আশ্রয়ে থেকে গতিশীল। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে তিনি ধারণ করে আছেন। যদি পরমাত্মাকে সাকার স্বীকার করা যায়, তাহলে তিনি কারও আশ্রয়ে থাকবেন। এই কারণেই তো মত মতান্তরবাদীর দল ঈশ্বরকে সাকার করে। তার আশ্রয়স্থল তৈরি করে রেখেছে। কেহ সপ্তলোক, কেহ চতুর্থলোক, কেহ বা গোলক, আবার কেহ বা বৈকুন্ঠ প্রভৃতি স্থান স্থির করে রেখেছে। যদি পরমেশ্বর নিজেই অপরের আশ্রিত হয়ে থাকেন তাহলে বলতো জগৎটা থাকবে কার আশ্রয়ে? জগৎ তখন যে নিরাশ্রয় হয়ে যাবে। ঈশ্বরকে সাকার স্বীকার করলে এমনি আরও অনেক দোষ ঈশ্বরে যুক্ত হবে।

সৎ-চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্ম, এবং জীব সৎ ও চিৎ, আর প্রকৃতি

[সৎ]

বেনস্তৎপশ্যন্নিহিতং গুহা সদ্যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীডম্। তস্মিন্নিদং সং চ বিচৈতি সর্বং স ওতঃ প্রোতশ্চ বিভূঃ প্রজাসু।।

[যজুর্বেদ, ৩২/৮]

বঙ্গানুবাদঃ- যাহাতে সর্বজগৎ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে সেই বুদ্ধিগম্য চেতন ব্রহ্মকে মেধাবী পুরুষ জ্ঞান দৃষ্টিতে দর্শন করেন। সর্ব্ব জগৎ প্রলয়কালে তাঁহাতে সূক্ষ্মরূপে মিলিত হয় এবং উৎপত্তিকালে পৃথক স্থুলরুপে পরিণত হয়। সেই সত্যস্বরুপ পরমাত্মা জীব ও প্রকৃতিতে ওতঃপ্রোতঃ ভাবে ব্যপক রহিয়াছেন।

[চিৎ]

নিকাব্যা বেধসঃ শশ্বতস্কর্হস্তে দধানো নর্য্যা পুরূনি। অগ্নির্ভূবদ্রয়ি পতী রয়ীনাং সত্রা চক্রাণো অমৃতানি বিশ্বা।।

[ঋগ্বেদ, ১/৭২/১]

অনুবাদঃ— যে বিদ্বান, পুরুষ, সর্ববিদ্যার ধারণকর্তা অনাদি স্বরুপ পরমেশ্বর কৃর্তৃক প্রকাশিত, নানাবিধ সত্যার্থের প্রকাশক, মোক্ষদাতা ও মনুষ্যের সুখের মূল জ্ঞানরাশিকে প্রত্যক্ষ পদার্থের ন্যায় হস্তে ধারণ করিয়া কৃত ধর্মাচরণকে নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ করেন তিনি অনন্ত বিদ্যাধনৈশ্বর্য্যকে রক্ষা করেন এবং অনন্ত শোভা সৌন্দর্য্যকে ধারণ করেন।

[আনন্দ]

আনন্দা মোদা প্রমুদোহভীমোদ মুদশ্চ যে। উচ্ছিষ্টাজ্জঞ্জিরে সর্বে দিবিদেবা দিবিশ্রিত।।

[অথর্ববেদ, ১১/৭/২৬]

অনুবাদঃ— জীবাত্মার মোক্ষ-সুখ, বিষয়-সুখ, পরমানন্দ এবং জ্ঞানাশ্রিত আনন্দ—এ সকল পরমাত্মা হইতেই নিঃসৃত হয়।

আনন্দ- কস্ত্বা সত্যো মদানাং ম হিষ্টো মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়া চিদারুজে বসু।।

[যজুর্বেদ, ৩৬/৫]

অনুবাদঃ— হে মনুষ্য! আনন্দসমূহের মধ্যে যিনি সর্বমশ্রেষ্ঠ ও সুখ স্বরুপ, যিনি অবিনশ্বর, তিনি তোমাকে অন্নাদি পদার্থ দ্বারা আনন্দ দান করেন এবং দ্রোহশূন্য জীবকে শাশ্বত ধন প্রদান করেন।

সচ্চিদানন্দ (নিত্য + জ্ঞান + সুখপূর্ণ) (সৎ-চিৎ-আনন্দ)

পরমপুরুষ সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ জীবাত্মা সৎ-চিৎ-স্বরূপ প্রকৃতি সৎ স্বরূপ। আত্মাতে দুইগুণ সৎ-নাশ রহিত আর চিৎ-জ্ঞান সহিত। প্রকৃতিতে জ্ঞান এবং চেতনার অভাব পরমাত্মা সর্বব্যাপী, স্থির, সদামুক্ত, আনন্দস্বরূপ, সগুণ ও নির্গুণ এবং কেবল এক। পরমাত্মার সগুণ ভাবের প্রেরণা প্রকৃতির প্রকাশের কারণ এবং প্রকৃতি জীবের কর্মফলের যথাযথ বিধান করতে বাধ্য করে।

একদেশীয়, দেহান্তরের ফলে গতিশীল, কখনো বদ্ধ-কখনো মুক্ত, আত্মার সংখ্যা অগণিত, আত্মা সমগ্র প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রে অক্ষম কেবল দেহের চেতন ও জড় প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে চরমতর সাধনা-জ্ঞানের দ্বারা।

পরমাত্মাতে সমগ্র জগত অবস্থিত, তিনি নিত্য আনন্দময়, ইন্দ্রিয় আকর্ষের উর্ধ্বে। জীবাত্মা তে কেবল দেহ অবস্থিত, তিনি নিত্য আনন্দময় নন তাই আনন্দের জন্য মোক্ষতা চায়। জীবাত্মার সংস্পর্শে জাগ্রত ও স্বপ্ন,সুষুপ্তি অবস্থা রয়েছে তাই তিনি পরমাত্মার ন্যায় সদানন্দময় নন।

পরমাত্মা উপাস্য
জীবাত্মা উপাসক।

তাঁরা(পরমাত্মা-জীবাত্মা) অবিনাশী কারণ তাদের জন্ম মৃত্যু নেই তথা তথা বিকার নেই। তাই লীন মানে অস্তিত্বের বিনাশ নয়৷ তবে লীন অর্থ যদি অস্তিত্বের বিনাশহীন পরমাত্মায় যুক্ত অবস্থা হয় তবে তা সম্ভব।

সনাতনমেনমাহুরুতাদ্য স্যান্তনর্ণবঃ। অহোরাত্রো প্রজায়েতে অন্যো অন্যস্য রূপয়ো।।

[অথর্ববেদ ১০/৮/২৩]

পদার্থঃ (এনম) এই পরমাত্মাকে (সনাতনং আহুঃ) সনাতন বলা হয়, পরন্ত (উত অদ্য) ও তো আজই (পুনর্ণবঃ) ফিরে নতুনের নতুন হয়। যে ভাবে (অহোরাত্রো) দিন ও রাত (অন্যঃ অন্যস্য রূপয়োঃ) এক রূপ হতে অন্য রূপে রূপান্তরিত (প্রজায়েতে) উৎপন্ন হয়। দিন পর রাত এবং রাতের পর দিন হয় এ জন্য রাত দিন নতুন নতুন লাগে। এই প্রকার সনাতন হয়ে ও পরমাত্মা নবীন হতে নবীন। পরমাত্মা কখনও জীর্ন হয় না।

মহর্ষি পতঞ্জলি তার যোগদর্শনে বলছেন -

ক্লেশকর্মবিপাকশৈয়রপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ

[যোগদর্শন ১।২৪]

অর্থাৎ ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয় এই চারের সঙ্গে যার কোন সম্বন্ধ নেই যিনি সমস্ত পুরুষের মধ্যে উত্তম, তিনিই ঈশ্বর।

এখানে, ক্লেশঃ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ। কর্মঃ পূণ্য, পাপ, পূণ্যও পাপমিশ্রিত এবং পাপপূণ্যরহিত। বিপাকঃ কর্মফলের নাম বিপাক। আশয়ঃ যাবতীয় কর্ম সংস্কারের নাম আশয়।

এই চারের সাথে সমন্ধহীন উত্তম পুরুষই ঈশ্বর পদবাচ্য। এজন্যই ঈশ্বরকে "আনন্দময়" বলা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি কখনো দুঃখ, ক্লেশ, কর্মফল ভোগ করেন না। তিনি সর্বদা আনন্দময় স্বরূপে স্থিত। যদি এরূপ বলা হয় যে, ঈশ্বর পৃথিবীতে জন্মগ্রহন করেন তবে বলতে হবে তিনি তার আনন্দময় স্বরূপ থেকে বিচ্যুত হলেন। কারন জন্মগ্রহনকারীর গর্ভস্থ যন্ত্রনা, কর্মফল এবং ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করার প্রয়োজন পড়ে। যদি ঈশ্বর এক মুহুর্তের জন্যও তার আনন্দময় স্বরূপ থেকে বিচ্যুত হন। তবে তিনি ঈশ্বরের সংজ্ঞা কদাপি প্রাপ্ত হতে পারবেন না।

ওঙ্কারোপাসনা এবং মূর্তি আদি প্রতীকের উপাসনা

মূর্তিপূজা আর ওঙ্কারোপাসনা দুটো বিষয় কখনো সমান হতে পারে না। বেদে কোথাও মূর্তিপূজার বিধান নেই। মূর্তিপূজা তো বহুকাল পরে প্রচলিত হয়েছে। আজকাল যে যে প্রতীক বা মূর্তির পূজা করা হয়, সেগুলো অনেক আধুনিক কালের। ত্রিদেবের বর্ণনায় এগুলো বিস্তারিতভাবে লিখব, এখানে এতটুকুই জেনে রাখুন যে, ঋষিদের সিদ্ধান্ত বেদানুকূল। প্রসিদ্ধ উপনিষদগুলো বেদতত্ত্ববিৎ ঋষি প্রণীত।

এজন্য উপনিষদে বেদবিরুদ্ধ চর্চা নেই। এখন এই বিবাদকে ত্যাগ করে এ কথা বিচার করুন যে, যেভাবে প্রতিমায় ধ্যান হয়, সেভাবেই কি ওঙ্কারে ধ্যান করার তাৎপর্য হতে পারে ? এমন কখনো হতে পারে না, কেননা ওঙ্কার একটি শব্দ, শব্দের আর রূপ কী হবে! যদি বলেন, "যেভাবে আজকাল 'ওম্' শব্দকে লেখা হয়, সেরকমই এর আকার। আর সেই আকারকে ব্রহ্ম মেনে ধ্যান করতে হবে।" শুনুন! এতেও অনেক বড় বাধা সৃষ্টি হবে, কেননা যত প্রকারের লিপিসমূহ (বর্ণমালা) দেশে প্রচলিত রয়েছে, ঠিক তত প্রকারের ধ্যান হয়ে যাবে। ভারতবর্ষেই মুখ্য ও গৌণ ভেদে পঞ্চাশটি লিপির সন্ধান পাওয়া যায়, তত সংখ্যক উপায়ে "ওম্" শব্দ লিখা যাবে। আর তখন আপনার কথা অনুসারে তত প্রকারের ধ্যান হয়ে যাবে।

যদি বলেন যে, "এটিই আমাদের ইষ্ট, কেননা ভগবানের অনন্ত রূপ আছে, তাই অনন্ত প্রকারে তাঁর ধ্যান হবে, যেভাবে অনন্ত প্রকারের প্রতিমাতে তৎসদৃশ ধ্যান হয়। এতে কি এমন ক্ষতি হবে?" শুনুন, যদি উপনিষৎকার ঋষিগণের এরকম অভিপ্রায় হতো, তবে কমপক্ষে লিপির আকারের অনুকূল দুই-চারটি আকারের ধ্যানস্বরূপ অবশ্যই বলে যেতেন; কিন্তু তা বলেননি। এর থেকে বুঝা যায় যে, উপনিষদের তাৎপর্য আপনার কথার বিরুদ্ধ। সম্পূর্ণ উত্তর মীমাংসা যা 'বেদান্তদর্শন' নামে প্রসিদ্ধ, তাতে লক্ষ্য করুন। কখনো পরস্পর বিরোধী একাধিক গুণ বিষয়ে বলা হয়নি, আর না ব্রহ্মের কোনো আকার উপদিষ্ট হয়েছে।

এমনকি উপনিষদেও ওঙ্কারেরও কোনো রূপ বর্ণিত হয়নি। এজন্য আপনার কথাটি শাস্ত্র বিরুদ্ধ। আর দ্বিতীয় কথা এই যে, অক্ষরের কোনো আকার হয় না। কিন্তু বালকদের বোধের জন্য মনুষ্য বিবিধ লিপি কল্পিত করেছে। যদি লিপির অনুসারে ওঙ্কারের তত্তৎ রূপের ধ্যান করেন তবে আপনার ধ্যানও কল্পিত মাত্র হবে, এই কারণেও আপনার কথাটি ঠিক নয়।

যদি বলেন, "যেভাবে কল্পিত অক্ষরের দ্বারা সত্য জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, সেভাবেই কল্পিত আকারের দ্বারা সত্য ব্রহ্মকেও জানতে পারবে।" এই কথাও ঠিক নয়। দেখুন, অদৃশ্য বস্তুকে জানার জন্য শব্দ মধ্যস্থ (মাধ্যম) হয়, মূর্তি নয়। রামচন্দ্রের বর্ণনা শব্দের দ্বারা বাল্মীকি মুনি বলেছেন, মূর্তির দ্বারা নয়। যখন কেউ বাল্মীকিরামায়ণ অথবা তুলসীদাসকৃত রামায়ণের শব্দকে পাঠ করে তখন তার মন গদগদ্ (প্রসন্ন) হয়ে যায়। রামচন্দ্রের সম্পূর্ণ চরিত্র তার সামনে নৃত্য করতে শুরু করে। মানুষ শব্দকেই পড়ে, আর সেটিই বিচার করে। এখানে এই কথাও স্মরণে রাখবেন যে, শ্রী রামচন্দ্র ছিলেন অযোধ্যার মনুষ্য রাজা। তাঁর পিতা-মাতা, পুত্র, আত্মীয় সবাই সেখানে ছিলেন। এজন্য তাঁর প্রতিকৃতি কাগজের ওপর আঁকা যেতে পারে, প্রস্তর আদির ওপর তাঁর মূর্তি খোদাই করা যেতে পারে। তিনি যদি বর্তমান সময়ের মানুষ হতেন, তবে তাঁর চিত্রও (Photograph) থাকতো।

এখন আপনি ক্ষণ মাত্র বিচার করুন, আপনি কখনো শ্রী রামকে শব্দের দ্বারা শোনেননি; আপনাকে কেউ এ কথা বলেনি যে, শ্রী রামচন্দ্র অযোধ্যার রাজা ছিলেন ইত্যাদি। এমতাবস্থায় কোন প্রস্তর দ্বারা নির্মিত কৌশল্যা দেবীর কোলে বসা বালকরূপী রামচন্দ্রকে দেখেও আপনার কিছুই বোধ হবে না। এরপর আপনাকে বাণীর দ্বারা কাউকে জিজ্ঞাসা করতেই হবে যে ইনি কে। তারপর শব্দের দ্বারাই তার ভেদ বললে তবেই জ্ঞান হবে। এই কারণে মধ্যস্থ (মাধ্যম) হলো শব্দ, মূর্তি নয়। এখন পুনরায় লক্ষ্য করুন, যখন আপনাকে কেউ বললো যে, ইনি শ্রী রামচন্দ্র আর ইনি তাঁর মাতা কৌশল্যা দেবী, সেই সময় আপনার কীভাবে বোধ হলো? অক্ষরের রূপ ধ্যানের মাধ্যমে অথবা শব্দের বোধের মাধ্যমে? নিঃসন্দেহ শব্দের বোধ দ্বারাই আপনার পদার্থের জ্ঞান হয়েছে। সেই সময় এই অক্ষরের আকার কীরূপ, এর প্রতি কোনো মনোযোগ নেই। কিন্তু পদের অর্থের উপর মনোযোগ আছে। কোথাও কোথাও কথা (প্রবচন) বা ব্যাখ্যান হয়। তাহলে যে ব্যক্তি অশিক্ষিত, অক্ষর জ্ঞানহীন, কিন্তু যে ভাষায় কথা (প্রবচন) হচ্ছে তা শুনে বুঝতে পারে, তখন সে সম্পূর্ণ কথা সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়। অক্ষরের কোন আবশ্যকতাহয় না; পুস্তকে কেবল অক্ষরের আকারকে দেখার ফলে আপনার কি কিছু বোধ হয়? কোন কিছুই বোধ হয় না।

যদি অক্ষরের আকার দেখার মাধ্যমে কারো বোধ হয়, তবে এক মহামূর্খেরও বোধ হওয়া উচিত, কেননা সে তো চক্ষু দ্বারা অক্ষরের আকারকে দেখছে– অক্ষর বাঁকা নাকি সোজা, ত্রিকোণ নাকি গোল ইত্যাদি। কিন্তু সেই অজ্ঞানী কোনো কিছুই জ্ঞাত হয় না। কেউ আজীবন অক্ষরের রূপ ধ্যান করতে থাকুক, কিন্তু এতে তার একটি শব্দেরও বোধ হবে না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অক্ষর শব্দকে জানার জন্য একটি সংকেত মাত্র।

কিন্তু শব্দই পদার্থ সম্পর্কে প্রাপ্ত জ্ঞানের মুখ্য কারণ। যদি শব্দ না থাকে, তবে আমরা কিছুই জানতে পারব না। পুস্তকে অক্ষর থাকে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত বাণীর দ্বারা এ কথা না বলা হয়– এর নাম 'ক' এবং এর নাম 'খ', ততক্ষণ পর্যন্ত বোধ হবে না। দেখুন, অক্ষর কী পদার্থ? বালকেরা অক্ষর শেখে, ধীরে ধীরে তাদের সব অক্ষরের বোধ হয়ে যায়। কিন্তু ওই সব অক্ষরের দ্বারা কোনো পদের বোধ হয় না। যদি অক্ষরের দ্বারা পদের বোধ হতো, তবে তাদের সব পদের পদার্থেরও বোধ হয়ে যাওয়া উচিত; কিন্তু এরকম কখনো হয় না। এজন্য 'অক্ষর' বোধের কারণ নয়। এখন দেখুন, অক্ষর জানার পরও পদের অর্থ বলে দিতে হয়। এর দ্বারাও ওই পদ-সম্বন্ধী পদার্থের বোধ হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত মনুষ্য সেই পদার্থকে নিজের চোখে না দেখে অথবা অনুমান আদি প্রমাণের দ্বারা না জেনে নেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো বস্তুর বোধ হয় না। এজন্য (আমাদের পদার্থ সম্পর্কিত) বোধের কারণ 'অক্ষর' নয়। একজন অন্ধ বালককে দেখুন, তাকে অক্ষর ব্যতীত কেবল পড়ানোর মাধ্যমেই তার সবকিছুর বোধ হয়ে যায়। তবে হ্যাঁ, চোখ ছাড়া রূপের বোধ হয় না।

কিন্তু সে পড়ার কারণে সম্পূর্ণ রামায়ণ বলতে পারে, আর আপনি হয়তো দেখেছেনও, এমন ঘটনা অনেক হয়ে থাকে। মনে করুন, আপনি ইংরেজী অক্ষর জানেন না, আপনার সামনে কেউ ইংরেজী অক্ষরে কিছু লিখে রেখেছেন। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, এই অক্ষরগুলো কেমন। মনে করুন, অক্ষর যেভাবে লিখতে হয়, সেভাবে লিখেও ফেলেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত আপনাকে এ কথা কেউ বলে দেয়নি যে, এটি 'A' আর এটি 'B'। এখন নিজেই বিচার করুন, অক্ষরের আকার (রূপ) সম্পর্কে বোধ হওয়ার পরও আপনার যথার্থভাবে A B C D এর বোধ হলো না। এজন্য 'অক্ষর' বোধের কারণ নয়। কোনো বস্তু সম্পর্কে যথার্থ বোধ কিছু শব্দের দ্বারাই হয়। কিন্তু যথার্থভাবে প্রত্যক্ষ অনুভবের দ্বারাই বস্তুর যথার্থ বোধ হয়। এর জন্য ঈশ্বর ভিন্ন-ভিন্ন ইন্দ্রিয় ভিন্ন-ভিন্ন বস্তুর জ্ঞান করার জন্য দিয়েছেন; আর সেগুলোর মাধ্যমেই (কোনো পদার্থ সম্বন্ধে) যথার্থ জ্ঞান হয়ে থাকে। যদি বলেন, "ওম্ শব্দের যেরূপ উচ্চারণ করা হয়, ওইরূপ উচ্চারণের ধ্যান করাই উপনিষদের তাৎপর্য।" তবে তাও ঠিক নয়, কেননা কণ্ঠস্বর ভেদে ওঙ্কারের উচ্চারণও অসংখ্য হবে,

ফলে কোনো স্থিরতা থাকবে না। আর না শাস্ত্রে এরূপ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়। এবার লক্ষ্য করুন, উচ্চারণ বলা হয় ধ্বনিকে। সেই উচ্চারণ বা ধ্বনিই তো আর ঈশ্বর নয়। (ওঙ্কার ধ্বনিকেই ঈশ্বর বলে মনে করা) এসব অজ্ঞতাপ্রসূত কথাবার্তা।

— পণ্ডিত শিবশঙ্কর শর্মা "কাব্যতীর্থ"

সত্যার্থ প্রকাশে বাইবেল খণ্ডন ও অনুবাদ নিয়ে খ্রিস্টানদের জালিয়াতির পর্দাফাঁস

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী বিরচিত অমর গ্রন্থ সত্যার্থ প্রকাশের ত্রয়োদশ সমুল্লাসের নাম "অথ কৃশ্চীনাখ্যমতবিষয়ং ব্যাখ্যাস্যাম্" । মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীই স্বাধীনতা পূর্ব ইংরেজ শাসিত ভারতে প্রথম ব্যক্তি যিনি কিনা দৃঢ়ভাবে লিখিত আকারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাইবেল খণ্ডন করে তাদের প্রতি নিজের অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করে বেদের আলোতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ।

খ্রিস্টান মিশনরীরা বেদ অনুবাদে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বেদের ভুল অনুবাদ করেছিলো এবং সেই অনুবাদের উপর ভিত্তি করে একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলো তা আপনারা আমার পূর্ব একটি নিবন্ধে পড়েছেন । খ্রিস্টান মিশনারীগণ দাবি করেন মহর্ষি স্বীয় গ্রন্থে যে অনুবাদ গ্রহণ করেছেন তা ভুল এবং ত্রুটিপূর্ণ ।

প্রকৃতপক্ষে মহর্ষি যা নিয়েছে মূল অনুযায়ী এবং তার দেবনাগরী হরফে যে অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিলো তার আলোকেই লিখেছেন । এরপরেও তাঁর ত্রুটি প্রদর্শন করার দুঃসাহস মিশনারীদের নিকট শোভনীয় নয় । পক্ষান্তরে আমরা দেখতে পাই মিশনারীদের নিজেদের গ্রন্থের তথাকথিত প্রামাণিক অনুবাদই কোন রকম সঙ্গতিসম্পন্ন নয় । এমতাবস্থায় তাদের আমাদের গ্রন্থের অনুবাদ বিষয়ে মন্তব্য করা কেবল পরিহাসযোগ্য নয় বরং ধূলিকণাবৎ উপেক্ষণীয়ও বটে ।

আজকে আমরা খ্রিস্টানদের প্রামাণিক কিছু স্বীকৃত সংস্করণ থেকেই অনুবাদে বিস্তর বিকৃতি ও লুকোচুরি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো যেন সত্যার্থ প্রকাশে বাইবেল অনুবাদ নিয়ে কোন বক্তব্যে আপনারা বিভ্রান্ত না হন -

আমরা যে সংস্করণগুলো ব্যবহার করবো -

i. কিং জেমস ভার্শন (King James Version: KJV)

ii. অথোরাইজড ভার্শন (Authorized Version: AV)

iii. রিভাইজড স্টান্ডার্ড ভার্শন (Revised Standard Version: RSV)

iv. জুবীলি

v. কেরি

vi. পবিত্র বাইবেল ২০০০, ২০০৬ [বাইবেল একাডেমি বাংলাদেশ]

vii. কিতাবুল মোকাদ্দস ২০১৩

[১] 'গীতসংহিতা' বা জবুর শরীফের ৮২।৬

KJV +AV - "I have said, Ye are gods; and all of you are children of the Most High": "আমি বলেছি, তোমরা ঈশ্বর, এবং তোমাদের সকলেই শ্রেষ্ঠতমের সন্তান"।

RSV-এর ভাষ্য নিম্নরূপ: "I say, you are gods, sons of the Most High, all of you" : "আমি বলি, তোমরা ঈশ্বর, শ্রেষ্ঠতমের পুত্র, তোমরা সকলেই"।

কেরি: "আমি বলেছি, তোমরা ঈশ্বর, তোমরা সকলে পরাৎপরের সন্তান।"

জুবিলী: "আমি বলেছি, তোমরা ঐশীজীব! তোমরা সবাই পরাৎপরের সন্তান।"

পবিত্র বাইবেল ২০০০: "আমি বলেছিলাম, তোমরা যেন ঈশ্বর, তোমরা সবাই মহান ঈশ্বরের সন্তান।"

কিতাবুল মোকাদ্দস ২০০৬: "আমি বলেছিলাম, তোমরা যেন আল্লাহ, তোমরা সবাই আল্লাহ তা'লার সন্তান।"

কিতাবুল মোকাদ্দস ২০১৩: "আমিই বলেছি, তোমরা দেবতা, তোমরা সকলে সর্বশক্তিমানের সন্তান।"

সমালোচনাঃ মূল ইংরেজি পাঠ থেকে সুস্পষ্ট যে, এখানে মানুষদেরকে, সকল মানুষকে সুস্পষ্টভাবে ঈশ্বর ও ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, বাইবেলীয় পরিভাষায় কাউকে ঈশ্বর বলা বা ঈশ্বরের পুত্র বলা দ্বারা কোনো দেবত্ব বা ঈশ্বরত্ব বুঝায় না; বরং ঈশ্বরের দাস ও সৃষ্টি বুঝায়। কেরির বাংলা অনুবাদ মূলাশ্রয়ী। তবে অন্যান্য অনুবাদে মানুষকে ঈশ্বর বলার বিষয়টা অস্পষ্ট করা হয়েছে। জুবিলী বাইবেল ও মুকাদ্দস-১৩ 'ঐশীজীব' ও 'দেবতা' শব্দ ব্যবহার করেছে। আর অন্য দুই অনুবাদে 'যেন' শব্দটা অতিরিক্ত সংযোজন করা হয়েছে।

[২] বাইবেলের Proverbs নামের পুস্তকটার বাংলা নাম কেরি বাইবেলে 'হিতোপদেশ', জুবিলী বাইবেলে 'প্রবচনমালা' এবং কিতাবুল মোকাদ্দসে 'মেসাল'। এ পুস্তকের ২৬ অধ্যায়ের ৪ ও ৫ শ্লোক

নিম্নরূপ:

Answer not a fool according to his folly, lest thou also be like unto him. Answer a fool according to his folly, lest he be wise in his own conceit": "মুর্খকে উত্তর দিও না তার মুর্খতা অনুসারে; পাছে তুমিও তার মতই হয়ে যাও। মুর্খকে উত্তর দাও তার মুর্খতা অনুসারে; পাছে সে তার অহমিকায় জ্ঞানী হয়।

কেরির অনুবাদ: "(৪) হীনবুদ্ধিকে তাহার অজ্ঞানতা অনুসারে উত্তর দিও না, পাছে তুমিও তাহার সদৃশ হও। (৫) হীনবুদ্ধিকে তাহার অজ্ঞানতা অনুসারে উত্তর দেও, পাছে সে নিজের দৃষ্টিতে জ্ঞানবান হয়।"
কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩ কেরির অনুরূপ।
জুবিলী বাইবেলের অনুবাদ: "নির্বোধকে তার মুর্খতা অনুসারে উত্তর দিয়ো না, পাছে তুমিও তার মত হও। নির্বোধকে তার মুর্খতা অনুসারেই উত্তর দাও, পাছে সে নিজেকে প্রজ্ঞাবান মনে করে।"
এর বিপরীতে পবিত্র বাইবেল ২০০০ এবং কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬: "প্রয়োজন বোধে বিবেচনাহীনকে তার বোকামি অনুসারে জবাব দিয়ো না, জবাব দিলে তুমিও তার মত হয়ে যাবে। প্রয়োজন বোধে বিবেচনাহীনকে তার বোকামি অনুসারে জবাব দিয়ো, তা না হলে সে তার নিজের চোখে নিজেকে জ্ঞানী মনে করবে।

সমালোচনাঃ এখানে 'প্রয়োজন বোধে' শব্দদুটো সংযোজন করা হয়েছে। বস্তুত বাইবেল সমালোচকরা এ দুটো শ্লোককে বাইবেলীয় বৈপরীত্যের সুস্পষ্ট নমুনা হিসেবে উল্লেখ করেন। কারণ, একই পুস্তকের একই অধ্যায়ের পাশাপাশি দুটো শ্লোকে সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী দুটো আদেশ দেওয়া হয়েছে: প্রথম আদেশ: নির্বোধকে তার নির্বুদ্ধিতা অনুসারে উত্তর দিয়ো না। দ্বিতীয় আদেশ: নির্বোধকে তার নির্বুদ্ধিতা অনুসারে উত্তর দাও।

খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা বিভিন্নভাবে এ বৈপরীত্যের উত্তর প্রদান করেছেন। কিন্তু কেউই গ্রন্থের মধ্যে দুটো শব্দ সংযোজন করার সাহসিকতা দেখাননি। কিন্তু বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদকরা সে সাহস দেখালেন। প্রাচীন কাল থেকে খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা এরূপ সংযোজনের সময় বন্ধনী ব্যবহার করতেন। বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দসের সম্পাদকরা 'প্রয়োজন বোধে' দুটো শব্দ পবিত্র পুস্তকের মধ্যে সংযোজন করার জন্য এরূপ কোনো বন্ধনীরও 'প্রয়োজন বোধ' করেননি।

[৩] মথি ৫।৩৯
KJV:"ye resist not evil..." (তোমরা দুষ্ট/পাপী/মন্দ/বদমাইশ লোককে প্রতিরোধ করো না)
RSV: Do not resist one who is evil... (যে ব্যক্তি দুষ্ট/ মন্দ/ পাপী/ বদমাইশ তাকে তোমরা প্রতিরোধ করো না।)
কেরি ও কিতাবুল মোকদ্দস-২০১৩: "তোমরা দুষ্টের প্রতিরোধ করিও না; (বরং যে কেউ তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারে, অন্য গাল তাহার দিকে ফিরাইয়া দেও।)" জুবিলী বাইবেলের অনুবাদ: "দুর্জনকে প্রতিরোধ করো না...।"
এর বিপরীতে পবিত্র বাইবেল ২০০০ ও কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬: "তোমাদের সংগে যে কেউ খারাপ ব্যবহার করে তার বিরুদ্ধে কিছুই করো না...

সমালোচনাঃ পাঠক হয়ত বলবেন, অর্থ তো কাছাকাছিই! কিন্তু ধর্মগ্রন্থের মূল পাঠে কি লেখা আছে? "তোমাদের সংগে যে কেউ খারাপ ব্যবহার করে তার বিরুদ্ধে কিছুই করো না"? এ কথাটার ইংরেজি কী? পবিত্র গ্রন্থের মধ্যে এরূপ সংযোজন ও বিয়োজন কি অনুবাদের বিশ্বস্ততা ও ধর্মগ্রন্থের পবিত্রতা রক্ষা করে?

প্রকৃত বিষয় হল, যীশুর এ বাক্যটা অনেক সমালোচনা কুড়িয়েছে। দুষ্টকে প্রতিরোধ না করলে সমাজ টিকবে কি করে? সম্ভবত এজন্য অনুবাদকরা অর্থকে সহনীয় করার চেষ্টা করেছেন। তবে এতে পবিত্র পুস্তকের অর্থ বিকৃতি ছাড়া কোনো লাভ হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ এক্ষেত্রেও প্রশ্ন একই থাকে। আমাদের সন্তানদেরকে কি আমরা এটাই শিক্ষা দেব? তোমাদের কেউ মারলে, অত্যাচার করলে, ধর্ষণ করলে, পকেট মারলে.... তোমরা তার বিরুদ্ধে কিছুই বলবে না? বরং আরেকবার অপরাধটা করার সুযোগ দেবে?

[৪]
'লূক' ৯/২৮:
KJV: And it came to pass about an eight days after these sayings, he took Peter and John and James, and went up into a mountain to pray.
RSV: Now about eight days after these sayings, he took Peter and John and James, and went up on the mountain to pray.
কেরির অনুবাদ: এই সকল কথা বলিবার পরে, অনুমান আট দিন গত হইলে তিনি পিতর, যোহন ও যাকোবকে সঙ্গে লইয়া প্রার্থনা করিবার জন্য পর্বতে উঠিলেন।

জুবিলী বাইবেল ও কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩ সংস্করণের অনুবাদেও 'আনুমানিক আট দিন' বলা হয়েছে। কিন্তু পবিত্র বাইবেল ২০০০ ও কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬-এ (eight days)-এর অনুবাদে 'এক সপ্তাহ' বলা হয়েছে।

পবিত্র বাইবেল-২০০০: "এই সব কথা বলবার প্রায় এক সপ্তা পরে যীশু প্রার্থনা করবার জন্য পিতর, যোহন ও যাকোবকে নিয়ে একটা পাহাড়ে গেলেন।" কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩: "এই সব কথা বলবার প্রায় এক সপ্তা পরে ঈসা মুনাজাত করবার জন্য পিতর, ইউহোন্না ও ইয়াকুবকে নিয়ে একটা পাহাড়ে গেলেন।

সমালোচনাঃ আমরা জানি না, অনুবাদকদের কাছে এক সপ্তাহ এবং আট দিন একই কিনা অথবা তাদের সপ্তাহ আট দিনে হয় কি না! তবে মূল ভাষ্যের '৮ দিন' কথাকে এভাবে ইচ্ছমত প্রায় এক সপ্তা বানানো কখনোই গ্রহণযোগ্য অনুবাদ নয়।

[৫] যোহন ১২/২৫ ইংরেজিতে নিম্নরূপ:

KJV: "He that loveth his life shall lose it; and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal"।

RSV: "He wjp loves his life loses it; and he who hates his life in this world will keep it for eternal life."

উভয় ভার্শনেই অর্থ: "যে তার নিজ জীবন/ প্রাণ ভালবাসবে সে তা হারাবে; এবং যে এ জগতে তার নিজের জীবন ঘৃণা করবে সে অনন্ত জীবনের জন্য তা সংরক্ষণ করবে।"

কেরির অনুবাদ: "যে আপন প্রাণ ভালবাসে সে তাহা হারায়; আর যে এই জগতে আপন প্রাণ অপ্রিয় জ্ঞান করে, সে অনন্ত জীবনের জন্য তাহা রক্ষা করিবে।" কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩ কেরির অনুবাদের অনুরূপ।

পবিত্র বাইবেল-২০০০ এবং কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬ নিম্নরূপ: "যে নিজের প্রাণকে বেশী ভালবাসে সে তার সত্যিকারের জীবন হারায়, কিন্তু যে এই দুনিয়াতে তা করে না সে তার সত্যিকারের জীবন অনন্ত জীবনের জন্য রক্ষা করবে।

সমালোচনাঃ আমরা দেখছি যে, কেরির অনুবাদ মূলানুগ। শুধু 'হেট' বা ঘৃণা করাকে 'অপ্রিয় জ্ঞান করা' লেখা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী অনুবাদ খুবই একেবারেই ভিন্ন অর্থবাহী। সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে মূল অর্থ পরিবর্তন করে 'বেশী' শব্দটা যোগ করা হয়েছে। একইভাবে মূল বক্তব্য বিনষ্ট করে 'সত্যিকারের জীবন' শব্দদু'টো যোগ করা হয়েছে। আর হেট বা ঘৃণা করা শব্দটা বেমালুম চেপে যেয়ে 'তা না করে' বলা হয়েছে। 'তা না করা' অর্থাৎ কোনো কিছুকে 'বেশি ভাল না বাসা' কি 'হেট' বা ঘৃণা করার সমার্থক? বিশ্বের কোনো ভাষায় কি তা আছে? কোনো বিবেকবান মানুষ কি তা বলবেন? আমি আমার কোনো বন্ধুকে কম ভালবাসি- এর অর্থ কি আমি তাকে ঘৃণা করি?

কোনো ছাত্র যদি গ্রামার পরীক্ষায় এরূপ স্বাধীন বা স্বেচ্ছাচারী ব্যাখ্যাসমৃদ্ধ অনুবাদ করে তবে শিক্ষক কিভাবে তার মূল্যায়ন করবেন? কোনো আর্থিক বা রাজনৈতিক ডকুমেন্টের এরূপ অনুবাদ করা হলে তা কি 'অপরাধ' বলে গণ্য করা হবে না? এরূপ বিকৃতির কারণ বুঝতে পারা পাঠকের জন্য হয়ত কঠিন হতে পারে। ইঞ্জিলের এ বক্তব্যটা আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী ও গবেষকদের প্রচুর সমালোচনা কুড়িয়েছে। কারণ নিজের জীবনকে ভালবাসা সহজাত মানবীয় প্রকৃতি। কাউকে বলা যায় যে, তুমি জীবনের চেয়ে দেশ, রাষ্ট্র, ধর্ম বা ঈশ্বরকে বেশি ভালবাসবে। কিন্তু এ কথা বলা যায় না যে, জীবনকে ভালবাসলেই তুমি চাকরি বা অনন্ত জীবন হারাবে। এজন্য যীশুর নামে কথিত বক্তব্যটা খুবই আপত্তিকর।

অন্যদিকে অনন্ত জীবন লাভ করতে জীবনকে ঘৃণা করতে হবে কথাটাও একই রকম অগ্রহণযোগ্য। কেউ যদি জীবনকে ঘৃণা-ই করে তবে তাকে অনন্তকালের জন্য রক্ষার চেষ্টা করবে কেন? জীবনের প্রতি প্রেমই তো তাকে তা অনন্তকালের জন্য রক্ষা করতে উদ্বুদ্ধ করে। জীবনের প্রতি ঘৃণা মানুষকে অসুস্থ ও অপ্রকৃতস্থ করে।

বস্তুত যীশুর নামে ইঞ্জিলের মধ্যে লিখিত অনেক কথাই এধরনের প্রান্তিক। দ্বিতীয় শতাব্দীর খ্রিষ্টান সন্ন্যাসী ও জ্ঞানবাদী বা 'মারফতি' (gnostic) সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে এসব 'প্রান্তিক' আবেগী কথাগুলো খুবই বাজার পেত। সম্ভবত এগুলো যীশুর নামে বানানো কথা। সর্বাবস্থায় এগুলোর ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, কিন্তু মূল বক্তব্যের মধ্যে মানবীয় ব্যাখ্যা জুড়ে দিয়ে তাকে যীশুর বা ঈশ্বরের কথা বলে চালানো কি ধর্ম, মানবতা, বিবেক বা জাগতিক আইনে গ্রহণযোগ্য?

[৬] করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পলের ১ম পত্রের ১৫ অধ্যায়ে পল যীশু খ্রিষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পর যে সকল শিষ্যের সাথে সাক্ষাৎ করেন তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন। ১৫ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকটা

KJV ও RSV এবং সকল বাইবেলে: "And that he was seen of Cephas, then of the twelve"

কেরি ও কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩: "আর তিনি কৈফাকে, পরে সেই বারো জনকে দেখা দিলেন।"

পবিত্র বাইবেলে ২০০০ এবং কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬: "আর তিনি পিতরকে এবং পরে তাঁর প্রেরিতদের/ সাহাবীদের দেখা দিয়েছিলেন।"

সমালোচনাঃ প্রথম অনুবাদ মূলাশ্রয়ী। কিন্তু দ্বিতীয় অনুবাদে ‘the twelve’ বা ‘সেই বারোজন’ পরিবর্তন করে ‘প্রেরিতদের’ এবং ‘সাহাবীদের’ লেখা হয়েছে। এভাবে মূলের পরিবর্তন ছাড়াও অসাধু সম্পাদনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।এখানে সাধু পল ভুল করেছেন। যীশু মৃত্যু থেকে উঠার পরে যখন প্রেরিতদের সাথে সাক্ষাৎ করেন তখন ‘সেই বারো’ জনের একজন ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা মৃত্যু বরণ করেছিলেন। ফলে প্রেরিতদের সংখ্যা ছিল ১১ জন। এজন্য সাধু পলের কথাটা এখানে ভুল। এ ভুল দ্বারা প্রমাণ হয় যে, সাধু পল পবিত্র আত্মার সাহায্যে তাঁর পত্রগুলো লেখেননি। বরং সাধারণ একজন ধর্ম প্রচারক হিসেবেই লেখেছেন। এজন্য তাঁর ভুল হত। বাহ্যত এ ভুলটা লুকানোর জন্য মূলকে পরিবর্তন করা হয়েছে।

[৭] মথি ২৫/১৫ নিম্নরূপ:
KJV: And unto one he gave five talents, to another two, and to another one;
RSV: to one he gave five talents, to another two, and to another one...
কেরি এবং কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩: “তিনি এক জনকে পাঁচ তালন্ত, অন্য জনকে দুই তালন্ত, এবং আর এক জনকে এক তালন্ত ... দিলেন।”
জুবিলী বাইবেল: “একজনকে তিনি পাঁচশ’ মোহর, অন্যজনকে দু’শো মোহর, ও আর একজনকে একশ’ মোহর ... দিলেন।”
পবিত্র বাইবেল ২০০০ ও কিতাবুল মোকাদ্দস: “তিনি একজনকে পাঁচহাজার, একজনকে দু’হাজার ও একজনকে এক হাজার টাকা দিলেন।”

সমালোচনাঃ আমরা জানি না, বাইবেল সোসাইটিগুলোর নিকট শত ও হাজার একই সংখ্যা কি না! তবে আমরা দেখছি যে, কেরির অনুবাদ মূলাশ্রয়ী। তালন্ত (talent) যেহেতু প্রাচীন মুদ্রা, সেহেতু টাকায় তা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তবে ‘এক তালন্ত’-কে ইচ্ছামত ‘এক শত টাকা’ বা ‘এক হাজার টাকা’ বলে অনুবাদ করা মোটেও গ্রহণযোগ্য অনুবাদ বলে গণ্য নয়।

[৮]মার্ক ১৬/১৫:
KJV: Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.
RSV: Go into all the world and preach the gospel to the whole creation
উভয় ভার্শনের অর্থ এক।
কেরি এবং কিতাবুল মোকাদ্দস-২০১৩: "তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার/তবলিগ কর।" জুবিলী বাইবেলের অনুবাদ: "তোমরা বিশ্বজগতে বেরিয়ে পড়, সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার কর।"
কিন্তু কিতাবুল মোকাদ্দস-২০০৬-এর অনুবাদ: "তোমরা দুনিয়ার সব জায়গায় যাও এবং সব লোকদের কাছে আল্লাহর দেওয়া সুসংবাদ তবলিগ কর।'

সমালোচনাঃ এখানে every creature/ the whole creation বা 'প্রত্যেক সৃষ্টি/ সকল সৃষ্টি' বাক্যাংশের অনুবাদ করা হয়েছে: 'সব লোকদের'। এ অনুবাদের মাধ্যমে যীশুর মূল নির্দেশ পরিবর্তন করা হয়েছে। সৃষ্টি আর লোক এক নয়। সৃষ্টি অর্থ মানুষ ও অন্যান্য সকল সৃষ্টি। পক্ষান্তরে লোক বলতে মানুষ বুঝানো হয়। ইংরেজিতে সব লোকদের বুঝাতে 'every man, every person/ all people' ইত্যাদি বলা হবে।

বাহ্যত এ পরিবর্তনের বাহ্যিক কারণ বাইবেল সমালোচকদের তীর। তারা বলেন, যীশু সকল সৃষ্টির কাছে গসপেল বা ইঞ্জিল প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন। আর সৃষ্টি বলতে মাছ, পাখি, সাপ, বিচ্ছু সবই বুঝায়। খ্রিষ্টান প্রচারকরা কখনোই এগুলোর কাছে ইঞ্জিল প্রচার করেন না! এ সমালোচনা থেকে বাঁচতেই সম্ভবত এরূপ বিকৃতি। গ্রহণযোগ্য ধর্মগ্রন্থের জন্য যীশুর নির্দেশকে অবিকৃতি রেখে ব্যাখ্যা করাই কি উত্তম ছিল না? অতঃ খ্রিস্টান মিশনারীদের নিকট বক্তব্য, স্বীয় গ্রন্থের প্রামাণ্য অনুবাদ প্রদর্শন করে তারপর মহর্ষির খণ্ডনের ভুল যেন প্রদর্শন করে । উক্ত রচনার অর্থ তাদের অনুভূতিতে আঘাত হানা নয় বরং যৌক্তিক ও একাডেমিক গবেষণার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ।

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর ব্রাহ্মসমাজ সমালোচনা

সত্যার্থ প্রকাশের ১১শ সমুল্লাসে রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজ ও আত্মারাম পাণ্ডুরাঙ নির্মিত প্রার্থনা সমাজ বিষয়ে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর সুস্পষ্ট মতামত পরিলক্ষিত হয় । একজন আদর্শ সমালোচকের দৃষ্টিতে তিনি ভালো ও মন্দ উভয় দিকেরই আলোচনা করেছেন । প্রশ্নোত্তর শৈলীতে আমরা দেখতে পাই -

প্রশ্ন - ব্রাহ্মসমাজ এবং প্রার্থনা সমাজ ভাল কিনা ?
উত্তর - কোনও কোনও বিষয়ে ভাল, আবার বহু বিষয়ে মন্দ।

প্রশ্ন - ব্রাহ্মসমাজ এবং প্রার্থনা সমাজ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহাদের নিয়ম অতি উত্তম।
উত্তর - নিয়ম সর্বাংশে উত্তম নহে; কেননা বেদবিদ্যাহীন ব্যক্তিদের কল্পনা সর্বথা সত্য কীরূপে হইতে পারে? ব্রাহ্ম সমাজ এবং প্রার্থনা সমাজ অল্পসংখ্যক লোককে খৃষ্টান মতের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছে, পাষাণাদি মূর্ত্তির পূজাও কতক পরিমাণে দূর করিয়াছে এবং তাহাদিগকে অন্যান্য জাল গ্রন্থের কবল হইতে কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা করিয়াছে। এসকল ভাল কথা। কিন্তু –

(১) ইহাদের মধ্যে স্বদেশ-ভক্তি নিতান্ত অল্প। ইহারা খৃষ্টান আচার বহুপরিমাণে গ্রহণ করিয়াছেন; পান ভোজন এবং বিবাহাদির নিয়মও পরিবর্তন করিয়াছেন।

(২) স্বদেশের প্রশংসা অথবা পূর্বপুরুষদের গৌরব করা তো দূরে থাকুক, তৎস্থলে শতমুখে নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বক্তৃতার ইংরেজ প্রভৃতি খৃষ্টানদের পেট ভরিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন কিন্তু ব্রহ্মাদি মহর্ষিদের নামটুকুও মুখে আনেন না। প্রত্যুত তাঁহারা এমনও বলিয়া থাকেন যে, এই সংসারে আজ পর্য্যন্ত ইংরেজ ব্যতীত অপর কেহ বিদ্বান্ হয় নাই; আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণ চিরকাল মূর্খ ছিলেন এবং তাঁহাদের কখনও উন্নতি হয় নাই।

(৩) ব্রাহ্মগণ বেদাদির প্রশংসা করা ত দূরে থাকুক, নিন্দা করিতেও পরাঙ্মুখ হন না। ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্যে রচিত পুস্তকে সাধুদের গণনায় 'ঈশা', 'মুসা', 'মহম্মদ', 'নানক', এবং 'চৈতন্য' লিখিত আছে। কোন ঋষি-মহর্ষির নামও নাই। ইহা হইতে জানা যায় যে, ইহারা যাঁহাদের নাম লিখিয়াছেন, ইহারা তাঁহাদেরই মতানুযায়ী। একবার ভাবিয়া দেখুন উক্ত সমাজের সভ্যগণ যদিও আর্য্যাবর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এদেশেরই অন্ন-জল গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তথাপি মাতাপিতা, পিতামহের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় মতের দিকে অধিক আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। ব্রাহ্ম সমাজী ও প্রার্থনা সমাজীরা এতদ্দেশীয় সংস্কৃত বিদ্যায় অনভিজ্ঞ হইয়াও নিজেদের বিদ্বান বলিয়া প্রকাশ করেন, ইংরাজী ভাষা পড়িয়া পাণ্ডিত্যাভিমানী হইয়া রাতারাতি একটা মত প্রচারে প্রবৃত্ত হওয়া মানব সমাজের স্থায়ী ও বৃদ্ধিকর কার্য্য করা কীভাবে সম্ভব হইতে পারে ?

(৪) ইংরেজ, যবন এবং অন্ত্যজ প্রভৃতির সহিতও ইঁহারা পানভোজন সম্পর্কে কোন ভেদাভেদ রাখেন না। ইঁহারা সম্ভবতঃ ইহাই বুঝিয়াছেন যে, সকলের সহিত পানভোজন করিলেই এবং জাতিভেদ ভাঙ্গিয়া দিলেই তাঁহাদের এবং তাঁহাদের দেশের উন্নতি হইবে। কিন্তু ও সকল কার্য্য দ্বারা উন্নতি তো হয়ই না, বরং বিপরীত বিকারই ঘটিয়া থাকে।

আর্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাহের মধ্যে অত্যন্ত সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে । যথাক্রমে -

● ব্রাহ্মসমাজ একটি সংস্কারবাদী আন্দোলন বিশেষ করে সমাজসংস্কার আন্দোলন, নতুনত্ব গঠনে প্রয়াস করে। কিন্তু তাদের মানদণ্ড অনেকটাই পাশ্চাত্যদের সাথে মিল রেখে করা । আর্য সমাজ হলো সনাতন ধর্মের পুনর্জাগরণ এর আন্দোলন, বৈদিক সভ্যতায় মনোনিবেশ করে (Back To The Vedas)।

● ব্রাহ্মসমাজ পশ্চিমা সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং পশ্চিমা সংস্কৃতি থেকে এর অনেক পদ্ধতিবাদকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আর আর্য সমাজ কেবল ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতিকেই প্রাধান্য দেয় এবং প্রচার করে। মূলত ব্রাহ্মসমাজ সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের জন্য বাইরে/পশ্চিমের দিজে তাকিয়ে ছিলেন। সমাজসংস্কার এর জন্য নতুনত্ব বয়ে আনতে চেয়েছেন।

কিন্তু আর্যসমাজ ভিন্ন। আর্য সমাজ প্রমাণ করতে চেষ্টা করে আধুনিকতা কেবল বৈদিক সভ্যতার সংস্কৃতির মধ্যে বিদ্যমান এবং তা ফিরিয়ে আনার প্রয়াস করেন। আর্যসমাজ বিশ্বাস করে বৈদিক সংস্কৃতি পশ্চিমা সংস্কৃতির তুলনায় প্রকৃতপক্ষে উচ্চতর। সমস্যাটি হলো বর্ণ ও কুসংস্কারের মতো আদিম ধারণা নিয়ে।

কাশী শাস্ত্রার্থ এবং সত্যব্রত সামশ্রমীর নির্লজ্জ মিথ্যাচার?

কাশী শাস্ত্রার্থের ৩ (তিন) বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল পৌরাণিকদের দ্বারা -

(১) দয়ানন্দপরাভূতি: সংস্কৃত ভাষায় এই গ্রন্থটি কাশী নরেশের যন্ত্রালয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এতে কিছু না কিছু, অর্থাৎ পণ্ডিতরা স্বেচ্ছাচারিতভাবে স্বামীজির কথা সম্পূর্ণরূপে তাঁর অভিপ্রায়ের বিপরীতে প্রকাশ করেন। এটি সম্পূর্ণরুপে পক্ষপাতযুক্ত ছিল, কারণ গ্রন্থটির নামকরণ থেকে এটিই বিদিত হয় যে প্রকাশকের উদ্দেশ্য ছিল স্বামী দয়ানন্দের পরাজয়ের মিথ্যা ও কাল্পনিক বার্তা দিয়ে সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করা।

(২) পৌরাণিক পণ্ডিতগণ 'দুর্জনমতমর্দন' শিরোনামে কাশী শাস্ত্রার্থের আরেকটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৯ পৃষ্ঠার এই বইটি পুরাণের বাক্যে ভরপুর ছিল। সমগ্র গ্রন্থে একটি বেদমন্ত্রও ছিল না। মূল শাস্ত্রার্থের অতিরিক্ত অনেক বাক্য যুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু বেদাদি সত্যশাস্ত্রের প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায়নি। পণ্ডিত লেখরামের মতো নীরক্ষীরবিবেকী মনস্বী এই গ্রন্থটির সম্পর্কে একটি টিপ্পণী লিখেছেন - 'যারা এটি অধ্যয়ন করে তাদের কাছে পণ্ডিতদের অসভ্যতা, অযোগ্যতা, বেদ ও শাস্ত্রের অনভিজ্ঞতা তথা অসত্যের পরাজয় স্পষ্টভাবে প্রকট হয় এবং একইভাবে রাজা সাহেবের মাটির মাধো বা মহাদেব হওয়া সবার কাছে প্রকাশ পায়।' (পণ্ডিত লেখরাম-ঋষি দয়ানন্দের জীবন চরিত্র, পৃষ্ঠা ১৫৬)

(৩) পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী 'প্রত্নকম্রনন্দিনী' এর ডিসেম্বর ১৮৬৯ (সম্বত্ ১৯২৬ বি০ মার্গশীর্ষ মাস) অংক সং ২৮ মে 'কাশীস্থরাজসভায়াং প্রতিমাপুজনবিচারঃ' শিরোনামে পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণসমূহ সম্পূর্ণরুপে সত্য ও প্রামাণিক নয়। যেমন 'জ্ঞানপ্রদায়িনী পত্রিকা'(সংখ্যা ৪ এপ্রিল ১৮৭০ ইং) এর সম্পাদক লিখেছেন -- উক্ত পুস্তক (মুন্সী হরবংশলাল দ্বারা ১৯২৬ বি০ এ 'সত্যধর্মবিচার' শিরোনামে প্রকাশিত) তথা পত্রিকার ('প্রত্নকম্রনন্দিনী' তে প্রকাশিত) বর্ণনায় পরস্পর কিছু বিরোধ পাওয়া যায়।

এই বিরোধের কারণ হল, সামশ্রমী মহাশয় কাশী নরেশের কৃপার আকাঙ্খা রাখতেন , তাই তিনি পৌরাণিক পক্ষের আশ্রয় নিয়ে স্ববিবরণ প্রকাশ করেছিলেন। যদিও সামশ্রমীর বর্ণনা সম্পূর্ণ অসত্য ছিল না, যেমন 'দয়ানন্দ পরাভূতিঃ' তথা 'দূর্জনমতমর্দন' নামক পুস্তকে ছিল। সামশ্রমী কর্তৃক প্রকাশিত বর্ণনা থেকে এটা ভাল ভাবেই বিদিত হয় যে 'কাশীস্থ পণ্ডিত স্বামীজির প্রশ্নের না তো কোন উত্তর দিতে পেরেছিল আর না তো মূর্তিপূজার পক্ষে একটিও বেদ-মন্ত্র উপস্থাপন করতে পেরেছিল, কিন্তু বার বার প্রসঙ্গান্তর অবশ্যই করেছিল।

রাজসভায় শাস্ত্রার্থ নয় -

এই শাস্ত্রার্থ অবশ্যই কাশী নরেশের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তবে রাজসভায় নয়। দুর্গা কুণ্ডের নিকট আনন্দ বাগে (আমেঠীর নরেশ রাজা লাল মাধো সিংয়ের স্থান) এই শাস্ত্রার্থ হয়েছিল। পণ্ডিত রঘুনাথ প্রসাদ কোতওয়াল স্বামীজিকে রাজসভায় কাশী নরেশ শ্রী ঈশ্বরীনারায়ণ সিং-এর সামনে শাস্ত্রার্থ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু স্বামীজি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে 'আমার নিয়ম হচ্ছে যে কেউ আমার কাছে আসবে, যতক্ষণ সে চায়, তার সাথে শাস্ত্রার্থ করবে। অন্যথা কোন কারণ ছাড়া আমি কোথাও যাই না। (লেখরাম- ঋষির জীবন চরিত্র, পৃষ্ঠা ১৪৬)। ফলতঃ আনন্দবাগে শাস্ত্রার্থ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

তাই এই শাস্ত্রার্থের বিবরণে সামশ্রমী দ্বারা কাশীস্থ রাজসভায়াম্.... নামকরণ দেয়া কাশীস্থ নরেশকে প্রসন্ন করার জন্য ছিল।

সামশ্রমী মধ্যস্থতাকারী লেখক ছিলেন না -

'প্রত্নকম্রনন্দিনী'-তে সামশ্রমী জী লিখেছেন:

'কিঞ্চাত্র ন ময়া কোপ্যেপি মধ্যস্থঃ স্বীক্রিয়তে, সর্বেষামেব মিথ্যাচারিত্ব-দর্শনাত্', অর্থাৎ 'আমি কাউকে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে স্বীকার করতে পারি না, কারণ সম্প্রতি সমস্ত মানুষ মূর্তিপূজার মিথ্যাচারে লিপ্ত।

স্বামীজি দ্বারা এমন বলার পরেও কোন সে ব্যক্তি যে পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমীকে ' উভয় পক্ষের দ্বারা নিযুক্ত বাদী ও প্রতিবাদীর কথা যথাবৎ লেখার জন্য মধ্যস্থের রুপে গণ্য করবে?

অতঃপর মধ্যস্থতার কথা সামশ্রমী এই শাস্ত্রার্থের বিবরণ প্রকাশের সময় 'প্রত্নকম্রনন্দিনী' পত্রিকায় প্রকাশ না করে শাস্ত্রার্থের ৩৭ বছর তথা ঋষি দয়ানন্দের মৃত্যুর ২৩ বছর পর তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ 'ঐতরেয়ালোচন' (পৃ. ১২৭) এ এভাবে লিখেন...

'পরমহো কাশ্যানন্দোদ্যানবিচারে য়ত্র বয়মাস্মঃ মধ্যস্থাঃ, বিশেষতো বাদিপ্রতিবাদিবচসামনু লেখন্যেহমেক এবোভয়পক্ষতো নিযুক্তঃ

প্রকৃতপক্ষে, কাশী নরেশ বাদী-প্রতিবাদীর কথাগুলি লেখার দায়িত্ব পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমীর উপর অর্পণ করেছিলেন যা কাশী নরেশের যন্ত্রালয় থেকে পৌরাণিক পণ্ডিতদের দ্বারা প্রকাশিত 'দয়ানন্দ-পরাভূতি:' গ্রন্থের এই উদ্ধৃতি থেকে জানা যায় ।

সত্যব্রতসামশ্রমিণং প্রতি' 'লিখ্যতাং তাবত্ য়থার্থতো বাদিপ্রতিবাদিবচ'---ইত্যা-জ্ঞাপয়ন্ত-লেখ্যকার্য্যনিযুক্তঃ সামশ্রমী য়থাবৃত্তং শাস্ত্রার্থং লিখতি তথা হি।।

সামশ্রমী কর্তৃক প্রকাশিত বর্ণনায় আরও অনেক ত্রুটি রয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল-

১. কল্মসংজ্ঞার বিষয়ে পন্ডিত লেখরাম, পণ্ডিত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত চন্দ্রধর শর্মা গুলেরী ইত্যাদি সকল নিষ্পক্ষ মনিষী এটা স্বীকার করেন যে স্বামীজির প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারেনি।

দয়ানন্দ - ব্যাকরণে কল্মসংজ্ঞা কীসের?

এই বিষয়ে বিশুদ্ধানন্দ নীরব হয়ে গেল। তারপর বালশাস্ত্রী এগিয়ে গেলেন এবং বলেছেন- সংজ্ঞা তো দেওয়া হয়নি, কিন্তু একটি সূত্রে ভাষ্যকার উপহাস করেছেন। তখন স্বামী দয়ানন্দ জী বললেন যে কোন সূত্র মহাভাষ্যে সংজ্ঞা করেননি আর উপহাস করেছেন? যদি আপনি জানেন তাহলে মূল উদাহরণসহ সমাধান বলুন? তখন বালশাস্ত্রী ও অন্যরাও কিছু বলেন নি।

এই প্রেক্ষাপটকে সামশ্রমীজী অন্যভাবে বর্ণনা করে কাশিতে অবস্থানরত পণ্ডিতদের পক্ষকে দুর্বল হওয়া থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন-

দয়ানন্দ- ভবতা সর্বম্ পঠিতম্?

বিশুদ্ধানন্দ - সর্বম্

দয়ানন্দ- ব্যাকরণমপি?

বিশুদ্ধানন্দ- তদপি

দয়ানন্দ- কল্মসংজ্ঞা কস্য?

বালশাস্ত্রী- কল্মসংজ্ঞা মহাভাষ্য একত্র পরিহাসনে কথিতা, ন সা প্রকৃতসংজ্ঞা অপিচ প্রকৃতবিচারণে প্রবৃত্তস্তং কথমপ্রকৃতম্ বিচারয়সি?

পুরাণাদীনাম্ বেদবিরুদ্ধতা কথম্? তদেবোদ্ভাবয়।

দয়ানন্দ-শৃণু! শৃণু! ম্লেচ্ছভাষাধ্যয়নাদেঃ পুরাণাদৌ নিষেধ্যোস্তি, বেদে ক্বাস্তি?

এইভাবে সামশ্রমী দ্বারা কাশিতে অবস্থানরত পণ্ডিতদের প্রতি পক্ষপাত স্পষ্ট হয়েছে।

২. 'শ্রী হরিকৃষ্ণা ব্যাসঃ জয়নারায়ণতর্কপঞ্চাননঃ, শ্রী শিবকৃষ্ণো বেদান্তসরস্বতী হস্তেবমাদয়ো বিদ্বাম্সঃ কতিপয়া বদন্তি বিচারস্তু সম্যক্ ন ভূতঃ পরং দয়ানন্দঃ পরাজিত ইতি সত্যম্।'

সামশ্রমীজী নিজস্ব বিবরণে উক্ত বচন লিখেছেন। শাস্ত্রার্থে কাশিতে অবস্থানরত পৌরাণিক পণ্ডিতের পক্ষ থেকে উপস্থিত এই বিদ্বানদের সম্মতিগুলো লেখার কী আবশ্যকতা ছিল ? জেনে রাখা ভালো যে উক্ত তিন বিদ্বান পৌরাণিক পক্ষের বিদ্বান ছিলেন। কাশীশাস্ত্রার্থে স্বামী দয়ানন্দের সামনে যে পৌরাণিক বিদ্বান শাস্ত্রার্থের জন্য উপস্থিত ছিল, তাদের মধ্যে ডানদিকে ৬ষ্ঠ স্থানে প০ জয়নারায়ণ তর্কবাচস্পতি, ১৪ নাম্বারে হরিকৃষ্ণা ব্যাস তথা ২৫ নম্বরে শিবকৃষ্ণ বেদান্তী ছিল (দ্র০ প০ লেখরাম ঋষি দয়ানন্দ কা জীবন চরিত্র, পৃ০ ১৪৪)।

কাশী শাস্ত্রার্থে অনেক নিরপেক্ষ ভালো মানুষ ছিলেন তথা বিদ্বান মনীষীও ছিলেন, উনাদের সম্মতিতে সামশ্রমীজীকে উদ্ধৃত করে দেওয়া উচিত ছিল।

৩. সামশ্রমীজী নিজস্ব বিবরণে কাশী নরেশের সম্বন্ধে লিখেছেন -

'অহমপি বাদিপ্রতিবাদিবচঃ সারাতুবদনে নিযুক্তোগ্রেসরহঃ পক্ষপাতশূন্য বিচারদত্তকর্ণঃ সংযতোস্মি'। অর্থাৎ- ' আমি বাদি-প্রতিবাদিদের বচন সমূহ পক্ষপাতশূন্য হয়ে মনযোগ দিয়ে শুনবো।

সেই কাশী নরেশ শাস্ত্রার্থ সমাপ্তি সমাপ্তির পরে বলেন যে-

'দয়ানন্দ ধৃষ্টো মূর্খশ্চ পরং ন একেন কেনচিৎকোবিদেন পরাজেয়ঃ সংভ্যাবতে। স হি ষঢ়ভিঃ কর্ণো নিপাতিত ইতি ন্যায়েন ধ্বস্তবলো নিরুস্তঃ।' অর্থাৎ দয়ানন্দ ধৃষ্ট ও মূর্খ , কিন্তু কোন একজন বিদ্বানের দ্বারা তাকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। ছয়জন যোদ্ধা দ্বারা যেভাবে কর্ণকে পরাজিত করা হয়েছিল ঠিক একইভাবে দয়ানন্দও ধ্বংসযোগ্য করে দেওয়া হয়েছে।"

স্বমীজী'কে ধৃষ্ট এবং মূর্খ বলা কাশী নরেশের অশিষ্টতার চরম সীমা ছিল। আচ্ছা এমন ব্যক্তি কোনভাবে পক্ষপাতশূন্য হতে পারে ?

তাছাড়া স্বামী দয়ানন্দের সাথে শাস্ত্রার্থ করা ব্যক্তি একজন-দুইজন নয়, ২৭(সাতাশ) ছিল। মহাভারতের কর্ণের উদাহরণ এই বিষয়ে সমুচিত ছিল না। অভিমন্যুকে কর্ণ সহ ছয়জন মহারথী অন্যায়পূর্বক হত্যা করেছিল। কর্ণকে কখন সেই মহারথদের দ্বারা হত্যা করা হয়েছিল ? এই প্রকারের বিচ্ছিন্ন পাগলের প্রলাপ দ্বারা কাশীরাজের অসভ্যতা এবং অযোগ্যতা প্রকট হয়।

পুনরায় এই প্রকার পক্ষপাতগ্রস্ত কাশীরাজের প্রতি প০ সত্যব্রত সামশ্রমীর এই লেখা -

শ্রীমন্মহারাজস্তু গভীরধীরশ্চারুচক্ষুর্দ্দষ্টব্যাদ্যন্তম্' অর্থাৎ গম্ভীর বুদ্ধি এবং উত্তম দৃষ্টিশক্তির শ্রীমান মহারাজ -অর্থলোভী রাজার চাটুকারিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। রাজ্যের অধীনে বসবাস করা সংস্কৃতের বিদ্বানদের দ্বারা রাজাদের চাটুকারিতাপূর্ণ মিথ্যা প্রশংসার উদাহরণ সংস্কৃত সাহিত্যে কম নেই। কাশী শাস্ত্রার্থের প্রমুখ পৌরাণিক পণ্ডিত বালশাস্ত্রী রাণী ভিক্টোরিয়া দ্বারা ভারতবর্ষের শাসন অধিকার নিজের হাতে নেওয়ার পর তার প্রশংসায় মহাকবি বাণভট্টের প্রসন্ন এবং প্রাঞ্জলশৈলীতে অভিরাম বচনাবলী সংস্কৃততে লিখেছিল, যেটাকে অত্যান্ত আনন্দদায়ক ভাবে প০ বলদেব উপাধ্যায় ' কাশীর পণ্ডিত পরম্পরা' নামের পুস্তকে পৃষ্ঠা ১৯২-এ উদ্ধৃত করেছেন।

কাশী শাস্ত্রার্থের সম্বন্ধে পদ্মবিভূষণ পং০ বলদেব উপাধ্যায়ের মিথ্যা লেখন -

কাশী শাস্ত্রার্থের সম্বন্ধে বাস্তবিকতাকে গোপন রেখে মিথ্যা কপোকল্পিত লেখার জন্য পৌরাণিক পণ্ডিতদের পরম্পরায় পদ্মভূষণ প০ বলদেব উপাধ্যায়ের শীর্ষ স্থান রয়েছে। উনি তার প্রসিদ্ধ বই 'কাশীর পণ্ডিত পরম্পরা' (বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বানারসী, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৩ খ্রি.) এ নিজের পক্ষ থেকে মিথ্যা মনগড়া বানিয়ে লিখেছেন যে-

শাস্ত্রার্থের সমাপ্তির পরে দয়ানন্দ জী চিন্তিত তথা অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। পরাজয়ের পীড়া উনার হৃদয়কে আঘাত করতে শুরু করে। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ জী তখন দয়ানন্দের পীঠ নিজের হাত দিয়েবুলিয়ে দিয়ে বনারসী ভোজপুরীতে অনেক ভালোবাসার সাথে বললেন- 'স্বামী, কিছুদিন কাশীর পণ্ডিতদের সাথে থেকে কিছু শিখুন । উদাস হয়ে থাকলে হবে না।' বিশুদ্ধানন্দ জী প্রেমভরা কথা শুনে দয়ানন্দ জী হাসতে লাগলেন, প্রসন্ন হলেন এবং এই প্রসন্ন বাতাবরণে এই ঐতিহাসিক শাস্ত্রার্থের সমাপ্তি ঘটলো। ' (কাশী কে পণ্ডিত পরম্পরা (দ্বিতীয় ভাগ) পৃ০ ৪২)।

প০ বলদেব উপাধ্যায় কাশী শাস্ত্রার্থের এই বিবরণের উপর ভিত্তি করে গ্রন্থ হিসেবে প০ সত্যব্রত সামশ্রমী দ্বারা 'প্রত্নকম্রনন্দিনী' তে প্রকাশিত বিবরণ মেনেছেন এবং এই বিবরণের পুনরায় প্রকাশিত করে সর্বসুলভ করানোর জন্য স্বামী কেশবপুরীজী কে ধন্যবাদ দিয়েছেন।

উপাধ্যায়জীর দ্বারা প্রমাণ রুপে নির্দিষ্ট 'সচ্চা কাশী শাস্ত্রার্থ' (পণ্ডিত মথুরাপ্রসাদ দীক্ষিত দ্বারা প্রকাশিত) এর স্বামী কেশবপুরীজী দ্বারা পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ আমার কাছে আছে, কিন্তু এটাতে কোথাও উক্ত উদ্ধৃতি নাই, যা উপাধ্যায়জী লিখেছেন। এর দ্বারাই পণ্ডিত বলদেব উপাধ্যায়জীর মিথ্যা লেখা উন্মোচিত হয়ে যায়। পণ্ডিত বলদেবজী উপাধ্যায় এতো অধিক অসত্য লেখার পরও লজ্জিত হননি।

যখন স্ব০ পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসকজী 'বেদবাণী' তে নিজের লেখার দ্বারা কাশী শাস্ত্রার্থ এর বাস্তবিক বিবরণ সম্পর্কে উনাকে অবগত করালে উপাধ্যায়জী বেদবাণী তে লেখেন যে 'আমি কাশী শাস্ত্রার্থ সম্বন্ধে আর্যসামাজিক সাহিত্য পাইনি। আপনার (মীমাংসকজী) দ্বারা পাঠানো সামগ্রীর প্রয়োগ নিজের পুস্তকের পরবর্তী সংস্করণে করবো।'

কিন্তু পরিস্থিতি ভিন্ন ছিল। কারণ বলদেব উপাধ্যায়জীর কাছে পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসকজী দ্বারা কাশী শাস্ত্রার্থ বিষয়ক পাঠানো সামগ্রী পূর্বেই বিদ্যমান ছিল। তিনি (উপাধ্যায়জী) নিজের এই পুস্তক 'কাশী কি পাণ্ডিত্য পরম্পরা' (দ্বিতীয় ভাগ) এর পৃষ্ঠা ৩৭ এ বেদবাণী এর বিশেষাংকে (নভেম্বর ১৯৭০ ইং) কাশী শাস্ত্রার্থে উপস্থিত ৪০ চল্লিশ বিদ্বানদের নামের তালিকার সাথে সহমত প্রকাশ করেছেন এবং শাস্ত্রার্থে জনতার উপস্থিতি ৬০ ষাট হাজার সংখ্যাকে 'অতিশয়োক্তি' লিখেছেন।

শুধু এটাই নয় উপাধ্যায়জী স্পষ্টতঃ নিজের এই গ্রন্থে বেদবাণী এর নভেম্বর ১৯৭০ ইং অংকে, পৃষ্ঠা-১৫ এর উল্লেখ করেছেন তারপরও 'বেদবাণী' তে নির্জলা মিথ্যা লেখায় তিনি ক্ষান্ত হননি যে 'আমি কাশী শাস্ত্রার্থ এর বিষয়ে অন্য সামগ্রী পাই নি, অনেক প্রচেষ্টা করায় লালা লাজপত রায় এর লেখা এক উর্দু পুস্তক পাই।'

উপাধ্যায়জীর এই মিথ্যা লেখাকে স্ব০ মীমাংসকজী সহজ সাধু স্বভাবের কারণে সত্য মেনে নিয়েছেন। যখন আমি এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করি এবং সম্পূর্ণ তথ্য সম্পর্কে অবগত হই তখন আমার মিত্র পণ্ডিত প্রশস্যমিত্র শাস্ত্রীর সাথে আনুমানিক আজ থেকে ১৩-১৪ বছর পূর্বে [এই লেখা ১৯৯৮ ইং এর। অতএব উপাধ্যায়জীর সাথে দেখা করার ঘটনা ১৯৮৪ ইং এর বোঝা উচিত] উপাধ্যায়জীর সাথে দেখা করতে তার আবাসস্থানে যাই তো অনেক কষ্টে তিনি দেখা করতে রাজি হন। কিন্তু কথা শুরু হতেই তার পুত্র বা পৌত্র আসে আর আমাদের উপর রাগান্বিত হয়ে তার পিতা বা পিতামহ মহোদয়কে প্রায় ঠেলে জোরপূর্বক ঘরের ভেতরে নিয়ে যায়। এটা পদ্মবিভূষণের মতো সম্মানিত পদবী দ্বারা বিভূষিত বারাণসীর পণ্ডিতদের মধ্যে অগ্রগণ্য বিদ্বানের অসদ্ ব্যবহার আর মিথ্যা লেখার লজ্জাস্পদ প্রসঙ্গ।

শেষে আমি প্রসিদ্ধ সনাতন ধর্মাবলম্বী বিদ্বান, ব্যাকরণ, কাব্য, পুরাতত্ত্ব এবং ভাষাবিজ্ঞানের মর্মজ্ঞ ও হিন্দি সাহিত্যের অমর শিল্পী পণ্ডিত চন্দ্রধর শর্মা গুলেরী এর দ্বারা কাশী শাস্ত্রার্থ এর সম্বন্ধে তার লেখার আবশ্যক উদ্ধৃত করে এই প্রসঙ্গকে সমাপ্ত করছি-

আর না এই সময় আসবে যে এক বেদপাঠী গুজরাতী সন্ন্যাসী কাশীর পণ্ডিতদের ঘায়েল করে ছেড়ে দিবে ---- স্বামী দয়ানন্দ ধূমকেতুর মতো কাশীতে এসে পৌঁছায় এবং অটল সমুদ্রের মতো কাশীর সৈকত তার আসায় গোড়া পর্যন্ত নড়ে ওঠে। মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় যে স্বামী যেখানেই মন্ত্রপাঠকারী বৈদিকদের সাথে দেখা করে সেখানেই তাদের ভাষ্যব্যাপী ব্যাকরণের উপর স্থিত অর্থজ্ঞান দ্বারা বাকরুদ্ধ করে দেয় আর যেখানেই নব্য বৈয়াকরণ দেখে সেখানেই তিনি 'ঘটো ঘটঃ' এর বাণ নিক্ষেপ করে তাদের নিজের সহজ ব্যাকরণের কুশলতায় হাবুডুবু খাওয়ায়। যিনি [অর্থাৎ স্বামী দয়ানন্দজী] নব্য নির্দয়তার সাথে [পণ্ডিতদের] 'কল্মসংজ্ঞা' তে জড়জড়িত করে দিয়েছেন আর যাদের সম্পূর্ণ শতপথ ব্রাহ্মণ কণ্ঠস্থ ছিল তাদের একটি শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করে বাকরুদ্ধ করে দিয়েছেন।' ('মর্যাদা' পত্রিকা, ভাগ-৩, পৃষ্ঠা ১৫২-১৫৮, সাল ১৯১১ ইং)।

আরো পড়ুন- সত্যব্রত সামশ্রমী - প্রদীপের নিচেই যিনি অন্ধকারের স্রষ্টা =

https://back2thevedas.blogspot.com/2022/03/blog-post_23.html

দলিত-অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে মহর্ষি দয়ানন্দের দৃষ্টান্ত

ঋষি দয়ানন্দ জীবন - চরিত্রের বিভিন্ন প্রসঙ্গের সংকলন প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে স্বামীজি জন্মসূত্রে জাতিপ্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং তিনি তাঁর যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী কণ্ঠে প্রচলিত জাতিপ্রথাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন।

হরিদ্বারের কুম্ভ মেলায় পুরুষসূক্তের মন্ত্র নিয়ে আলোচনা

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে হরিদ্বারের বিখ্যাত কুম্ভ মেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। স্বামীজি হরিদ্বারে পৌঁছলেন। স্বামীজি 'পাখণ্ড খণ্ডনী পতাকা' উড়িয়ে বিপ্লবের শঙ্খধ্বনি করলেন। মেলায় কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত স্বামী বিশুদ্ধানন্দ উপস্থিত ছিলেন। তিনি যজুর্বেদের ৩১ তম অধ্যায়ের একাদশ তম মন্ত্র পাঠ করেন -

ব্রাহ্মণোস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ ।ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥

এর ব্যাখ্যা করা হয়েছিল যে, ব্রাহ্মণরা পরমেশ্বরের মুখ থেকে, ক্ষত্রিয়রা বাহু থেকে, বৈশ্যরা উরু থেকে এবং শূদ্ররা পা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। স্বামীজি তা খণ্ডন করে বললেন, যদি এর অর্থ এই হয় তাহলে মুখ থেকে কফও তৈরি হয়। এর শুদ্ধ অর্থ দিয়ে তিনি বলেন, ব্রাহ্মণ সমাজের মুখের মতো, ক্ষত্রিয় বাহুর মতো, বৈশ্য উরুর মতো এবং শূদ্র পায়ের মতো।

- (পণ্ডিত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় - মহর্ষি দয়ানন্দের জীবন- চরিত, প্রথম সংস্করণ ১৯৯০ বি০, আর্য সাহিত্য মন্ডল আজমের, পৃষ্ঠা ১৩৫ -৩৬, ভাগ-১)

বিশেষ- এই ঘটনাটি স্বামীজির ধর্ম প্রচারের প্রথমদিকের। সেই সময় পর্যন্ত স্বামীজি অনেক দার্শনিক তথা আদর্শিক বিষয় সম্পূর্ণরূপে নিশ্চয় করতে সক্ষম হননি । কিন্তু তাঁর জীবনের এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, প্রথম থেকেই স্বামীজি জন্মগতভাবে নয়, গুণ ও কর্ম অনুসারে বর্ণব্যবস্থা বিশ্বাস করতেন ।

মাঝির অর্ধেক রুটি খাওয়া

স্বামীজি হরিদ্বার থেকে কনখল, লটৌরা, শুক্রতাল, মিরাপুর, মুহম্মদপুর, পরীক্ষিতগড় হয়ে গড়মুক্তেশ্বরে পৌঁছেছিলেন। এখানে তিন দিন না খেয়ে থেকেছেন। কারণ তখনকার দিনে স্বামীজির নিয়ম ছিল যে, তিনি কারো কাছে কিছু চাইতেন না, যে তাকে কিছু দিতেন, তিনি শুধু তাই খেতেন। তিন দিন পর মাঝি (নৌকা চালনাকারী) তার অর্ধেক রুটি ছিড়ে তাঁকে দিয়ে দিলেন এবং তিনি শুধু সেইটুকুই খেয়ে রইলেন।

সাধের বাড়ির ভাত খাওয়া

একদিন সুখবাসীলাল সাধ স্বামীজির জন্য তরকারি ও ভাত নিয়ে এলেন এবং স্বামীজি তা খেলেন। এতে তথাকথিত ব্রাহ্মণরা বললেন, আপনি সাধের বাড়ির খাবার খেয়ে কলুষিত হয়ে গেছেন। মহারাজ উত্তরে বললেন, খাবার দুভাবে নষ্ট হয়,
প্রথমত, কাউকে দুঃখ দিয়ে এবং তা থেকে অর্থ আয় করে সেটা দিয়ে অন্নাদি ক্রয় করলে,
দ্বিতীয়ত খাবার নোংরা হয়ে গেলে বা তাতে কিছু নোংরা জিনিস পড়ে গেলে।
সাধ লোকদের কষ্টার্জিত অর্থ, তা থেকে প্রাপ্ত খাদ্যই উত্তম। অতঃপর ব্রাহ্মণরা বাকরুদ্ধ হয়ে রইলেন।
- (১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ, ফররুখাবাদ, পৃষ্ঠা ১৬৯, ভাগ - ১)

নাপিতের রুটি

একদিন একজন নাপিত স্বামীজির জন্য তার বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে এসে তাকে অনুরোধ করে বললেন "আজ আমার ভিক্ষা গ্রহণ করুন"। স্বামীজি সানন্দে তা গ্রহণ করলেন। উপস্থিত লোকেরা বলতে লাগল " মহারাজ এটি তো নাপিতের দেয়া রুটি"। তেজস্বী ভঙ্গিতে মহর্ষি উত্তর দিলেন, "এটা নাপিতের রুটি নয়, এটা গমের রুটি " এবং পরম ভালোবাসায় সেটি গ্রহণ করলেন।

- (১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ, অনূপশহর, পৃষ্ঠা ২৩৯, ভাগ - ১)

ভুট্টার রুটি

"স্বামীজির জন্য তার ক্ষত্রিয় শিষ্যদের কাছ থেকে প্রায়ই খাবার আসতেন। একদিন মহারাজ একটি চত্ত্বরে বসে ছিলেন। তার জন্য তখনও খাবার আসেনি। এক কৃষক ভুট্টার মোটা মোটা রুটি নিয়ে বাড়ি থেকে আসছিলেন। যখন তিনি চত্ত্বরে পৌঁছলেন তখন তার রুটি মহারাজের সেবায় উৎসর্গ করার ইচ্ছা জাগলো। তিনি বিনীতভাবে প্রণাম করলেন এবং অনুরোধ করলেন যে, মহারাজ আজ আমার শুকনো মোটা রুটি খেয়ে আমাকে কৃপা করুন। মহারাজ কৃপাপূর্বক তার প্রার্থনা গ্রহণ করলেন এবং অত্যন্ত আনন্দের সাথে তার খাবার গ্রহণ করলেন। কৃষকের মন প্রফুল্ল হয়ে উঠল এবং তার চোখ প্রেমের জলে ভরে উঠল।"

- (১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ, ছলেসর, পৃষ্ঠা ২৪২, ভাগ- ১)

কার হাতে খাওয়া যাবে এই নিয়ে পাদ্রী লালবিহারী দের সাথে কথোপকথন

১৮৭২ সালের এপ্রিল মাসে স্বামীজি বাংলায় যাওয়ার সময় মুঘলসরায় অবস্থান করেন। সেখানে তিনি ১০ দিন অবস্থান করেন। একদিন কলকাতার বিখ্যাত পাদ্রী লালবিহারী দে স্বামীজির সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং ধর্ম বিষয়ে স্বামীজির সঙ্গে কথা বলেন। এই কথোপকথনে, প্রকৃতি-বিষয় সম্পর্কিত

কথোপকথনটি নিম্নরূপ হয়েছিল-

পাদ্রী- আপনি কি আমাদের হাতের খাবার খেতে পারবেন?

দয়ানন্দ - আপনি কেন, যদি আপনার চেয়ে নিচু কোনো লোক থাকে এবং তার হাতের খাবার খাওয়ার যদি রুচি হয় তাহলে আমি তার হাতের খাবার খেতে পারি।

- (পৃষ্ঠা ২৪৪- ২৪৫, ভাগ- ১)

বর্ণ কর্মের উপর নির্ভরশীল, রন্ধন কর্ম হলো শূদ্রের কর্ম

মি.এইচ.ডব্লিউ আলেকজান্ডারের এর সাথে আরায় স্বামীজির কথোপকথন হয়। বাবু রজনীকান্ত স্বামীজির সংস্কৃত কথাবার্তা ইংরেজিতে অনুবাদ করতেন। প্রকৃত প্রেক্ষাপট সম্পর্কিত কথোপকথনের অংশ -

"এরপর হিন্দুদের রীতিনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়। বর্ণ বৈষম্য সম্পর্কে স্বামীজি বলেছিলেন যে বর্ণ কর্ম এবং চরিত্রের উপর নির্ভর করে। এ প্রসঙ্গে স্বামীজি আরও বলেন যে, আগে ব্রাহ্মণরা পাচকের কাজ করত না, রন্ধনকর্ম হলো সেবার কাজ আর সেবা হলো শূদ্রের কাজ, প্রাচীন যুগে শুধু শূদ্ররাই রান্নার কাজ করতো। পরে পুরাণ নির্মাতারা এই প্রথাকে উল্টে দিয়ে অনিষ্ট করেছে। "

- (সেপ্টেম্বর ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২৪৯)

জাতিভেদ ও বর্ণ নিয়ে প্রশ্নোত্তর ও সংজ্ঞায়ন

কলকাতার আদি ব্রাহ্ম সমাজের বিখ্যাত প্রচারক পণ্ডিত হেমচন্দ্র চক্রবর্তী একদিন স্বামীজির কাছে এসে তাঁকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করলেন।

"প্রশ্ন- জাতিভেদ আছে নাকি?

উত্তর- জাতিভেদ আছে, যেমন মানব জাতি, পশু জাতি, পক্ষী জাতি।

স্বামীজির এই উত্তর শুনে চক্রবর্তী মহোদয় চুপ হয়ে গেলেন পরবর্তীতে স্বামীজি বললেন, 'আপনি সম্ভবত বর্ণভেদ বোঝাচ্ছেন। চক্রবর্তী বললেন- 'হ্যাঁ'।

এই বিষয়ে স্বামীজী বললেন- পার্থক্য আছে, যারা বেদজ্ঞ ও পণ্ডিত তারা ব্রাহ্মণ, যারা যুদ্ধ করে এবং জ্ঞানী তারা ক্ষত্রিয়, যারা ব্যবসা করে তারা বৈশ্য এবং যারা মূর্খ তারা শূদ্র, যারা মহামূর্খ তারা অতিশূদ্র।

- (১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২৫৭-২৫৮)

বর্তমান জন্মগত বর্ণভেদকে অস্বীকার

কলকাতায় অবস্থানকালে (১৮৭২ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৮৭৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত) ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকা (কলকাতা) স্বামীজির বক্তব্যের উপর মন্তব্য করেছে। সেই মন্তব্যের উদ্ধৃতি- "তিনি জাত-ভেদ মানেন না, তিনি জ্ঞান ও ধর্মের সামঞ্জস্য অনুসারে বর্ণ-ভেদ বা মর্যাদা-ভেদ গ্রহণ করেন।"

- (পৃষ্ঠা ২৬৫)

বর্ণ পরিবর্তনে মনুস্মৃতির প্রমাণ

মানব জাতির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্। ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবং তু বিদ্যাবৈশ্যাত্তথৈব চ।।

"কর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ শূদ্র হয় এবং শূদ্র ব্রাহ্মণ হয় এটিই পুরানো রীতি। যদি কোন [তথাকথিত] ব্রাহ্মণ দুশ্চরিত্র, মূর্খ এবং ধর্মহীন হয় তবে তাকে শূদ্র করা উচিত এবং যদি একজন [তথাকথিত] শূদ্র জ্ঞানী, সচ্চরিত্র এবং ধার্মিক হয় তবে তাকে ব্রাহ্মণ করা উচিত।

- (পৃষ্ঠা ২৬৬)

হুগলিতে জন্মগত বর্ণবাদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা

স্বামীজি হুগলিতে বর্ণবৈষম্য নিয়ে বক্তৃতা দেন। তিনি বলেছিলেন- "আজকাল ভারতে শুধু ব্রাহ্মণ শ্রেণীকেই পাঁচনের কাজ করতে দেখা যায়, প্রাচীনকালে এমনটা ছিল না। ব্রাহ্মণের কাজ রান্না করা নয়। যদি তাই হতো তবে অজ্ঞাতবাসের সময় বিরাট-ভবনের প্রধান রাঁধুনী ভীম কিভাবে হলেন? এই কথাটি নেই যে প্রাচীনকালে বর্ণ জন্মগত ছিল না। জন্মগত তো ছিল, কিন্তু নিম্নবর্ণের ব্যক্তিরা গুণ, কর্মের মাধ্যমে উচ্চতর এবং উচ্চবর্ণের ব্যক্তিরা তাদের কর্মদোষে নিম্নতর হয়ে গিয়েছিল।" বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্বামীজির কাছাকাছি বসে ছিলেন। স্বামীজি তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "যদি প্রাচীনকাল হতো, তাহলে এই বিনয়ী, ভদ্র, গুণী বাবু অবশ্যই ব্রাহ্মণ হয়ে যেতেন।"

- (পৃষ্ঠা ২৭৫- ২৭৬)

অস্পৃশ্যতার কলঙ্কে অবিশ্বাস

ঠাকুর প্রসাদ নামে একজন ছিলেন যিনি স্বামীজির পরম ভক্ত। তিনি প্রতিদিন স্বামীজির জন্য বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে আসতেন। প্রথম দিন খালি পায়ে খাবার নিয়ে আসলে মহারাজ এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন, জুতা পরে খাবার আনা ভালো নয়। স্বামীজি বলেছিলেন যে, "আমি এই অস্পৃশ্যতায় বিশ্বাস করি না, আপনিও এই ফাঁদে পা দেবেন না।"

- (প্রয়াগ, সংবত্ ১৯৩১, পৃষ্ঠা ৩১৭)

গরীব বিদ্যার্থীর প্রতি দয়া

লালা বংশীধর রামায়ণ ছাপিয়ে গরীব বিদ্যার্থীদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি এই কাজটি একজন পণ্ডিতকে দিয়েছিলেন। তবে তিনি শুধু পরিচিতদেরই বই দিতেন। একদিন এক দরিদ্র বিদ্যার্থী মহারাজের কাছে এসে কান্নাকাটি করে বলল, "আমি বারংবার অনুরোধ করেও বইটি পাইনি" । মহারাজ তৎক্ষণাৎ উঠে দাতার কাছে গেলেন।

"কর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ শূদ্র হয় এবং শূদ্র ব্রাহ্মণ হয় এটিই পুরানো রীতি। যদি কোন [তথাকথিত] ব্রাহ্মণ দুশ্চরিত্র, মূর্খ এবং ধর্মহীন হয় তবে তাকে শূদ্র করা উচিত এবং যদি একজন [তথাকথিত] শূদ্র জ্ঞানী, সচ্চরিত্র এবং ধার্মিক হয় তবে তাকে ব্রাহ্মণ করা উচিত।

- (প্রয়াগ, সংবত ১৯৩১, পৃষ্ঠা ৩১৭)

নিজের নয়; দুঃখী, গরিব এবং দরিদ্রের মুক্তির চিন্তা

"একদিন এক গরিব বৃদ্ধ মহাত্মা যিনি গঙ্গার তীরে থাকতেন। তিনি মহারাজকে বললেন, আপনি যদি পরোপকারে ঝগড়ায় না জড়াতেন, তাহলে এই জন্মেই আপনি মুক্তি পেতেন। মহারাজ উত্তরে বললেন, আমি আমার মুক্তির জন্য চিন্তিত নই। আমি সেই লাখ লাখ মানুষের মুক্তির বিষয়ে উদ্বিগ্ন যারা দুঃখী, গরিব এবং দরিদ্র।"

—(প্রয়াগ, সংবৎ ১৯৩১, পৃষ্ঠা ৩১৭)

বর্ণ ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বামীজির মন্তব্য- বর্ণনা

সংবত ১৯৩১ সালে স্বামীজি আশ্বিন মাসে নাসিকে গিয়েছিলেন। নাসিকে, সাব-জজ রায় বাহাদুর বিষ্ণু মোরেশ্বর ভিডের বাসভবনে, স্বামীজির সঙ্গে পণ্ডিতদের শাস্ত্রার্থের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বোম্বাইয়ের সংবাদপত্র 'ইন্দু প্রকাশ' লিখেছে -

"যে অর্থে 'জাতি' শব্দটি সাধারণত গৃহীত হয় আদৌ এর অর্থে সেভাবে গৃহীত হয় না। বর্ণ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত বেদের উপর নির্ভরশীল বলে বর্ণনা করেছেন যে, বর্ণ হলো মানুষকে তাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক যোগ্যতা অনুযায়ী বিভক্ত করার নাম। একজন শূদ্র যদি যথেষ্ট জ্ঞানী হয় তবে সে একজন ব্রাহ্মণ এবং একজন পাপী ব্রাহ্মণ শূদ্রের চেয়ে নিম্ন বর্ণের। তার মতে, বর্ণ একটি পরিস্থিতির নাম, যা একজন মানুষ হারাতে পারে যদি সে স্থির ও দ্ব্যর্থহীন নিয়ম অনুসরণ না করে। পুরো নিয়ম অনুসরণ করার পরই তা প্রাপ্ত করা যেতে পারে।"

- (পৃষ্ঠা ৩১৯- ৩২০)

আহমেদাবাদে স্বামীজির অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অবস্থানের প্রভাব

স্বামীজি ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে (১৯৩১ বিক্রমী) আহমেদাবাদে ছিলেন। ১৮৭৫ সালের ৭ ই জানুয়ারির 'হিতেচ্ছু' পত্রে একজন লেখক লিখেছিলেন -

"সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত দয়ানন্দের জ্ঞান যে অত্যন্ত বিস্তৃত তাতে কোন সন্দেহ নেই। মূর্তিপূজাকে আশ্রয় করে লোভময় এবং অসদ্ভাবপূর্ণ সংস্থা যারা ধর্মের নামে সাধারণ মানুষদের ভিক্ষুক বানায়,

বাল্যবিবাহের কুপ্রভাব, জাতপাতের বৈষম্য ইত্যাদির কুফল ও ত্রুটি সম্পর্কে তাঁর অকপট বর্ণনা চিরকাল তাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে থাকবে, যারা তার বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। নিঃসন্দেহে পণ্ডিত দয়ানন্দজী এমন ব্যক্তি ছিলেন যে, যাকে বর্তমান হিন্দুদের অধঃপতিত অবস্থার জন্য প্রয়োজনীয়। আমি নিশ্চিত যে তার মতো বহু মানুষ যদি সারাদেশে সত্য ধর্ম প্রচার করে এবং খাদ্য, পান, স্থান, ব্রত সম্পর্কে মূর্খ চিন্তা-ভাবনাকে যারা এই ধর্মের অঙ্গ মনে করে তাদের খণ্ডন করলে ভারতবর্ষের অবস্থা এইরকম হতো না, অর্থাৎ নির্বল শরীর ও নির্বল বুদ্ধির অধিকারী মনুষ্য জাতি থাকতো না।"

- (পৃষ্ঠা ৩৫১-৩৫২)

স্বামীজীর বক্তব্যের সারসংক্ষেপ

২১ই জানুয়ারি ১৮৭৫ সালে, স্বামীজি রাজকোট থেকে আহমেদাবাদে পৌঁছালো এবং আমেদাবাদ এসে খুব সুন্দর বক্তৃতা দিলেন, যার সারসংক্ষেপ হলো-

"আর্যদের অন্তর্দ্বন্দ্ব তথাকথিত ব্রাহ্মণদের সাথে এর কারণ তারা নিজ স্বার্থের জন্য বাকিদের বেদ পড়াই নেই, আমাদের ধর্মকে এত খণ্ডবিখণ্ড করেছে যে এখন জানা কঠিন হয়ে গেছে যে কোনটি সঠিক ?

ফলে লোকেরা ভুলে মূর্তির সামনে মাথা নত করতে শুরু করে, এই ভেবে যে ব্রাহ্মণরা মন্ত্রের মাধ্যমে দেবতাদের প্রাণঃপ্রতিষ্ঠা করে এবং তার মধ্যে সত্য ঈশ্বর বাস করে ভেবে লোক তাদের মাথা নত করা শুরু করতে লাগলো। একমাত্র তারাই তাদের কাজে সফল, যারা বিশ্বাস করে ঈশ্বর এক, অনাদি, অজর, অমর, নিরাকার। তারা তাদের ধর্মের প্রসারের পদ্ধতি ছড়িয়ে দেয়, তাদের মন একে অপরের সাথে মিশে যায়, পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় এবং ধর্মের গৌরব আসে। তারা একে অপরকে সম্ভাব্য সব উপায়ে সাহায্য করে। দেখুন অগ্রজ ভারতের দিকে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের দিকে কারা কতটা শক্তিশালী। এর কারণ হলো তাদের মনের মিলন এবং তাদের এক সম্প্রদায় হওয়া।"

- (পৃষ্ঠা ৩৫৮)

স্বামীজীর জয় ও জন্মগত বর্ণবাদী শাস্ত্রীদের বিরুদ্ধে রায়

বেদার্থের উপর আলোচনার পর, শাস্ত্রীরা স্বামীজির সাথে মূর্তি পূজা এবং বর্ণাশ্রম নিয়ে আলোচনা করেন। শাস্ত্রীদের মধ্যে ভোলানাথ সারাভাই এবং অম্বালাল সাগরমলকে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে নিযুক্ত করা হলো। আলোচনা শেষে মধ্যস্থকারীরা স্বামীজির পক্ষে সম্মতি জানায় এবং শাস্ত্রীদের বিরুদ্ধে মতামত দেয়।

শেষে সকলে স্বামীজিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তার বক্তৃতায় সন্তুষ্ট হয়ে গোপালরাও হরি দেশমুখ একটি সুন্দর পীতাম্বর উপহার দেন।
- (পৃষ্ঠা ৩৬০)

শূদ্রদের উপস্থিতিতে মহর্ষির বেদপাঠ

সংবত্ ১৯৩২ সালে (১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ) মুম্বাইতে স্বামী দয়ানন্দের সাথে পণ্ডিত কমলনয়নাচার্যের 'মূর্তিপূজা বেদানুমোদিত নয় ' - এই বিষয়ে বিতর্ক হওয়ার কথা ছিল। স্বামীজী বেদ মন্ত্র পাঠ করার সাথে সাথে - "পণ্ডিত কমলনয়নাচার্য বলল, শূদ্ররাও উপস্থিত থাকে এমন সমাবেশে বেদ মন্ত্র পাঠ করা শাস্ত্রে নিষেধ, তৎক্ষণাৎ তিনি সমাবেশ ত্যাগ করলেন। উপস্থিত লোকেরা তাকে অনেক বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু তিনি থামেননি। এ সময় কিছু লোক তাকে নিয়ে উপহাস সূচক কথাও বলে।
- (পৃষ্ঠা ৩৮২, ভাগ - ১)

জন্মগ বর্ণবাদ খণ্ডন ও সবার বেদাধিকার দেওয়াতে পৌরাণিকদের তাণ্ডব

যেখানে তিনি একা এবং সেইসব লোক, যাদের জ্ঞানচক্ষু কিছুটা উত্তলিত হয়েছে তারা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে মহারাজের বক্তৃতা শুনতেন, অন্যদিকে পৌরাণিকদল তার বক্তৃতা শুনে অত্যন্ত বিরক্ত ও উত্তেজিত ছিল। জন্মগতভাবে বর্ণবৈষম্যের উপর তার অনির্ভরশীলতা, সকলকে সমানভাবে বেদাধিকার দেয়া, মূর্তিপূজাকে বেদের বিরুদ্ধে আখ্যায়িত করা ইত্যাদির জন্য পৌরাণিকরা প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে গেলো যে তারা বিভিন্ন উক্ত সভায় তাণ্ডব শুরু করলো এবং ষড়যন্ত্র করার জন্য নেমেছিল।
- (পুনা, ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৮৫, ভাগ - ১)

গুণ-কর্মগত বর্ণের উপর মনুস্মৃতির প্রমাণ ও প্রক্ষিপ্তবাদ

একদিন স্বামীজি প্রচার করছিলেন যে বর্ণভেদ গুণের উপর ভিত্তি করে, জন্মের উপর নয় এবং তার বক্তব্যের সমর্থনে মনুস্মৃতির কিছু শ্লোক পাঠ করছিলেন। এক ব্যক্তি বললেন যে মনুস্মৃতির অন্যান্য শ্লোকও এর বিরুদ্ধে। স্বামীজি উত্তর দিলেন সেই শ্লোক প্রক্ষিপ্ত।
- (সাতারা, ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৯৩, ভাগ- ১)

মহর্ষি শূদ্রের সামনে বেদপাঠ করায় শাস্ত্রীরা কানে আঙুল দিলেন

১৮৭৬ সালে, বড়ৌদায় স্বামীজির বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রথম বক্তৃতা ছিল দেশোন্নতি এবং দ্বিতীয়টি বেদাধিকারের ওপর। স্বামীজি 'যথেমাং বাচং কল্যাণী' প্রভৃতি বেদ-মন্ত্র পাঠ করে বক্তৃতা শুরু করার সাথেসাথে শাস্ত্রীরা তাদের কানে আঙুল দিয়ে

দাঁড়িয়ে কোলাহল করতে শুরু করেছিলেন। কারণ ওইসব লোকের বিশ্বাস অনুযায়ী শূদ্র ও যবনদের সামনে বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করা উচিত নয়। শূদ্র ও যবনদের সামনে বেদ-জপ নিষিদ্ধ ছিল। কিছু শাস্ত্রী এমনও বলেছেন যে স্বামীজী ব্রাহ্মণ নন, তা না হলে তিনি এই কাজ করতেন না।

- (পৃষ্ঠা ৩৯৪, ভাগ- ১)

বঙ্গদর্শন'-এ স্বামীজির কাজের সমীক্ষা

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজির বোম্বে ও পুনাতে অবস্থান এবং এই সময়ের মধ্যে স্বামীজির কাজের আলোচনা কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় পাওয়া যায়। এই বিষয় সম্পর্কিত কিছু অংশ -

"সর্বত্র দয়ানন্দের কথা হচ্ছে। দয়ানন্দের বক্তৃতা শক্তি, দয়ানন্দের সামাজিক মতামত, দয়ানন্দের নতুন ধরনের বেদব্যাখ্যা সর্বত্র আলোচিত হয়। সামাজিক বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও উন্নত।

- (পৃষ্ঠা ৪০২- ৪০৩, ভাগ- ১)

বেদ পড়ার অধিকার সকল মানুষের রয়েছে

সংবত ১৯৩৪ -এ লাহোরে 'বেদ ও বেদোক্ত ধর্ম' বিষয়ে স্বামীজির প্রথম বক্তৃতা ১৮৭৭ সালের ২৫ এপ্রিল হয়েছিল। স্বামীজির এই বক্তৃতার সারসংক্ষেপ 'কোহেনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেই বক্তৃতার সারসংক্ষেপ পণ্ডিত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তার নিজের 'মহর্ষি দয়ানন্দের জীবন-চরিত' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

এই বক্তৃতার সারাংশের প্রকৃতি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত অংশটি নিম্নরূপ -

"বেদ পাঠ করার অধিকার সকল মানুষেরই আছে। যজুর্বেদের ২৬ তম অধ্যায়ের ২ইয় মন্ত্রে পরমেশ্বর বলেছেন যে, আমি যেভাবে এই কল্যাণকারিনী বাণী সমস্ত মানুষকে উপদেশ করেছি, তেমনি তোমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য , শূদ্র এবং অতি শূদ্রদের কাছে তা উপদেশ করতে থাকো।"

- (পৃষ্ঠা ৩৯- ৪০, ভাগ- ২)

বর্ণ জন্মের উপর নয় কর্মের উপর নির্ভর করে

স্বামীজি লাহোরে (বাওলী সাহেবের জায়গায়) দ্বিতীয় বক্তৃতাও দিয়েছিলেন শুধুমাত্র 'বেদ ও বেদোক্ত ধর্ম' বিষয়ে, কারণ প্রথম বক্তৃতায় বিষয়টি শেষ হয়নি। এই বক্তৃতায় তিনি বর্ণনা করেছেন যে – "বর্ণ ব্যবস্থা গুন ও কর্ম অনুসারে, জন্মের উপর নির্ভরশীল নয়। যে ব্রাহ্মণের কাজ করে সে ব্রাহ্মণ, অন্যথায় সে শূদ্র। মানুষ এই জন্মেই তার জাত পরিবর্তন করতে পারে, শূদ্র ব্রাহ্মণ হতে পারে এবং ব্রাহ্মণ শূদ্র হতে পারে।

ধর্ম খাওয়া-দাওয়ায় নয়, এক বর্ণের লোক অন্য বর্ণের হাতের ছোঁয়া রান্না করা খাবার খাওয়া উচিত নয় বেদের কোথাও এমন নিষেধাজ্ঞা নেই।"

- (পৃষ্ঠা ৪০, ভাগ-২)

পাদ্রী হুপারের সাথে বর্ণ বৈষম্য নিয়ে কথোপকথন

৯৩৪ সালে (১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ) ড. হুপার যিনি সংস্কৃতজ্ঞ পাদ্রী ছিলেন, তিনি লাহোরে স্বামীজির সাথে দেখা করতে আসেন। পাদ্রী সাহেব স্বামীজিকে সংস্কৃতে কিছু প্রশ্ন করলেন। স্বামীজি তাকে সংস্কৃতেই উত্তর দিয়েছিলেন। বর্ণ বৈষম্য সম্পর্কিত প্রশ্ন ও উত্তর ছিল নিম্নরূপ -

পাদ্রী সাহেব - বেদ অনুসারে বর্ণভেদ কিভাবে হয়?

স্বামীজি - বেদে বর্ণব্যবস্থা গুণ ও কর্ম অনুসারে হয়।

পাদ্রী সাহেব - আমার গুণ ও কর্ম ভাল হলে আমাকেও কি ব্রাহ্মণ বলা যায় ?

স্বামীজি- সন্দেহ নেই ! তোমার গুণ ও কর্ম যদি ব্রাহ্মণ হওয়ার যোগ্য হয়, তবে তোমাকেও ব্রাহ্মণ বলা যায়।

- (পৃষ্ঠা ৪২, ভাগ-২)

ইন্ডিয়ান মিরর' -এর প্রবন্ধ

সংবত ১৯৩৪ (১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ) সালে লাহোরে স্বামী দয়ানন্দের প্রচারমূলক কাজ এবং এর প্রভাব সম্পর্কে ২২ জুন, ১৮৭৭ সালে কলকাতার ইংরেজি দৈনিক "ইন্ডিয়ান মিরর"-এ একটি নিবন্ধ লেখা হয়েছিল -

তিনি বলেছেন যে ব্রাহ্মণরাই ভারতের পতনের প্রধান কারণ এবং তিনি তাদের উপর সমস্ত দোষ চাপিয়েছেন। তবে তিনি ব্রাহ্মণদের দুটি জিনিসের জন্য প্রশংসা করেন অর্থাৎ মুসলমানদের থেকে ধর্মগ্রন্থগুলোকে রক্ষার করার জন্য এবং লোকেদেরকে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত করা থেকে রক্ষা করার জন্য। তিনি ব্রাহ্মণদেরকে পাপের কুটুম্ব অর্থাৎ পাপের আত্মীয় বলে ডাকতেন। এটি একটি নতুন শব্দ এবং এটি ব্রাহ্মণদের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে। -(পৃষ্ঠা ৫৬- ৫৭, ভাগ- ২)

তারপর ১৮৭৭ সালের ২৩ জুন একজন লেখক ওই দৈনিকে লেখেন-

"যদিও এই প্রশংসনীয় কাজে শিক্ষিত পুরুষের অবদান রয়েছে, কিন্তু শহরের ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে এইকথা বলা যায় না যারা প্রতিটি সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের প্রকাশ্য শত্রু পণ্ডিত শ্রদ্ধারামের নেতৃত্বে এই নবীন সমাজকে জন্ম থেকেই নষ্ট করার বৃথা চেষ্টা করছে।"

- (পৃষ্ঠা ৫৭, ভাগ-২)

বেদাধিকার বঞ্চিত করার বানোয়াট শ্রুতি বিরুদ্ধে মহর্ষি

১৮৭৮ সালের জানুয়ারিতে স্বামী দয়ানন্দ গুজরাট (গুজরানওয়ালা) পৌঁছান। তিনি জালালপুর জট্টার রাস্তার পাশে ফতেহসার নামক উদ্যানে অবস্থান করেন। স্বামীজি তার প্রথম বক্তৃতায় বলেছিলেন যে- এই 'পৌরাণিকরা অনেক বানোয়াট শ্রুতি তৈরি করেছেন'। যেমন- 'স্ত্রীশূদ্রৌ নাধিয়াতাম্'। এ বিষয়ে গোস্বামী শব্দদাস বলেন শ্রুতি আছে এবং আমরা এই বেদে থেকে দেখাব। স্বামীজি বললেন, এইখানে চারটি বেদ আছে, এর থেকে দেখান, তারপর তিনি বললেন, 'আগামীকাল আমাদের বেদ থেকে দেখাবো'। গোস্বামী শব্দদাস পরেরদিন যে বইগুলি এনেছিলেন তা বেদ ছিল না, তাই তিনি বেদ থেকে সেগুলো দেখাতে পারেননি।"

- (পৃষ্ঠা ৮২, ভাগ- ২)

সবার জন্য গায়ত্রী মন্ত্র

ফতেহসারে (গুজরাট) এক সন্ধ্যায় স্বামীজির (১৯৩৪ সংবত) তৃতীয় বক্তৃতা ছিল। তাতে স্বামীজি বলেছিলেন যে- "আমি যদি শুধুমাত্র 'ওতম্' শব্দটি ব্যাখ্যা করতে শুরু করি তবে অনেক দিন এবং অনেক ঘন্টা লাগবে, তাই তিনি 'ওতম্' সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে সন্ধ্যার পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং গায়ত্রী মন্ত্রটি এত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে সরকারি বিদ্যালয়ের এক ফারসি অধ্যাপক মৌলভী মুহম্মদদীন এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি সমাবেশের সামনে দাঁড়িয়ে সবার সামনে বললেন যে যদি গায়ত্রীর এই অর্থ স্বামীজি করে থাকেন তবে আমি নামাজ না পড়ে সন্ধ্যা করবো। স্বামীজি প্রথমেই অবগত ছিলেন যে সকলের সামনে বেদ মন্ত্র এবং বিশেষ করে গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করা ব্রাহ্মণদের খুব বিরক্তবোধ করবে এবং তাই তিনি তার বক্তৃতায় তাদের ভবিষ্যৎ আক্ষেপের উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যদিও আমাদের কাছে একটি রত্ন আছে যা বিশ্বকে দেখানো উচিত, কিন্তু স্বার্থপর লোকেরা স্বার্থপরতার কারণে তা লুকিয়ে রাখে। এই বোকারা জানে না এই রত্ন চুরি করা যায় না। আমি পুরো বিশ্বকে দেখাবো তারপর দেখবো পৃথিবীতে কে কে আছে যে এটাকে বানোয়াট বলে। স্বামীজির যা আশঙ্কা ছিল তা পূর্ণ হলো। নগরের ব্রাহ্মণরা স্বামীজিকে অভিশাপ দিতে থাকে এই বলে যে তিনি একজন খ্রিস্টান একজন সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে লুকিয়ে আছেন। ম্লেচ্ছ ও শূদ্রদের সামনে গায়ত্রী ও বেদ মন্ত্র পাঠ! হরে রাম! হরে রাম!! ব্রাহ্মণরা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে পড়লেন, কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না।

তথাকথিত অস্পৃশ্যদের প্রতি স্বামীজির প্রেম

"সফরমৈনার পল্টন থেকে শিখ সম্প্রদায়ের একজন শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন এবং একপাশে বসে খুব আগ্রহ নিয়ে স্বামীজির কথা শুনছিলেন। তিনি সাদা পোশাক পরেছিলেন। ইতিমধ্যে ছাবনীর একজন পোস্টম্যান স্বামীজিকে ডাকতে এসেছিলেন। তিনি একজন মুসলমান এবং তিনি সেই শিখকে চিনতেন। তাকে সেখানে বসতে দেখে তিনি আগ বাড়িয়ে গিয়ে তাকে বললেন- । "তুমি হতভাগ্য নাপাক! তুমি এতো সম্মানীয় ও বিখ্যাত ব্যক্তির সেবা করতে এসেছ তাও অসম্মানের সাথে এবং তুমি তোমার জাত সম্পর্কে তাদের জানাওনি । একথা শুনে তিনি খুব লজ্জিত হয়ে একপাশে গিয়ে বসলেন। পোস্টম্যান তাকে সেখান থেকেও সরিয়ে দিতে চাইলো, কিন্তু অস্পৃশ্যদের মুক্তিদাতা দয়ানন্দ কখন এটা সহ্য করতে পারে না। স্বামীজি খুব বিনম্রতার সহিত পোস্টম্যানকে বললেন,

"নিঃসন্দেহে এই লোকটি সামান্য ভুল করেছে, যার জন্য যথেষ্ট শাস্তি সে পেয়েছে, এখন আলাদা বসে তার কথা শোনায় কোনো ক্ষতি নেই, তাকে কিছু বলা উচিত নয়।"

তার কথা শোনায় কোনো ক্ষতি নেই, তাকে কিছু বলা উচিত নয়।" লোকটি অশ্রুসিক্ত চোখে হাত জোড় করে বললো আমি কারো ক্ষতি করিনি, আমি সবার থেকে পিছনে জুতা রাখার জায়গায় বসে আছি। স্বামীজি পোস্টম্যানকে বলেছিলেন যে আপনার এত কঠোর আচরণ করা উচিত নয় এবং বুঝিয়ে দিলেন যে ঈশ্বরের সৃষ্টিতে সবাই সমান এবং লোকটিকে উপদেশ শোনার জন্য প্রতিদিন আসতে বললেন।

আপনি মুসলমানদের যতই ঘনিষ্ঠ হন না কেন, এখানে কেউ আপনাকে ঘৃণার চোখে দেখে না। স্বামীজির সান্ত্বনার কথা তাকে খুব খুশি করেছিল এবং তারপর তিনি প্রতিদিন উপদেশ শুনতে আসতে থাকেন।

- (পৃষ্ঠা ১১০, ভাগ- ২)

বাঙালি ভদ্রলোকের সাথে প্রশ্নোত্তর

স্বামীজি ১৮৭৮ সালের আগস্ট মাসে রুড়কিতে ছিলেন। যেখানে একজন বাঙালি ভদ্রলোক পণ্ডিত মেঘনাদ ভট্টাচার্যের সহিত ধর্মবিষয়ক বার্তালাপ হয়েছিলো। প্রশ্নোত্তরে প্রকৃতবিষয় সম্বন্ধিত অংশ - "মেঘনাদ - আমাদের বর্ণবৈষম্যের চর্চা কি ঈশ্বর সৃষ্ট নাকি?

স্বামীজি - না। শ্রেষ্ঠ কর্ম করার মাধ্যমেই ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত।

মেঘনাদ- তাহলে যজ্ঞোপবীত পরার প্রয়োজন কি ?

স্বামীজি - এটি লৌকিক আচরণ এবং উচ্চ বংশের (বর্ণ) চিহ্ন মাত্র। "

- (পৃষ্ঠা ১১৮, ভাগ- ২)

ব্রাহ্মণের গায়ত্রী জপ ও তাতে অব্রাহ্মণের পাপ- পুণ্য

একজন ব্যক্তি স্বামীজির কাছ থেকে গায়ত্রী মন্ত্র শিখেছিলেন এবং স্বামীজি নিজেই তার উচ্চারণ সংশোধন করেছিলেন। ব্রাহ্মণরা বলেছিল যে এটি ব্রহ্ম গায়ত্রী নয় এবং ব্রাহ্মণ ব্যতীত গায়ত্রী মন্ত্র জপ করা পাপ। তিনি যখন স্বামীজিকে এই কথা বললেন, স্বামীজি বললেন যে বা যারা আমাদের দেওয়া গায়ত্রীকে ব্রহ্ম গায়ত্রী বলে না তাদের নিয়ে আসুন এবং এই গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করে আপনার যদি পাপ হয় তা আমার হবে আর পুণ্য হলে তা আপনার হবে।

- (পৃষ্ঠা ১৪৭, ভাগ- ২)

কানপুরে আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠার কারণের একটী জন্মগত বর্ণ বিরোধ

"ইন্ডিয়ান মিরর" কলকাতা ২৮/১২/১৮৭৯ সালের সংখ্যায় মহারাজের এবারের কানপুর সফর সম্পর্কে লেখা ছিল- "ইন্ডিয়ান চার্চ গেজেট" এর সংবাদদাতা বলেছেন যে দয়ানন্দ সরস্বতীর অনুসারী দ্রুত বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে। তার বাণের লক্ষ্য মূর্তিপূজা, ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং বর্ণভেদের ব্যবস্থার উপর। প্রায় এক মাস আগে ঘটে যাওয়া তার শেষ সফরটি অনেক আলোড়ন ও উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল এবং তার আগমনে কানাপুরে বৈদিক (আর্য) সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

- (পৃষ্ঠা ২০৯- ২১০, ভাগ- ২)

দলিতদের ধর্মান্তর নিয়ে চিন্তিত স্বামীজি

একদিন রাতে স্বামীজি হঠাৎ উঠে এদিক ওদিক হাঁটা শুরু করলেন। পায়ের আওয়াজ শুনে এক কর্মচারীরও চোখ খুলে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন মহারাজ কোন সমস্যায় আছেন কি না। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, " খ্রিস্টানরা দলিতদের খ্রিস্টান বানানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে এবং জলের মতো টাকা ঢালছে। এখানে হিন্দুদের ধর্মীয় নেতারা কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমাচ্ছেন। এই দুশ্চিন্তা আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। "

- (দানাপুর, নভেম্বর ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ২২১, ভাগ- ২)

জলে কোন দোষ নেই

আনন্দবাগের ঘরে স্বামীজি একটি চেয়ারে বসতেন এবং আগন্তুক দর্শক মেঝেতে বসতেন। একদিন দর্শনার্থীদের মধ্যে একজন মুসলমান ছিল। স্বামীজি কাহারের কাছে পান করার জন্য জল চাইলেন, তিনি একটি পাত্রে জল আনলেন। তখন এক ব্যক্তি কাহারকে ধমক দিয়ে বললেন,

এই জল স্বামীজির পান করার উপযুক্ত নয়। কাহার আবার পাত্র ধুয়ে পানি আনলো। স্বামীজি সেই ব্যক্তির অর্থ বুঝতে পেরেছিলেন। সংযুক্ত প্রান্তের পূর্বাঞ্চলীয় জেলার এই ঘরে মুসলমান বসে ছিলেন বিধায় কোনো খাবার বা পানীয় গ্রহণ করা হতো না। তাই কাহার ঘরে ঢোকার আগেই স্বামীজি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং সেখানে নিজেই জল পান করলেন। ঘরে এসে স্বামীজি বললেন, আপনি জলকে অপেয় বলেছেন কারণ ঘরে একজন মুসলমান বসেছিল। এটা ঠিক হয়নি, জলের কোনো দোষ ছিল না।

- (১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ, কাশী, পৃষ্ঠা ২২৮, ভাগ - ২)

জন্মগত বর্ণপ্রথার খণ্ডণ

স্বামীজি কাশীতে সংবত ১৯৩৭ সালে (১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ) উপস্থিত ছিলেন। সে সময়ের একটি প্রসঙ্গ নিম্নরূপ -

"একদিন এক ব্যক্তি মহাভাষ্যের একটি শ্লোক পেশ করলেন জন্মসূত্রে বর্ণপ্রথা প্রমাণ করার লক্ষ্যে-

বিদ্যা তপশ্চ যোনিশ্চ এতদ্ ব্রাহ্মণ্যকারকম্।
বিদ্যা তপোভ্যাং যো হীনো জাতিব্রাহ্মণ এব সঃ।।
- (মহাভাষ্যম্ ৪/১/৪৮)

স্বামীজি এর খন্ডন করে মনুর এই শ্লোক পেশ করেন-

যথা কাষ্ঠময়ী হস্তী যথা চর্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি।।
(মনু০ ২/১৫৭)"

- (পৃষ্ঠা ২৩১, ভাগ - ১)

বর্ণ জন্মগত নয়

১৮৮০ সালে স্বামীজি কাশীতে অবস্থান করছিলেন। "একদিন এক ব্যক্তি স্বামীজির কাছে জাতিভেদের বৈষম্যের বিষয়টি তুলে ধরেন। স্বামীজি বলেছিলেন ব্রাহ্মণাদি বর্ণ জন্মগত হওয়া সম্ভব নয়। যদি এমন হয়, ব্রাহ্মণের দুই ছেলের একজন যদি খ্রিস্টান হয়ে যায় এবং অন্যজন মুসলমান হয়ে যায়, তাহলেও কি তারা ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হবে? তুমি যদি রাজি না হও, তাহলে জন্ম থেকেই ব্রাহ্মণ্যত্ব কোথায় ছিল?"

- (পৃষ্ঠা ২৩৪, ভাগ- ২)

শূদ্র ও নারীদের বেদাধিকার

মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত প্রসিদ্ধ সংস্কৃত বিদুষী রমাবাঈ স্বামী দয়ানন্দের সান্নিধ্যে কয়েকদিন মিরাটে অবস্থান করেছিলেন। তিনি স্বামীজির কাছ থেকে বৈশেষিক দর্শন পড়েছিলেন। স্বামীজি চেয়েছিলেন রমাবাঈ প্রাচীনকালের বিদুষী গার্গীর মতো ব্রহ্মচারী হয়ে নারী সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা ও বৈদিক ধর্ম প্রচার করুক। কিন্তু তিনি তার বন্ধু বাঙালি বাবু বিপিন বিহারীকে এম.এ.বি.এল. (যিনি তার সাথে মিরাটে থাকতেন) বিয়ে করতে চেয়েছিলেন এবং গৃহস্থ আশ্রমে যেতে চেয়েছিলেন। চারিত্রিক তথা ধর্মীয় বিষয়ে অব্যবস্থিত হওয়ার কারণে তিনি স্বামীজির প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেননি। তাই স্বামীজি তাকে বিদায় দিলেন। স্বামীজির জীবনী রচয়িতা পন্ডিত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পণ্ডিতা রমাবাঈকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। ১৯০৩ সালের ১৩ই নভেম্বর রমাবাঈ দেবেন্দ্রনাথ বাবুর চিঠির জবাব দেন। রমাবাঈ স্বামীজির সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এই ভিত্তিতে- "স্বামীজি বিশ্বাস করতেন যে প্রাচীন ভারতে বর্ণ ব্যবস্থা গুণ, কর্ম, স্বভাবের উপর ভিত্তি করে হতো।" পণ্ডিতা রমাবাঈ তার চিঠিতে আরও লিখেছেন- "স্বামী দয়ানন্দ নারীদের জন্য ধর্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন। তিনি বলতেন যে নারীরা বেদ পড়তে পারে, যা হিন্দু ধর্ম অনুমতি দেয়নি। হিন্দু ধর্ম নারী ও শূদ্রদের ঘৃণা করতো বলেই আমার আত্মা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। নারীদের বেদ, দর্শন এবং ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নের অধিকার দেওয়ার বিষয়ে আমি তার শিক্ষায় সন্তুষ্ট হয়েছি।"

- (পৃষ্ঠা ২৪৪-২৪৫, ভাগ- ২)

নারী শিক্ষা লাভ করলে চরিত্র খারাপ হবে এই আপত্তির উত্তর

স্বামীজি ১৮৮০ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে মুজাফফরনগরে ছিলেন। একদিন এক ভদ্রলোক নারীশিক্ষা নিয়ে স্বামীজিকে আপত্তি করলেন যে নারীরা লেখা-পড়া করে কুটিল হয়ে যাবে। স্বামীজি উত্তর দিলেন যে এটি প্রকৃতি এবং সংগতির উপর নির্ভর করে। কারণ অনেক শিক্ষিত পুরুষও চরিত্রহীন।

- (পৃষ্ঠা ২৫০, ভাগ- ২)

শিষ্টাচার তথা সমান ব্যবহার

১৮৮২ সালে স্বামীজির বোম্বেতে থাকার ঘটনা -

"একদিন একজন বাঙালি ভদ্রলোক স্বামীজির সাথে দেখা করতে এসেছিলেন, তার দাড়ি ছিল।

গুজরাটে হিন্দুরা দাড়ি রাখে না, ভদ্রলোক স্বামীজির সাথে কথা বলতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি জল পান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাই স্বামীজি তার গুজরাটি শিষ্যকে জল আনতে বলেন। শিষ্যটি ভাবলেন আগন্তুক মুসলমান তাই তিনি পাতার তৈরি পাত্রে জল দিলেন। যখন তিনি চলে গেলেন তখন স্বামীজি তার শিষ্যকে ক্রোধান্বিত ভঙ্গিতে বললেন যে তোমার এখনও সভ্যতার সহজ নিয়মগুলির জ্ঞান নেই, কেন তুমি অতিথিকে গ্লাসে জল দিলেন না? শিষ্য বললেন, "মহারাজ! আমি কীভাবে একজন মুসলমানকে পাত্রে জল দেব। " স্বামীজি বলেছিলেন যে , " তিনি মুসলমান নন, কিন্তু একজন বড় জমিদার ছিলেন। সমস্ত মুসলমান এবং খ্রিস্টান আমার কাছে আসে তোমার উচিত সকল অতিথিকে সমানভাবে আপ্যায়ন করা, ভবিষ্যতে যদি কোন অতিথি জল চায় তাহলে জল দেয়ার সময় বিচার করবে না সে কোন মতের। "

- (পৃষ্ঠা ২৯৪, ভাগ- ২)

এক জোড়া জুতা বনাম সমগ্র পৃথিবীর দান

স্বামীজি ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে উদয়পুরে ছিলেন। একদিন উদয়পুরের মহারানার সামনে সমাবেশে একটি ধর্মীয় গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করা হয়েছিলো। সেই সভায় স্বামীজিও উপস্থিত ছিলেন। সেই ধর্মগ্রন্থে পড়া লেখাটির অর্থ ছিল- “কেউ একজন ব্রাহ্মণকে এক জোড়া জুতা দিলে সে সমগ্র পৃথিবী দান করার পুণ্য পায়। স্বামীজি মহারানাকে বললেন, যদি এটা সত্যি হয়, তাহলে আপনি ব্রাহ্মণদের যে লাখ টাকা মূল্যের সম্পদ দিয়েছেন তা স্বায়ত্তশাসিত করুন এবং একজন ব্রাহ্মণকে জুতা দান করুন, আপনি সমগ্র পৃথিবী দান করার পুণ্য পাবেন। "

- (পৃষ্ঠা ৩০৪, ভাগ- ১)

অধিকারানধিকার ঝঞ্ঝট

একদিন দু'জন সাধু স্বামীজির সাথে দেখা করতে এসেছিলেন এবং তার সাথে অনেক বিষয়ে কথোপকথন করেছিলেন। তিনি যখন হাঁটতে শুরু করেছিলেন, তখন তিনি স্বামীজিকে বলেছিলেন যে আপনি কেবলমাত্র কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কাছেই প্রচার করুন। আপনার বক্তৃতায় আসা সমস্ত লোকই কর্মকর্তা নয়। স্বামীজির উত্তর ছিল, "ধর্মের বিষয়ে কর্তৃত্বের প্রশ্ন তোলা বৃথা, উপদেশ শোনার অধিকার শুধু মানুষেরই আছে। আপনার জাত-ধর্মের শত-হাজার মানুষ পাষণ্ড হয়ে বসে আছে অধিকারানধিকার ঝঞ্ঝটে। আগে তাদের বাঁচান, অধিকারানধিকারের বিচার পরে হবে।"

- (১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ, উদয়পুর, পৃষ্ঠা ৩০৬-৩০৭, ভাগ- ২)

এই প্রসঙ্গে স্বামীজির জীবনী রচয়িতা দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত মন্তব্যটি নিম্নরূপ-

স্বামীজির এই উত্তরটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং এতে তার উদারতা কতটা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা ভেবে দেখার মতো। এই অধিকারানধিকারের প্রশ্ন নারী জাতি ও শূদ্রদের শিক্ষা থেকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত করেছে এবং এর ফলে ধর্মীয় মহন্তো ও ঠিকাদারদের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যারা মানুষের মনে তালা লাগিয়ে দেশকে রসাতলে নিয়ে গেছে। দয়ানন্দ তো এসেছিলেন শুধুমাত্র এই তালাগুলো ভাঙতে এবং মানুষকে মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে এবং আজ দয়ানন্দকে বলা হচ্ছে সেই তালাগুলো না ভাঙতে, যাতে তালার উপর তালা লাগানো যায়। দয়ানন্দ কেন এটা মানবেন ?

- (পৃষ্ঠা ৩০৭, ভাগ- ২)

চার চুলার ভণ্ডামি

স্বামীজি কাঁচা-পাকা, পরিপক্ক- অপরিপক্ক রান্নাঘরের ঝঞ্ঝট মানতেন না। একদিন এক সন্ন্যাসী, যিনি তার কাছে পড়াশোনা করতেন, চারের প্রশ্নে বাবুর্চির সাথে ঝগড়া করেছিলেন, তখন স্বামীজি তাকে তিরস্কার করেছিলেন যে সন্ন্যাসী হওয়া সত্ত্বেও চারটি চুলার ভণ্ডামি থেকে মুক্তি পায়নি। যেখানে তোমার চার বর্ণের পারস্পরিক ভেদাভেদ মুছে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা উচিত, কিন্তু তুমি নিজেই এই নোংরামিতে পড়ে আছো ।

- (শাহপুরা [রাজস্থান] ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা ৩২২, ভাগ- ২)

যত মত তত বিপদ
বেদের পথ মুক্তির পথ

সজীব বিদ্যার্থী

শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে ইচ্ছামত কর্ম করিলে কি ক্ষতি হয়? এবং যত মত তত পথ এর ভয়ঙ্কর লীলা খেলা -

কৃতনিয়মলঙ্ঘনাদানর্থক্যং লোকবৎ।।কৃতনিয়মলঙ্ঘনাৎ। আনর্থক্যং লোকবৎ।

[সাংখ্য দর্শন ৪|১৫]

সরলার্থ—যেমন চিকিৎসকের উপদেশমত না চলিলে রোগীর রোগ নিবৃত্ত না হইয়া রোগের বৃদ্ধি হইয়া অকাল মৃত্যু হইয়া থাকে সেই প্রকার শাস্ত্রে নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে সংসারে বন্ধনরূপ ব্যাধির নিবৃত্তি না হইয়া তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জীব মৃত্যু অর্থাৎ নীচগতি প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যোগীরও যোগভ্রষ্ট রূপ অনর্থ উৎপন্ন হইয়া পতন হইয়া থাকে।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ। নস সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩ তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ। জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কতুমিহাহসি ॥ ২৪

[গীতা-১৬|২৩,২৪]

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, তাহার শান্তি-সুখও হয় না, মোক্ষলাভও হয় না। অতএব কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ, সুতরাং তুমি শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা জানিয়া যথাধিকার কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হও।

এখন শাস্ত্র কিভাবে নির্ধারণ করবো সমাধান ও মনু মহারাজ মনুস্মৃতিতে বলেছেন -

অর্থকামেম্বসক্তানাং ধর্মজ্ঞানং বিধীয়তে । ধর্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ ।।

[মনু সংহিতা-২|১৩]

অনুবাদ : যাঁরা অর্থ ও কামে আসক্ত নন, ধর্মের প্রকৃত জ্ঞান তাঁদেরই হয়। আর, ধর্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের কাছে বেদই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। (যেখানে শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হবে, সেখানে শ্রুতির মত-ই গ্রাহ্য। এই কারণে, শ্রুতিকেই সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ বল হয়েছে)।

শ্রুতিদ্বৈধং তু যত্র স্যাত্তত্র ধর্মাবুভৌ স্মৃতৌ । উভাবপি হি তৌ ধর্মৌ সম্যগুক্তৌ মনীষিভিঃ ।।

[মনুসংহিতা -২| ১৪]

অনুবাদ : যেখানে দুটি শ্রুতি বচনের মধ্যে পরস্পর-বিরুদ্ধ উপদেশ আছে, সেরকম স্থানে দুটিকেই ধর্ম ব'লে গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ দুটিরই বিকল্পিতভাবে অনুষ্ঠান করতে হবে। [যেমন, কোনও একটি শ্রুতি বাক্যে যে বিষয়টিকে এটিই 'ধর্ম' এইরকম উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তাকেই আবার অন্য একটি শ্রুতি-বাক্যে 'অধর্ম' বলে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

সেক্ষেত্রে দুটি পদার্থকেই ধর্ম এবং অধর্ম বিকল্পিতভাবে অনুষ্ঠান ও অননুষ্ঠান করতে হবে। কারণ, বিধায়কতা বিষয়ে ঐ দুটি শ্রুতি-বাক্যেরই বলবত্তা সমান। ফলে, এক্ষেত্রে এই শ্রুতিটি প্রমাণ, আবার এটি প্রমাণ নয়- এরকম ভেদনিরূপণ করা সম্ভব নয়। এ কারণে সমানবিষয়ক তুল্যবল দুটি শ্রুতির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হ'লে অনুষ্ঠেয় বিষয়টির বিকল্প হবে]। কারণ, মণীষিগণ বলে গিয়েছেন, ঐ দুটিই ধর্ম এবং দুটিই দোষহীন।।

অতএব, প্রমানিত হলো আমাদের সর্বমান্য একমাত্র অপৌরুষেয় শ্রুতি(বেদ)। এবং ধর্ম থেকে শুরু করে জগতের যত মহান কর্ম সকল বেদবিদ্যা অনুসারে পালন করতে হবে। না নবীন পুরান না কোনো লোককথা না কোনো পুরুষের বানী দ্বারা ধর্ম বিচার হবে। সনাতন ধর্ম কোন ব্যক্তি অথবা কারো কোটেশন এর উপর দাঁড়িয়ে নেই। পবিত্র বেদকে ধর্ম সনাতনের চক্ষুস্বরুপ বলা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান জাতির দুর্ভাগ্যের বিষয় এই জ্ঞানসনাতনকে বাদ দিয়ে যেরকম পতঙ্গসমূহ দেহত্যাগ করার জন্য আগুনে নিজেদের কয়লা করে ঠিক তেমনি বর্তমান যত মত তত পথধারী এক ভয়ঙ্কর জাতি গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। তারা এই বিশ্বের প্রিন্সিপাল জ্ঞানস্রোতের ভান্ডার অপৌরুষেয় পবিত্র বেদকে অস্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করে না।

সম্প্রতি এই যত মত তত পথ (জগাখিচুড়ী) অন্ধকারগামী দর্শনের বহিঃপ্রকাশে কিছু নবীন রিলিজিয়নের স্বীকৃতির দ্বারপ্রান্তে।

উদাহরণস্বরূপ :

আমি বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত মানি, বেদের অন্যান্য সিদ্ধান্ত মানি না। কারন আমি হিন্দু নই, আমি বৈষ্ণব। আমি বৈষ্ণব সিদ্ধান্তঃ মানবো।

-শ্রীপাদ প্রেমাঞ্জন দাস (সম্প্রতি একটি বিতর্কনুষ্ঠানে- যত মত তত পথ এর কলঙ্ক থেকে মুক্ত নতুন বৈষ্ণব ধর্মের প্রবক্তা)

তো পাঠক বুঝতে পারছেন এই সমাজ কোন দিকে যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে আলাদা ধর্মের স্বীকৃতি পেলেও আমাদের অবাক হওয়ার থাকবে না।

ঠিক এইরকম -

(১)সৎসঙ্গ (প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র)

(২)মতুয়া (প্রতিষ্ঠাতা হরিচাঁদ ঠাকুর)

(৩) আরো অসংখ্য অনিশ্চিত মতপথ তৈরি।

এবং এর জন্য একমাত্র দায়ী বেদবিরোধী যত মত ততই ভয়ংকর পথের আহ্বান। বর্তমান সনাতনীরাও জানেনা এই সনাতন সমাজ কোন পথে ধাবিত হচ্ছে অন্য কোনো বিশেষ রিলিজিয়ন না শুধু নিজেরা নিজেদের এই যতমত তত পথে আবহে এক অনিশ্চিত গহিন অন্ধকারে অগ্রগামী হচ্ছে। এখনো আমাদের এই ভয়ঙ্কর যত মত তত কুৎসারুপ দাবানলরুপী ভাইরাসকে শক্তিহীনতা করতে হবে। আমাদের লড়তে হবে শাস্ত্রকে আশ্রয় করে। পবিত্র বেদজ্ঞান দ্বারা এই সমস্ত অভিশাপের খন্ডন এবং মন্ডন করে গড়ে তুলতে হবে একটা স্বচ্ছ সমাজ।

ইদং শরণমজ্ঞানামিদমের বিজানতাম্।ইদমন্বিচ্ছতাং স্বর্গমিদমানন্ত্যমিচ্ছতাম্।।

[মনুসংহিতা -৬|৮৪]

অনুবাদ : এই বেদরূপ পরমব্রহ্ম অজ্ঞব্যক্তিগণেরও পরম গতি [অর্থাৎ যারা বেদার্থবিদ নয় তারা জপকর্মাদিতে অর্থাৎ বেদপাঠে অধিকার নিয়ে বেদকে আশ্রয় করে। অথবা, অজ্ঞ শব্দের অর্থ 'অনাত্মজ্ঞ। যারা শাস্ত্র থেকে আত্মতত্ত্ব অবগত না হয়েও সেই আত্মোপাসনায় নিরত, তারা চিত্তে স্থিরতালাভ করতে পারে নি, বেদই তাদের শরণ অর্থাৎ আশ্রয়। বেদজপ (পাঠ), বেদোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান, এবং সেই অনুষ্ঠানের জন্য উপযোগী বেদার্থজ্ঞান হলেই আর নরকভোগ করতে হয় না এবং কীট-পতঙ্গাদিযোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয় না।]। বিজ্ঞব্যক্তিগণেও এই বেদব্রহ্মই অবলম্বন, যারা স্বর্গলাভ(উন্নত স্তর) ইচ্ছা করে তাদেরও এই বেদই আশ্রয়, এবং যারা অনওফলস্বরূপ মোক্ষ কামনা করে, তাদেরও এই বেদই অবলম্বন।।

নমস্কার
এই হলো শাস্ত্র অনুযায়ী যত মত তত পথের সংক্ষিপ্ত কুফলের প্রভাব এবং বেদের সুফল আলোচনা।

[তথ্যসূত্র : সাংখ্য দর্শন, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, মনুসংহিতা(মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়)]

ওতম্ শান্তি: শান্তি: শান্তি: